NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

EHI

PAPER - V

MODULES 17, 18, 19 & 20

ELECTIVE HISTORY
HONOURS

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্ত্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

২২তম পুনর্মুদ্রণ ঃ জুলাই, 2019

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the
Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় ঃ ঐচ্ছিক ইতিহাস — সাম্মানিক স্তর

পাঠক্রম ঃ পর্যায়
EHI-05 ঃ 17, 18, 19, 20

	রচনা	সম্পাদনা
একক 65-68	শ্রীমতী কঙ্কনা ধারা	অধ্যাপক রাজাগোপাল ধর চক্রবর্তী
একক 69-72	অধ্যাপিকা সেলিনা জাহান	অধ্যাপক ত্রিদিব চক্রবর্তী
একক 73-76	অধ্যাপক আশিস কুমার রায়	
একক 77-78	অধ্যাপক ত্রিদিব চক্রবর্তী [বচনায় সহায়তা করার জন্য ড. কণা চ্যাটার্জীর কাছে লেখক কৃতজ্ঞ]	অধ্যাপক আশিস কুমার রায়
একক 79-80	অধ্যাপক রবীন্দ্র সেন [এই রচনায় প্রভূত সহায়তা করার জন্য শ্রীমতী বুলবুল সেন লেখকের কাছে ধন্যবাদার্হ]	ঐ

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EHI : 05

ইতিহাসের ঐচ্ছিক পাঠক্রম
(স্নাতক পাঠক্রম)

পর্যায়
17

একক 65 ☐ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উপমহাদেশে ওলন্দাজ শক্তির ঔপনিবেশিক বিস্তার 7–18

একক 66 ☐ ব্রহ্মদেশ ও মালয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আগ্রাসন 19–39

একক 67 ☐ থাইল্যান্ড ও শ্যামদেশে পাশ্চাত্ত্য শক্তির অনুপ্রবেশ 40–48

একক 68 ☐ ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ ও ইন্দোচীনে পশ্চিমি উপনিবেশবাদ ও প্রসার 49–64

পর্যায়
18

একক 69 ☐ ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ইন্দোনেশিয়ার সমাজ ও অর্থনীতি 65-76

একক 70 ☐ মালয় সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি 77-86

একক 71 ☐ ঔপনিবেশিক শাসনকালে ফিলিপিন্স ও থাইল্যান্ডের সমাজ-অর্থনীতি 87–92

একক 72 ☐ ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ইন্দোচীনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপরেখা 93-98

পর্যায়
19

একক 73 ☐ দক্ষিণ-পূর্ব উপমহাদেশে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এবং ব্রহ্মদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 99-111

একক 74 ☐ ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন 112–123

একক 75 ☐ ফিলিপাইনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 124–134

একক 76 ☐ থাইল্যান্ডের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 135–144

পর্যায়
20

একক 77 ☐ ইতিহাসের পাতায় ভিয়েতনাম 145-174

একক 78 ☐ দ্বিতীয় ইন্দোচীনের যুদ্ধ ঃ মূল উৎসগুলি 175-203

একক 79 ☐ ইন্দোনেশিয়া 204-218

একক 80 ☐ ইন্দোনেশিয়া ঃ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রেক্ষাপট 219–232

একক ৬৫ ☐ দক্ষিণ-পূর্ব উপমহাদেশে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ শক্তির ঔপনিবেশিক বিস্তার

গঠন

৬৫.০ উদ্দেশ্য

৬৫.১ প্রস্তাবনা

৬৫.২ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উপমহাদেশ—একটি পরিচিতি

  ৬৫.২.১ উপমহাদেশ সম্পর্কে পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি

  ৬৫.২.২ সংস্কৃতি ও সমাজ

৬৫.৩ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পর্তুগীজ শক্তির আবির্ভাব

  ৬৫.৩.১ পর্তুগীজদের বাণিজ্যিক কার্যকলাপ

  ৬৫.৩.২ মিশনারীদের প্রয়াস

  ৬৫.৩.৩ পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে দ্বীপবাসীদের প্রতিক্রিয়া

৬৫.৪ ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক শক্তির বিস্তার

  ৬৫.৪.১ ইন্দোনেশিয়াতে ডাচ কর্তৃত্ব স্থাপন

  ৬৫.৪.২. ডাচ কর্তৃত্ব স্থাপনে V.O.C'-র ভূমিকা

৬৫.৫ ডাচ বাণিজিক সংগঠন

৬৫.৬ ডাচ বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণ ও তার প্রকৃতি

  ৬৫.৬.১ বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণের ফলশ্রুতি

  ৬৫.৬.২ স্থানীয় জনজীবনের উপর প্রভাব

৬৫.৭ ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতিতে ডাচ বাণিজ্যের প্রভাব

৬৫.৮ সারাংশ

৬৫.৯ অনুশীলনী

৬৫.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৬৫.০ উদ্দেশ্য

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় উপমহাদেশ পশ্চিমী ঔপনিবেশিকতাবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান এককটিতে আলোচনা করা হয়েছে। এই এককটি পাঠ করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি আপনারা জানতে পারবেন—

- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পর্তুগীজ ও ডাচ উপনিবেশবাদ।
- উপনিবেশবাদ এই উপমহাদেশে কী পরিবর্তন নিয়ে এলো।
- এই পরিবর্তনে দ্বীপবাসীরা কতটা উপকৃত হলেন।
- এই অঞ্চলগুলি কেন দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমী শাসনের আওতায় রইল।
- এখানকার কৃষি, সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির উপর ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব।

৬৫.১ প্রস্তাবনা

এই এককটিতে আলোচিত হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় উপমহাদেশের অবস্থিতি। এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অভিঘাত সত্ত্বেও এখানকার নিজস্বতা কিভাবে বজায় রইল তা স্বল্প পরিসরে আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

এরপর আলোচনা করা হয়েছে এখানকার পশ্চিমী শক্তির আগমনের ফলে পরিবর্তনগুলি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য পশ্চিমের অভিযান দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়েছিল প্রথমত, রাজতান্ত্রিক উৎসাহে দ্বিতীয়ত বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলির আগ্রহে। দুটি ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য কিন্তু একটিই—অর্থনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা যার পশ্চাতে ছিল রাজনৈতিক অনুমোদন।

রাজতান্ত্রিক উৎসাহে আবির্ভূত হল পতুর্গীজরা এবং বাণিজ্য কোম্পানীর মাধ্যমে উপস্থিত হল ডাচ বা ওলন্দাজরা।

প্রকৃতপক্ষে ভারত মহাসাগরের উপর অবস্থিত এক বিশাল দ্বীপপুঞ্জ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নামে পরিচিত। এই বিশাল দ্বীপপুঞ্জটির রয়েছে এক সমৃদ্ধ অতীত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমৃদ্ধ অতীত এবং ইউরোপীয় আগমনের সময়কালটি আধুনিক গবেষক ও ঐতিহাসিকদের আরো বিস্তৃত অনুসন্ধানের জন্য এক উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। এখানে আলোচনা করা হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে উপনিবেশবাদের ইতিহাস এবং নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেইসব বিদেশী শক্তিগুলিকে যারা এখানে ঔপনিবেশিকতার সূচনা করেছিল।

৬৫.২ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উপমহাদেশ একটি—পরিচিতি

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারত মহাসাগরের উপর অবস্থিত এক বিশাল দ্বীপপুঞ্জ। যে দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে আছে বর্মা, থাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স। এই দ্বীপপুঞ্জ বিস্তৃত রয়েছে ৩৫° অক্ষাংশে এবং ৫০° দ্রাঘিমাংশে। এই বিশাল দ্বীপপুঞ্জ প্রাচীনকাল থেকেই ভারত, চীন, ইসলাম জগত ও পশ্চিমী দুনিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পূর্বদিকে চীন ও পশ্চিম দিকে ভারত। এই বিশাল দ্বীপপুঞ্জ কখনোও বা বিস্তৃত ভারত (Further India) নামেও অভিহিত হয়েছে। যদি কল্পনা করা যায় যে ভারত উপমহাদেশ পূর্বদিকে আরো প্রসারিত হয়ে গেছে তাহলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে বিস্তৃত বা প্রসারিত ভারত (Further India) বলে মনে করা যেতেই পারে।

৬৫.২.১ উপমহাদেশ সম্পর্কে পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল থেকে অর্থাৎ ১৯৪০-এর দশক থেকে এখানে সামরিক প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হয়। তখন থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া 'প্রসারিত ভারত', 'ক্ষুদ্র চীন' কিংবা 'প্রশান্ত মহাসাগরীয়' নামে অভিহিত হবার পরিবর্তে বর্মা, ভিয়েতনাম, ফিলিপিন্স প্রভৃতি নির্দিষ্ট নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিচিতি শুধু সামরিক গুরুত্বের উপর নির্ভরশীল নয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এক প্রসারিত ভৌগোলিক অঞ্চল যার গৌরবোজ্জ্বল অতীত ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতি রয়েছে। ১৯২০-৩০ এর দশক থেকে নৃতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকরা এখানকার সাদৃশ্যগুলি লক্ষ্য করছিলেন। এখানকার রাজকীয় দরবারে অনুসৃত নিয়মগুলি সমগ্র দ্বীপপুঞ্জে বর্তমান ছিল। এই নিয়ম প্রতিপালনই এখানকার ঐতিহ্য বা সাধারণ রীতি বলে গণ্য হতে থাকে। সমগ্র উপদ্বীপের সমাজজীবন ও পারিবারিক রীতির মধ্যে সাদৃশ্য ছিল। ভাষার মধ্যে ছিল সাদৃশ্য। ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়াতে, থাই ভাষা ব্যবহৃত হত দক্ষিণ চীন এবং বর্মার শান রাজ্যে (Shan State)। উত্তর মালয়েশিয়াতে এই ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

৬৫.২.২ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংস্কৃতি ও সমাজ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে পশ্চিমী ভাবধারা ও বিদেশীয়দের ভূমিকার গুরুত্ব নির্ধারণ করতে গিয়ে ঐতিহাসিকরা যে প্রামাণ্য খুঁজে বার করলেন তা উদ্ভাসিত করল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন যুগের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আঞ্চলিক গঠন। সমন্বয়ের একটি চিত্র পরিস্ফুট হল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে সাধারণভাবে বলা হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক শক্তিগুলির মিলনক্ষেত্র। এখানকার ইতিহাস বিশ্লেষিত হয়েছে বিবিধ ভাবধারার আমদানি ও সাংস্কৃতিক আত্তীকরণের (absorb) প্রশ্নে। ভারত, চীন, ইসলাম, ইউরোপ, আমেরিকা থেকে একের পর এক সাংস্কৃতিক তরঙ্গ এখানে স্পষ্ট ছাপ ফেলেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তার সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং প্রয়োজনের সঙ্গে মানিয়ে বিদেশী প্রভাব গ্রহণ করেছে। ভারতীয় শিল্পকলা, স্থাপত্য ও সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও পাগান

(Pagan), আঙ্কোর (Angkor) প্রভৃতির মন্দির স্থাপত্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিজস্বতা বর্তমান। এই নিজস্বতা যা ধ্রুপদী নামে অভিহিত হবার যোগ্যতা রাখে। তা ধ্রুপদী (Classical) এই কারণে যেমন থাইল্যান্ডের বুদ্ধিমূর্তি, গঠনশৈলীতে যা ভারতের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত নয় এখানে তার নিজস্ব শিল্পকলা বর্তমান।

সমাজব্যবস্থায় দেখা গেছে মহিলাদের স্থান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে গ্রামীণ কৃষক সমাজে এবং সমাজে নারীর প্রতি বৃহত্তর মূল্যবোধের জাগরণের বিষয়টি ভারত, চীনের সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত নয়। একইভাবে এখানকার ছোট পরিবারের ধারণা যেমন গুরুত্ব লাভ করেছিল, ভারত বা চীনের বৃহৎ পরিবারের রীতি রেওয়াজের সঙ্গে যা সাদৃশ্যযুক্ত ছিল না। তাই বিদেশী ভাবধারা এখানে ছাপ ফেললেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রয়োজনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে তা গৃহীত হয়েছিল। ভিয়েতনামে চীনা সংস্কৃতি গৃহীত হলেও তার সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি। অন্যান্য অঞ্চলে ভারতীয় রীতি প্রচলিত হলেও তা স্থানীয় রেওয়াজকে নিশ্চিহ্ন করে নি। ইসলামীয় ভাষা মালয়েশিয়াকে আরব-জাতিভুক্ত করতে পারেনি। তাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংস্কৃতি বিদেশী উপনিবেশিকতাবাদের ফলশ্রুতি নয়। এখানকার ইতিহাসের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় অধিবাসীদের মননগত ঐক্য, যা তাদের এক ঐতিহাসিক বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে এবং পৃথক সত্তা বজায় রাখতে সহায়তা করেছে।

৬৫.৩ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পতুর্গীজ শক্তির আবির্ভাব

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে দুটি পর্যায়ে ইউরোপীয় আধিপত্য সম্পন্ন হয়েছিল। প্রথমত, নবজাগরণের ফলে সমগ্র ইউরোপের মনন জগতে যে আলোড়ন ওঠে তার ফলে দেশ আবিষ্কার ও জ্ঞানার্জনের তীব্র আকাঙ্খার হাত ধরে মানুষের মধ্যে দেশ আবিষ্কারের পদক্ষেপ গৃহীত হয়। পর্তুগাল, স্পেন, হল্যান্ড, আমেরিকা প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি দেশ আবিষ্কারে নেশায় উন্মুক্ত করে প্রাচ্যের দেশগুলিকে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলির চেষ্টায় প্রসারিত হয় ইউরোপীয় আধিপত্য। দ্বিতীয় পর্যায়ের এই উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে কাজ করেছিল শিল্প-বিপ্লবজাত প্রয়োজন। উৎপাদিত পণ্যের জন্য বাজারে প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন রাষ্ট্রকে উপনিবেশ লাভের জন্য অগ্রণী করে তোলে। ব্রিটিশ, ফরাসি ও ডাচ—'পূর্ব ভারত কোম্পানী'গুলি ধীরে ধীরে এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যায় এবং বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভে সক্রিয় হয়ে ওঠে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে আগ্রাসী বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত করিয়েছিল পর্তুগীজরা। ১৫১১ সালে পর্তুগীজরা অধিকার করে মালাক্কা। এছাড়াও অধিকৃত হয় মিন্দানাও (Mindanao), উত্তর মালয় ও আকে (Acheh)। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির তুলনায় অনেক ছোট হওয়া সত্ত্বেও পর্তুগীজদের মধ্যেই ছিল তৎকালীন সমুদ্রযাত্রার ও নৌযুদ্ধের উন্নত পরিকল্পনা ও বিবিধ জ্ঞান। তাদের নৌবহরের গঠন বিশেষ করে নৌ-পরিচালন রীতি, নৌবাহিনীর উন্নত কলাকৌশল তাদের সমুদ্রযাত্রার অগ্রণী করে তুলেছিল তাই পর্তুগীজরা হয়ে উঠেছিল সমুদ্রযাত্রার পারদর্শী জাতি (meritime horde)।

৬৫.৩.১. পর্তুগীজদের বাণিজ্যিক কার্যকলাপ

সুগন্ধী মশলার আকর্ষণে পর্তুগীজরা এশিয়াতে উপস্থিত হয়। মালাক্কা অধিকৃত হবার পর তারা প্রাচ্য বণিকদেরও স্বাগত জানিয়েছিল যারা তাদের নিয়মরীতি অনুযায়ী ব্যবসা করতে স্বীকৃত হবে। এই সময় কিছু অমুসলমান ভারতীয়, চীনা, আকীনীয়ন (আকে অধিবাসী) বিরোধী সুমাত্রা ও জাভাবাসী এই ব্যবসায়িক সুবিধার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠে। ফলে দেখা গেল রপ্তানিযোগ্য দক্ষিণ-পূর্ব ভারতীয় পণ্য যেমন সুগন্ধী মশলা অর্থাৎ লবঙ্গ, জায়ফল, গোলমরিচ, দারুচিনি প্রভৃতি এবং আরো কিছু কৃষিজ তুলো, ধান ইত্যাদির অপ্রতুলতা। কারণ আকীয়ন, জাভাবাসী চীনারা পর্তুগীজ নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে বাণিজ্যিক বিনিময় কবতে থাকে। এরপর থেকে উৎপাদন ও সরবরাহের উপর নিয়ন্ত্রণের সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তাই যে সব উপদ্বীপে মশলার উৎপাদন হতো যেমন ইন্দোনেশিয়ার পূর্বভাগ, টাইডোর (Tidore), টারনেট (Ternate), আমবোনিয়া (Ambonia) প্রভৃতি ষোড়শ শতকের মধ্যে পর্তুগীজ দ্বারা অধিকৃত হয়।

এইসব অঞ্চলের মুসলিম শাসক, সুলতানরা পর্তুগীজদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন যাতে দুপক্ষই লাভবান হয়েছিল। রাজারা যেমন স্থানীয় শত্রু ও মশলা উৎপাদক অঞ্চলের সামরিক অভিযানে পর্তুগীজ সাহায্য পেতেন তেমনই পর্তুগীজরাও যেসব অঞ্চলের জন্য চুক্তি হয়নি সেখানকার মশলা ও কৃষিজ পণ্য লাভের জন্য সুলতানদের সহযোগিতা পেতেন। এইভাবে পারস্পরিক সহায়তরা দ্বারা উভয় পক্ষ লাভবান হত এবং দেখা গেছে এখানকার রপ্তানীজাত মশলা বিশ্বের বাজারে খুব চড়া মূল্যে বিক্রিত হয়েছে। আর একথা সত্য যে, পর্তুগীজ আধিপত্য ও একচেটিয়া বাণিজ্য সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে প্রসারিত না হলেও তা কিন্তু লাভজনক ছিল।

৬৫.৩.২ মিশনারীদের প্রয়াস

পর্তুগীজ মিশনারীরা এখানকার অনাথ শিশুদের ধর্মান্তকরণ, ক্রীতদাস, দরিদ্র ও অসহায়দের সহায়তা দান, মহিলাদের পুনর্বাসন প্রভৃতি ধর্মমূলক ও সংস্কারমূলক কাজ করতেন। তবে পতুর্গীজ মিশনারীরা সর্বাপেক্ষা সাফল্য লাভ করেছিল জাপানে। এখানে প্রায় তিন লক্ষ জাপানীকে ব্যাপটাইজ্‌ড বা ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের মধ্যেই। এখানে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট ছিল যে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে সব অঞ্চলে পর্তুগীজ আধিপত্য প্রসারিত হয়েছিল, বাণিজ্য পরিচালিত হয়েছিল সেখানে অর্থনৈতিক কিংবা প্রশাসনিক সংহতি সাধনের বিষয়টি অবহেলিত ছিল কারণ কোন ঔপনিবেশিক বা সামরিক কাঠামো এখানে অনুপস্থিত ছিল।

পর্তুগীজরা কোন শিল্পসমৃদ্ধ রাষ্ট্রের অধিবাসী ছিলেন না। তাই এখানে অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রের উপনিবেশগুলির মতো অবধারিত ভাবে পরিবর্তনের জোয়ার আসেনি। কারণ কোন নতুন প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক কাঠামো প্রস্তুত হয়নি আর আবশ্যিকভাবে জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হয়নি। পর্তুগীজ রাজনৈতিক প্রসারণকালে স্থানীয় অঞ্চল, অর্থনীতি নিরুপদ্রব ছিল।

পর্তুগীজদের মধ্যে একটি প্রবাদবাক্য প্রসিদ্ধ ছিল যে ঈশ্বর তাঁদের একটি ক্ষুদ্র জন্মভূমি দিয়েছেন সত্য কিন্তু কবরখানাটি দিয়েছেন পৃথিবী জুড়ে। বাস্তবিক পক্ষে এই সমুদ্র অভিযাত্রী জাতিটির মৃত্যুহার দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে অনেক বেশি ছিল। এদের মধ্যে পারস্পরিক নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হত আর ক্রান্তীয় অসুখে অনেকেই মারা যেত, এইভাবে পর্তুগীজ জনসংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। এছাড়া নৌবহরের হারও কমে গিয়েছিল। এর ফলে পর্তুগীজরা দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে আধিপত্যের প্রসারণ তো দূর তাকে স্থিতিশীলতাও দিতে পারেনি। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে স্পেনীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা পর্তুগীজদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সরে যেতে বাধ্য করে।

৬৫.৩.৩ পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে দ্বীপবাসীদের প্রতিক্রিয়া

বিশ্বের বাজারে পর্তুগীজ সরবরাহকৃত মশলার অন্যতম প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্পেন। প্রশান্ত মহাসাগরীয় পথে ইউরোপ ও পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে নতুন যাত্রাপথ আবিষ্কার করে স্পেনীয় বা পর্তুগীজদের কাছে আশঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে। ১৫২৭, ১৫২৮ এবং ১৫৪০-এর দশকে স্পেনীয়রা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে একের পর এক আসতে থাকে। ১৫৭৪ সালের মধ্যেই পর্তুগীজ কর্তৃত্ব এই উপদ্বীপে অনেকখানি শিথিল হয়ে গিয়েছিল। এই সময়েই পর্তুগীজ দুর্ব্যবহার ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে মশলা উৎপাদক দ্বীপ টারনেট বিদ্রোহে জ্বলে ওঠে ও পর্তুগীজদের তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। ১৫৮০ সালে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পরিবর্তন এল স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপ স্পেন ও পর্তুগালকে একত্র করে দেন। পরবর্তী ছয় দশকে ওলন্দাজ, ব্রিটিশ, স্পেনীয়রা পর্তুগীজদের যাবতীয় বাণিজ্যিক সুবিধা করায়ত্ত করে নিয়ে পর্তুগীজদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে। প্রকৃতপক্ষে প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান, সম্পদ ও লোকসংখ্যার অভাবহেতু পর্তুগীজরা এখানে তাদের সাম্রাজ্য ধরে রাখতে পারেনি।

৬৫.৪ ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক বিস্তার

ষোড়শ শতকের শেষভাগে ডাচ বা ওলন্দাজরা মশলা ব্যবসায়ে পদার্পণ করে। ষোড়শ শতাব্দীতে ডাচ প্রতিপত্তি পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল লিসবন তথা পর্তুগালের রাজধানী থেকে উত্তর ইউরোপের বন্দরগুলিতে মশলা বিতরণের উপর। ১৫৯৪ সালে স্পেনরাজ দিতীয় ফিলিপ এক আদেশনামায় পর্তুগালের বন্দরগুলিকে ডাচ বণিকদের জন্য রুদ্ধ করেছিলেন। প্রায় তিরিশ বছর ধরে তিনি প্রটেস্টান্ট ডাচদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এবার তিনি হল্যান্ডকে অর্থনৈতিক দিক থেকে ধ্বংস করার জন্য এই আদেশনামা জারি করলেন। ডাচরা তখন বিকল্প উপায় হিসাবে মশলাদ্বীপের ঘাঁটিগুলিতে তাদের বাণিজ্যতরী পাঠাতে মনস্থির করে। ১৫৯৫ সালে গঠিত হয় (অনেকগুলি বাণিজ্য কোম্পানি একত্র হয়ে) ভারেনদি অস্টানডিচ কোম্পানি সংক্ষেপে VOC ইউনাইটেড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এরা প্রায় দুই শতক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সামুদ্রিক বাণিজ্যে আধিপত্য করেছিল। ১৫৯৬ সালে প্রাচ্যে উপস্থিত হয় প্রথম ডাচ বাণিজ্যতরী।

৬৫.৪.১ ইন্দোনেশিয়াতে ডাচ কর্তৃত্ব স্থাপন

১৫৯৬ সালের প্রথমদিকে জাভার পশ্চিম উপকূলের ছোট বন্দর শহর Bantam-এ ডাচ জাহাজ এসে উপস্থিত হয়। এখানকার স্থানীয় আধিকারিক ও ডাচদের সঙ্গে সম্পাদিত হয় একগুচ্ছ সন্ধিচুক্তি যা পরবর্তীকালে হল্যান্ডের শাসন সমগ্র ইন্দোনেশিয়াতে প্রসারিত করতে সহায়তা করে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে মশলা ব্যবসায়ে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপনের প্রবণতা ডাচদের অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি করে তোলে। কারণ অন্য রাষ্ট্রগুলিও সমভাবে বাণিজ্যে আগ্রহী ছিল। ১৬০০ সালে ১২৫ জন ইংরেজ বণিকদের নিয়ে গঠিত হল জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, যারা ১৬০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর লাভ করল রাজকীয় সনদ, এই জয়েন্ট স্টক কোম্পানি পরিচিত লাভ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে। এই কোম্পানিকে ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপদ্বীপে বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হয়। একই সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জনবহুল অংশ বিজয় ও প্রশাসনের অধিকারও পায়। ১৬১৯ সালের মধ্যে বান্টম, জাকার্তা, আমবোয়ানা বান্দা প্রভৃতি অঞ্চলে স্থাপিত হয়ে যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে ডাচ বাণিজ্যকেন্দ্রও ছিল তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনিবার্য হয়ে যায়। তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়াতে দুটি রাষ্ট্র ব্রিটেন ও হল্যান্ড ইউরোপে চুক্তিবদ্ধ হয়ে প্রাচ্য বাণিজ্যের ভাগ করে নেয়।

৬৫.৪.২ ডাচ কর্তৃত্ব স্থাপনে V.O.C.-র ভূমিকা

VOC-র প্রতিনিধি প্রাচ্য থেকে একাধিপত্য ত্যাগ করতে রাজী ছিলেন না। VOC-এর গভর্নর জেনারেল জাঁ পিটারসন কোন (Jan Pieterson Coen) স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে কিছু চুক্তি সম্পাদন করলেন যাতে এই উপদ্বীপ থেকে ব্রিটিশদের উচ্ছেদ করা যায়। তাঁর আদেশে ১৬২৩ সালে আমবোয়ানা দ্বীপে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় ফলশ্রুতিতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে তাদের বাণিজ্যকেন্দ্র পরিত্যাগ করে এবং সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করে ভারতবর্ষের উপর। Coen বা কোন এর সময়ে VOC-একটি সংঘবদ্ধ কোম্পানি রূপে উদ্ভূত হয়। ডাচ বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যের একটি শক্তিশালী ভিত্তি হিসাবে পরিগণিত হতে থাকে। পরবর্তী তিন শতক এই VOC খুব দক্ষতার সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালন ও নীতি নির্ধারণ করতে থাকে। ব্রিটিশদের সঙ্গে ডাচরা পর্তুগীজ প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছিল। পর্তুগীজ বাণিজ্যঘাঁটি মালাক্কা ১৬৪১ সালে ডাচ অধিকৃত হয়। এইভাবে ডাচরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন রাজধানী শুন্ড (Sunda)-র উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে।

৬৫.৫ ডাচ বাণিজ্যিক সংগঠন

ডাচদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে কোন রাজ্যিক (teritory) উদ্দেশ্য তাদের ছিল

না। স্থানীয় জনগণের মধ্যে ধর্মান্তিকরণের মাধ্যমে কোনরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি কিংবা জাগতিক উন্নয়ন সাধন কোনটাই ডাচ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল না। অন্য কোন পশ্চিমী রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিংবা অর্থনৈতিক ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া কোনরূপ প্রত্যক্ষ প্রশাসনিক দায়িত্ব ডাচরা এড়িয়ে যেতেন। একমাত্র বাটাভিয়া (জাকার্তার ডাচ নামকরণ)-তে আধিপত্য বজায় রাখার জন্য VOC-কে কিছু অংশ অধিগ্রহণ করতে হয়েছিল এবং তার প্রত্যক্ষ প্রশাসন বজায় রাখতে হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ডাচরা সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষর করে দেশীয় শাসকদের স্থানীয় প্রশাসনের ভার দিয়ে বিনিময়ে মশলা ও ভোগ্যপণ্য সরবরাহের ব্যাপারেই উৎসাহী ছিল। কারণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, আন্তঃরাজ্য বিভেদ প্রভৃতি বাণিজ্যিক আদান-প্রদান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এসত্ত্বেও ব্রিটিশদের বাণিজ্যিক কারণে ডাচরাও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জড়িয়ে পড়ে। জাভার পশ্চিমে বান্টম রাজ্য ও কেন্দ্রে এবং পূর্বে মাতরম (Mataram) রাজ্য ছিল এই দ্বীপের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্য। রাজ্যগুলি ডাচ কোম্পানির হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করলেও কখনোও একজোট হতে পারেনি। ডাচরাও এখানকার রাজনীতিতে ব্রিটিশদের মতো হস্তক্ষেপ করত। সপ্তদশ শতকের শেষে দেখা গেল ডাচ কোম্পানী তাদের মনোনীত প্রার্থী বা ব্যক্তিকে উভয় রাজ্যের শাসক নিযুক্ত করছেন। এই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অঞ্চলের নিরাপত্তা প্রদান। এইভাবে কিছু অঞ্চলে প্রত্যক্ষ শাসন ও দূরবর্তী অঞ্চলে অছি দ্বারা প্রশাসন চালিয়ে ১৭৭০ সালের মধ্যে VOC সমগ্র জাভার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, যা একসময়ে বান্টম ও মাতারমের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

৬৫.৬ ডাচ বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণ ও তার প্রকৃতি

ডাচরা জাভায় কোন নতুন রাজনৈতিক কাঠামো নির্মাণ করেনি। ইন্দোনেশিয়ার প্রাচীন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো অব্যাহত রেখে ডাচরা জাভার দেশীয় রাষ্ট্রপ্রধান ও কোম্পানির মধ্যে যে কোন মারাত্মক সংঘর্ষ এড়িয়ে যেতে পেরেছিল। শাসক ও শাসিতের মধ্যে ঐতিহ্যগত সম্পর্কে কোন পরিবর্তন আসেনি। এই অপ্রত্যক্ষ ও রীতি বহির্ভূত শাসনের মধ্যে দিয়ে যেমন অনিবার্যভাবে সমগ্র জাভায় ডাচ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিতও হল আবার তেমনই আশ্চর্যভাবে লোকক্ষয় ও রক্তপাত ও অর্থক্ষয় হল না। স্থানীয় শাসকরাই নিয়ন্ত্রণ করতেন বাণিজ্য। তারা কৃষক প্রজাদের কাছে সর্বময় প্রভু হয়ে উঠলেন। এই প্রশাসক বণিকরা VOC-র অনুমোদিত বাণিজ্যরীতি মেনে চলতেন। এই শাসকরা অন কোন পাশ্চাত্য গোষ্ঠীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করলে তারা সঙ্গে সঙ্গে শাসনক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হতেন। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে এরা VOC-র জবরদস্তি যোগানদারে পরিণত হয়েছিলেন যাদের বলা হত Leverinen। এরা স্থানীয় বন্দরে কোম্পানী গুদামঘরে (warehouse) নির্দিষ্ট ওজনের পণ্যদ্রব্য নির্দিষ্ট মূল্যে সরবরাহ করতেন। এইভাবে বান্টম নির্দিষ্ট পরিমাণ গোলমরিচ এবং মাতরম মাদুরার শাসন নির্দিষ্ট পরিমাণ চাল সরবরাহের জন্য দায়বদ্ধ ছিল। এই ব্যবস্থা পরে আরো বিধিবদ্ধ রূপ নিয়েছিল এবং আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছিল। ১৮৩০ সালের থেকে ভ্যান ডেন বস তাঁর এই ব্যবস্থা "কালচার সিস্টেম" জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম জাভার প্রেয়াঙ্গার, আমবোয়ানা, বান্দা প্রভৃতি ডাচ শাসনে চলে আসে এবং এখানকার কৃষকরা রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনে বাধ্য হয়। এই শতকের মধ্যভাগে জাভার যেসব অঞ্চলে মশলার উৎপাদন হত সেখানে কফি, নীল, আখ প্রভৃতি চাষ মশলার মতো সমান গুরুত্বপূর্ণ হারে করা হতে থাকে। ইউরোপীয় বাজারে চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে পণ্যের আকার ও দাম নির্ধারিত হতে থাকে। গরিব চাষীদের অনেক সময় উচ্চমূল্যে আমদানিকৃত চাল কিনতে হত VOC-র প্রত্যক্ষ প্রশাসনাধীন অঞ্চলে মশলার যেমন জায়ফল, লবঙ্গ প্রভৃতির অতিরিক্ত উৎপাদন বন্ধ করে তা কিছু কিছু অঞ্চলে সীমাবদ্ধ করা হয়। এছাড়া পাহারাদারী জাহাজগুলিও নিষিদ্ধ অঞ্চলে মশলার গাছগুলিকে বিনষ্ট করে দিত।

৬৫.৬.১ বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণের ফলশ্রুতি

এইভাবে ব্যাপক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ডাচরা একদিকে যেমন নিরঙ্কুশ বাণিজ্যিক একাধিপত্য লাভ করে তেমনই ডাচ রণতরী অনেক দক্ষ হয়ে ওঠে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় দ্বীপপুঞ্জ ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানে এইভাবে ডাচরা বিশিষ্ট স্থানাধিকার করে। তবে এর ফলে জাভার স্থানীয় শিল্প ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অ-রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন মার খেতে থাকে। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে ডাচ উপস্থিতিতে জাভার স্থানীয় উৎপাদন ও শিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। ডাচরা শুধুমাত্র বাণিজ্য ও লাভের উপর সবিশেষ জোর দেবার ফলে ইন্দোনেশিয়ার ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। এমন কি উপকূলবর্তী কিংবা মূল ভূখণ্ড কোথাও পাশ্চাত্য প্রভাব দেখা গেল না। অথচ ডাচ আগমনের ফলে এটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত জনজীবন ইউরোপীয় প্রভাবমুক্ত ছিল। জাভার সংস্কৃতিকে ওলন্দাজ শাসন প্রভাবিত করতে পারেনি। কয়েক শতক পূর্বে ওলন্দাজ আগমনের পূর্বে যেমনটি ছিল তেমনই চলছিল। ডাচ উপনিবেশিক প্রশাসক যারা এখানে বাণিজ্য চালাচ্ছিলেন তাদেরও এই অঞ্চলের বিখ্যাত সংস্কৃতি সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। এমনকি ঊনবিংশ শতকের সূচনার সময়কালেও ডাচরা ইন্দোনেশিয়ার বৌদ্ধ ধর্মান্দোলন সম্পর্কে কিছুই জানত না। এছাড়া জাভার কেন্দ্রে যোগীয়াকার্তার (Yogyakarta) কাছে যে বিশ্ববিখ্যাত বরোবদুরে বৌদ্ধ স্তূপটি রয়েছে তার সম্পর্কেও অজ্ঞাত ছিল। এই স্তূপের আবিষ্কার হল নেপোলিয়নের যুদ্ধের পর ব্রিটিশদের দ্বারা। যখন ব্রিটিশরা ইন্দোনেশিয়ায় তাদের ঔপনিবেশিক ভূমিকা পালন করতে শুরু করে তখনই উন্মোচিত হয় জাভার এই বিশাল বিখ্যাত সংস্কৃতিক সম্পদ।

৬৫.৬.২ স্থানীয় জনজীবনের উপর ওলন্দাজ বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণের প্রভাব

তবে যেসব জায়গা VOC প্রত্যক্ষ প্রশাসনের আওতায় ছিল যেখানকার জনজীবন ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত। কারণ সেখানকার মানুষ এই ডাচ কোম্পানির জন্য বাণিজ্যিক ফসলের উৎপাদন থেকে শুরু করে পণ্য গুদামজাত

করা পর্যন্ত সবই কাজ করত। এই অতিরিক্ত পরিশ্রম সাধারণ জীবনযাত্রার কোন হিত সাধন করেনি। ডাচরা উৎপাদিত পণ্য যতটা সম্ভব উচ্চমূল্যে ইউরোপের বাজারে বিক্রয় করত এবং সর্বনিম্ন মূল্যে এশিয়া বাজারে ক্রয় করত। এইভাবে ডাচ কোম্পানি যেমন বাণিজ্যিক আধিপত্য স্থাপন করেছিল তেমনভাবে বঞ্চিত করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় উপদ্বীপের কৃষক সমাজের। কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল দুইভাবে, প্রথমত, তারা মরশুমের (seasonal) ফসলের পরিবর্তে অর্থাৎ তাদের প্রয়োজনীয় শস্যের উৎপাদনের পরিবর্তে বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদন করতে বাধ্য হত। এতে তাদের খাদ্যাভাব বৃদ্ধি পেত। দ্বিতীয়ত, উৎপাদিত পণ্যে বিক্রিত মূল্যের উপর তারা কোন লাভ পেত না। বাণিজ্যের পুরোলাভটাই যেত ডাচ কোম্পানীর কাছে। বিদেশী বাণিজ্যের কোন অধিকার স্থানীয় মানুষের ছিল না আর তারা নিজভূমিতে উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়মূল্য সর্বনিম্ন হারে পেত। ডাচ কোম্পানীর শাসনকালে ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ কৃষকসমাজ খুবই নিপীড়িত ও অসহায় হয়ে পড়েছিল।

৬৫.৭ ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতিতে ডাচ বাণিজ্যের প্রভাব

ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতিকে ব্যবহার করে ডাচ কোম্পানি যে অসম্ভব আর্থিক শক্তি সঞ্চয় করেছিল তার পরিবর্তে ইন্দোনেশিয়া অর্থনীতির সামান্যতম বিকাশ বা উন্নয়নের চেষ্টা ডাচ কোম্পানির পক্ষ থেকে দেখা যায়নি। ইন্দোনেশিয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দুইভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল বাণিজ্যিক অর্থনীতি ও কৃষিজ অর্থনীতি। ডাচরা একাধিপত্য স্থাপন করেছিল বাণিজ্যে ফলে স্থানীয় দেশীয় বাণিজ্য, পণ্যশিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। কিছু দেশীয় বাণিজ্যপথ রুদ্ধ হয়ে যায় আর কিছু পথে ডাচ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়। দেশীয় শিল্প, বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত কিছু মানুষ সরবরাহের কাজে লিপ্ত হয় অর্থাৎ ডাচ কোম্পানিগুলির দালালে পরিণত হয়, কেউ জলপথে বাণিজ্যের লভ্যাংশ আদায় করতে জলদস্যুবৃত্তি নেয়। এই জলদস্যুতা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইন্দোনেশিয়ার উত্তর-পশ্চিমে সুলায়াসীর বুগীদের জীবনযাত্রা বিশেষ করে নির্ভরশীল ছিল Peddler system ফেরী ব্যবস্থা অর্থাৎ এক স্থানের পণ্য অন্যত্র সরবরাহের উপর আর এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ডাচ কর্তৃত্ব। এছাড়া বুগীরা জলপথে বাণিজ্য করত। তাদের জীবিকা নির্বাহের এই ক্ষেত্রটিও ডাচ কর্তৃক অধিকৃত হয়েছিল। ডাচদের বাণিজ্যেক একচেটিয়া অধিকার এই উপদ্বীপের জীবনযাত্রায় প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিল।

৬৫.৮ সারাংশ

আলোচ্য এককটিতে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতাবাদের দুটি পর্যায় আলোচিত হয়েছে। পর্তুগীজরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্রই ঘাঁটি স্থাপন করলেও কোন স্পষ্ট বাণিজ্যিক কাঠামো নির্মাণ করেনি। ব্যতিক্রমীভাবে ডাচ তথা

ওলন্দাজরা বাণিজ্য কোম্পানির নেতৃত্ব ইন্দোনেশিয়াতে নিয়ে এল রূপান্তর। এই রূপান্তর কিন্তু নিতান্তই বাণিজ্যিক প্রয়োজনে গৃহীত হয়েছিল। ইন্দোনেশিয় দ্বীপপুঞ্জের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে কোন প্রয়াস বা পদক্ষেপ গৃহীত হতে দেখা যায়নি।

৬৫.৯ অনুশীলনী

ক। **বিষয়মুখী প্রশ্ন :**

১। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কি নামে অভিহিত হত?

২। মালাক্কা কত সালে অধিকৃত হয়?

৩। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় উপমহাদেশে অভিযানের মূলে কিসের আকর্ষণ কাজ করেছিল?

৪। উপমহাদেশে প্রাপ্ত মশলাগুলির নাম লিখুন।

৫। পর্তুগীজ মিশনারীরা এখানে কি কি কাজ করতেন?

৬। পর্তুগীজ জনসংখ্যা হ্রাসের কারণগুলি কি কি ছিল এই উপমহাদেশে?

৭। পর্তুগীজ অভিযাত্রীদের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদবাক্যটি কি?

৮। একটি ওলন্দাজ পূর্ব ভারত কোম্পানির নাম লিখুন।

৯। কত সালে প্রাচ্যে প্রথম ডাচ বাণিজ্যতরী উপস্থিত হয় এবং কোথায়?

১০। জাভার বিশাল সাংস্কৃতিক সম্পদটি কি?

খ। **সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :**

১। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমাজ ও সংস্কৃতির উপর আলোকপাত করুন।

২। প্রাচ্য দেশ আবিষ্কারের মূলে কী কারণ ছিল?

৩। পর্তুগীজরা সমুদ্রযাত্রায় কেন পারদর্শী হয়ে উঠেছিল?

৪। পর্তুগীজ মিশনারীদের কার্যকলাপ বর্ণনা করুন।

৫। ডাচ বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি কী রূপ ছিল?

গ। **দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :**

১। ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতিতে ডাচ বাণিজ্যের প্রভাব কী ছিল?

২। ডাচ কর্তৃত্ব স্থাপনে V.O.C.-র ভূমিকা বর্ণনা করুন।

৩। পর্তুগীজ বাণিজ্যিক কার্যকলাপ আলোচনা করুন।

৪। ডাচ বাণিজ্যিক সংগঠনের উপর একটি চিত্র প্রস্তুত করুন।

৬৫.১০ গ্রন্থপঞ্জী

1. Milton Osborne—South-East Asia—An Introductory History. George Allen and Unwin 1979
2. Lea E. Williams—South-East Asia—A History, O.U.P. 1976.
3. D. R. Sardesai—South-East Asia—Past and Present, Vikas Publishing 1981.
4. J. F. Cady—South-East Asia—Its historical developments. Mcgraw Hill 1979.
5. M. N. Venkata Ramanappa—Modern Asia, Vikas Publishing 1979.

একক ৬৬ ☐ ব্রহ্মদেশ ও মালয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আগ্রাসন

গঠন

- ৬৬.০ উদ্দেশ্য
- ৬৬.১ প্রস্তাবনা
- ৬৬.২ ইঙ্গো-ব্রহ্ম বিরোধিতার কারণ
- ৬৬.৩ বর্মার সমাজব্যবস্থা ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী
  - ৬৬.৩.১ বর্মী রাজতন্ত্রের উপর এই জাতিগোষ্ঠীর প্রভাব
  - ৬৬.৩.২ ব্রহ্মের কুনবঙ রাজতন্ত্র ও ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ
  - ৬৬.৩.৩ প্রথম ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুগের কারণ
  - ৬৬.৩.৪ যুদ্ধের ফলাফল
- ৬৬.৪ দ্বিতীয় ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধের কারণ
  - ৬৬.৪.১ দ্বিতীয় যুদ্ধ ও ফলশ্রুতি
  - ৬৬.৪.২ ব্রহ্মরাজ মিন্দন ও ইঙ্গো-ব্রহ্ম সম্পর্ক
- ৬৬.৫ তৃতীয় ইঙ্গোব্রহ্ম যুদ্ধের কারণ
  - ৬৬.৫.১ থিবো ও ব্রহ্ম-ফরাসী সম্পর্ক
  - ৬৬.৫.২ তৃতীয় ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধ ও বম্বে-বর্মা ট্রেডিং কোম্পানির ভূমিকা
- ৬৬.৬ মালয়ী রাজ্যে ঔপনিবেশিকতার সূচনা
  - ৬৬.৬.১ ইন্দোনেশিয়-মালয়ী সাম্রাজ্যে ডাচ্ আধিপত্য
  - ৬৬.৬.২ ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়া
  - ৬৬.৬.৩ ব্রিটিশ গভর্নর র‍্যাফেলসের ভূমিকা
  - ৬৬.৬.৪ র‍্যাফেলসের কার্যকলাপের ফলাফল
  - ৬৬.৬.৫ তাঁর নীতির সীমাবদ্ধতা
- ৬৬.৭. মালয়ী রাজ্যে ওলন্দাজদের পুনরুত্থান
  - ৬৬.৭.১ সিংগাপুরের প্রতিষ্ঠা

    ৬৬.৭.২ সিংগাপুরের বাণিজ্যিক গুরুত্ব
    ৬৬.৭.৩ ১৮২৪ সালের চুক্তি ও মালয়ী রাজ্যে ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠা লাভ
    ৬৬.৭.৪ ১৮২৪ সালের পরবর্তী সমস্যাগুলি
    ৬৬.৭.৫ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি
    ৬৬.৭.৬ মালয়ী ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা
৬৬.৮ সারাংশ
৬৬.৯ অনুশীলনী
৬৬.১০ গ্রন্থপঞ্জী.

৬৬.০ উদ্দেশ্য

বর্তমান এককটি পাঠ করে আপনারা ব্রহ্মদেশ (বর্মা) ও মালয়ের রাজতন্ত্র ও সমাজব্যবস্থার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি অবগত হবেন—

- বর্মা ও মালয়ের বহুজাতিভিত্তিক সমাজ।
- বর্মার রাজতন্ত্রের এবং মালয়ের সুলতানী রাজ্যগুলির ঐতিহ্য।
- দুটি রাষ্ট্রে ব্রিটিশ বণিকদের সুবিধালাভের জন্য প্রচেষ্টা।
- পরস্পর তিনটি যুদ্ধে বর্মাকে ভারতের প্রদেশে পরিণত করা।
- মালয়ী রাজ্যের উপর ভারতস্থিত ইন্ডিয়া অফিসের অধিকার স্থাপন এবং পরে মালয়ী ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা।

৬৬.১ প্রস্তাবনা

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত ব্রহ্মদেশ ইউরোপীয় প্রসারণের ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ইউরোপীয় প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল দ্বীপপুঞ্জগুলিতে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মূল ভূখণ্ড অঞ্চল যেমন ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড প্রভৃতি অংশে ঐতিহ্যবাহী রাজতন্ত্রের দ্বারা প্রসাশন পরিচালিত হত। তাই বর্মায় কেন্দ্রীভূত রাজতান্ত্রিক একটা ঐতিহ্য ছিল। এখানে ছিল জাতি উপজাতি দ্বন্দ্ব, তাদের অনৈক্য ছিল ব্রহ্মদেশের জটিল সমস্যা। এই রাজনৈতিক সংহতিকরণের প্রয়াস ব্রহ্মদেশে পরিবর্তনের সূচনা করে। ইতিপূর্বে বর্মায় তথা ব্রহ্মে সংঘর্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা হয়েছে থাইল্যান্ডের সঙ্গে এবং বহুবার থাই-বর্মী যুদ্ধও সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু অষ্টদশ শতকের

শেষভাগে এক শক্তিশালী রাজতন্ত্রের উত্থান বর্মায় রাজনৈতিক সংহতি নিয়ে আসে। তবে শক্তিশালী ইউরোপীয় উপনিবেশিকদের কাছে এই রাজতন্ত্র কিন্তু ততটা ক্ষমতাশালী ছিল না। যদিও এই রাজতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে ছিল বর্মার প্রসারিত অঞ্চল। সুবিন্যস্ত অর্থনীতি তবুও তা ঔপনিবেশিক ইউরোপীয় শক্তির কাছে নিতান্তই অপ্রতুল ছিল। তাই দেখা গেল শক্তিশালী টৌঙ্গু রাজতন্ত্র (১৫৩১-১৭৩২) এবং কনবঙ রাজতন্ত্র (১৭৭২-১৮৮৫)-কে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের হাতে বর্মাকে ছেড়ে দিতে হয়। তবে ব্রিটিশ প্রসারণ এখানে দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়েছিল। তিনটি ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধে ১৮২৪, ১৮৫২, ১৮৮৫ বর্মায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রসারণ সম্পন্ন হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় উপমহাদেশের দ্বীপ অঞ্চলগুলির মধ্যে খনিজ ও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রের মধ্যে মালয় বা মালয়েশিয়া অন্যতম। ১৫১১ সালে তৎকালীন মালয়ের অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল মালাক্কা অধিকার করে নেয় পর্তুগীজরা। মালাক্কা মশলা বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রও হয়ে ওঠে। ১৬২০ সালের মধ্যে এখানে ওলন্দাজদের প্রাধান্য হ্রাস পায় এবং ব্রিটিশ আগ্রাসন শুরু হয়। ১৭৮৬ সালে মালয়ী দ্বীপ পেনাঙ (Penang) অধিকার করে নেয় ব্রিটিশরা এবং ১৮২৪ সালের মধ্যে সিঙ্গাপুর ব্রিটিশ অধিকারে চলে আসে।

ওলন্দাজরা প্রধানত মশলা ব্যবসায়ে নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিল কিন্তু ব্রিটিশরা ব্রহ্মদেশ থাইল্যান্ড প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উপমহাদেশের মূল ভূখণ্ড (mainland states) অঞ্চলগুলির সঙ্গে দ্বীপ অঞ্চল (meritime states)-গুলিতেও ঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশ করে এবং ভৌমিক (territorial), আর্থিক আগ্রাসন সম্পূর্ণ করে। ঔপনিবেশিক যুগে এই বৈশিষ্ট্য সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। ঔপনিবেশিক যুগে বিভিন্ন পশ্চিমী শক্তির দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায়। একইভাবে মালয়ী রাষ্ট্রেও ডাচ-ব্রিটিশ সংঘর্ষও ঘটল। ১৮২৪ সালে দেখা গেল চুক্তির মাধ্যমে দুটি শক্তি নিজ প্রভাবাধীন অঞ্চলে ব্রিটিশরা মালয়ে এবং ডাচরা ইন্দোনেশিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

৬৬.২ ইঙ্গো-ব্রহ্ম বিরোধিতার কারণ

অষ্টাদশ শতকে ব্রহ্মের শাসক সম্প্রদায় বিশ্বাস করতেন যে আসাম, মণিপুর এবং আরাকান প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে বর্মায় পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গঠিত এবং এখানে বর্মী প্রশাসন বজায় থাকবে। অথচ প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে যে ন্যূনতম স্বাভাবিক পদক্ষেপ গৃহীত হওয়া প্রয়োজন তাও নেওয়া হয়নি। শুধু রাজতন্ত্রের পক্ষ থেকে এটা আশা করা হত যে এই প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে আবশ্যিকভাবে রাজকীয় কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে বজায় থাকবে।

অন্যদিকে ভারতবর্ষে এই সময়ে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রসারিত হচ্ছিল কাজেই কোন এক সময়ে ইন্দো-ব্রহ্ম পরস্পরের প্রান্তসীমা স্পর্শ করবে এতো স্বাভাবিক। বর্মার এই প্রত্যন্ত আঞ্চলিক সীমা যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করতে পারে এটাও বর্মার রাজতন্ত্রের পক্ষ থেকে ভাবা হয়নি। এই প্রান্তসীমায় বর্মা

ও ভারত উভয়ের ভূখণ্ড সামিল ছিল। ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়ের স্বার্থ যে মুহূর্তে ক্ষুণ্ণ হবে তখনও যে সংকট সৃষ্টি হবে এটা অনিবার্য। তাই খুব ধীরে হলেও অবশ্যম্ভাবীভাবে ব্রিটিশ-ব্রহ্ম সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগল।

যদিও প্রথমদিকে এই সীমান্ত সমস্যা একটা সমাধান বন্ধুত্বপূর্ণ উপায়ে করা হয়েছিল। কিন্তু ব্রহ্মের রাজাদের মধ্যে রাজকীয় অহঙ্কার ও গর্বের এবং বোধ পতন ডেকে আনল। কারণ self-glorification ছিল তাদের আগ্রাসী মানসিকতার মূল কেন্দ্র। ব্রহ্মের রাজতন্ত্রের মধ্যে অহমিকা বোধের সঙ্গে সংঘর্ষ লেগেছিল ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়ের স্বার্থের। এই শ্রেণী কোনভাবেই নিজ বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হোক চায়নি আবার এটাও চায়নি অন্য কোন বণিজ্যগোষ্ঠী ব্রহ্মের বাণিজ্যে ভাগ বসাক। তাদের ভীতি, তাদের আশংকা, স্বার্থ প্রভৃতি মিলেমশে এমন এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করল যা শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করল ব্রহ্মদেশের সংযুক্তিকরণে।

৬৬.৩ বর্মার সমাজব্যবস্থা ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী

বর্মায় বিদ্যমান ছিল বহুজাতিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। বহু জাতি উপজাতি দ্বন্দ্বে জর্জরিত ছিল ব্রহ্মদেশ। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি জাতিগোষ্ঠী ছিল শান ও মোন। এদের অন্তর্কলহ প্রায়শই ব্রহ্মদেশকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখত। এই মোন উপজাতির অনেক অবদান ব্রহ্মের সমাজব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। মোন লিপি ছিল বর্মী লিপিমালার আধার। মোন শিল্পী ও স্থপয়তিরা বর্মার বহু ধর্মমন্দির স্তূপ নির্মাণ করেছিল। এছাড়া বর্মার বহির্বাণিজ্য এই মোন জাতিই পরিচালনা করত। বর্মার সংস্কৃতির অগ্রদূত ছিল এই মনে জাতি। এদের আদি বাসভূমি ছিল দক্ষিণ বর্মার পেগুতে ও শান গোষ্ঠী ছিল থাই জাতিভুক্ত যারা থাকত উত্তর-পূর্ব বর্মায়। এই উত্তর ও দক্ষিণাংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতাই ছিল বর্মার ইতিহাসের মূল ঘটনা। এদের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ বার বার বর্মার রাজতন্ত্রকে হস্তক্ষেপে বাধ্য করত। রাজতন্ত্রের মধ্যে জাতিগোষ্ঠীকে একত্রিত করে রাখার একটা প্রবণতা দেখা যায়।

৬৬.৩.১ বর্মী রাজতন্ত্রের উপর এই জাতিগোষ্ঠীর প্রভাব

শান ও মোন ছাড়া বর্মন নামেও এক জাতিগোষ্ঠী ছিল যারা মোনদের সঙ্গে বিরোধীভাবাপন্ন ছিল। ১২৮৭ সালে মোঙ্গল আক্রমণে ইরাবতী নদীতীরে বর্মার প্রাচীন রাজধানী 'পাগান'-এর পতন হলে এই বর্মনগোষ্ঠী খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তথা রাজনৈতিক ভাবেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। টৌঙ্গু রাজবংশের সময় (১৫৩১-১৭৩২) তারা পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়। টৌঙ্গু বংশের পতনের পর দুই দশক তারা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা কাটিয়ে বর্মায় শেষ রাজবংশ কুনবঙ রাজতন্ত্রের উত্থানের সঙ্গে নিজেদের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। টৌঙ্গু রাজতন্ত্রের সময়ে বর্মন ও মোনরা একত্রিত হয়ে প্রশাসন পরিচালনা করে। কারণ টৌঙ্গু রাজতন্ত্র সামাজিক উন্নয়নে এবং পুনঃ ঐক্যকরণে মোন জাতির সহায়তাকে স্বীকার করেছিলেন। তাঁর (Tabinshweti—Tongu King) উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বর্মন ও মোন জাতির সম্মিলিত সহায়তা।

টোঙ্গু রাজতন্ত্রের আমলে কয়েকবার থাইল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়। প্রথম দিকের কিছু যুদ্ধে থাইল্যান্ড পরাজিত হলেও ষোড়শ শতকের শেষভাগে থাইল্যান্ড দক্ষিণ বর্মার বন্দর মৌলমিয়েন অধিকার করে। এই সময়ে শান ও মোন বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

সপ্তদশ শতকে দুটি বিবাদমান রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। উভয় রাষ্ট্র সংহতি ও শান্তির প্রতি মনোনিবেশ করে। এই সময়েই উভয় রাষ্ট্রে বিদেশী বণিকদের পদধবনি শোনা যায়। ব্রিটিশ, ফরাসী ওলন্দাজদের বাণিজ্যতরী একের পর এক এখানকার বন্দরে ভিড় জমাতে থাকে।

সপ্তদশ শতকে ব্রহ্মের রাজধানী উত্তর ব্রহ্মের আভায় (Ava) স্থানান্তরিত হয়েছিল। আপনারা আগেই জেনেছেন টোঙ্গু রাজতন্ত্র মোন জাতিগোষ্ঠীর সহযোগিতা নিয়েছিল। রাজতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় মোন জাতিও আধিপত্য বিস্তার করেছিল টোঙ্গু রাজতন্ত্রে। ১৭৫২ সালে মোন বিরোধী বর্মনরা নতুন নেতা আলংপায়ার নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হয় যিনি মোন আধিপত্য স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। আলংপায়ার মোন বিরোধিতা বর্মনদের উৎসাহিত করে এবং তারা আলংপায়ার সঙ্গে সমবেত হন। এইভাবে আলংপায়ার অধীনে এক বিশাল সংখ্যার সামরিক বাহিনী তৈরি হয়। তিন বছরে মধ্যে তনি মধ্যবর্মা, পেগু ও দাগন অধিকার করেন। আলংপায়া দাগন অঞ্চলটির নাম পরিবর্তন করে রাখেন রেঙ্গুন অর্থাৎ যুদ্ধের শেষ Rangoon (end of war)।

এখানে আপনাদের একটি তথ্য জানা দরকার যে পাগান-এর পতনের পর মোনরা নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করে। মোন জাতি তাদের সমাজকে অনেক নেতা উপহার দিয়েছিল। আপনারা আগেই জেনেছেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে সমাজব্যবস্থায় নারীর স্থান ছিল অনেক উর্ধ্বে। মোন নেত্রী সিন সোবু (Shin Sowbu 1453-1472) ছিলেন বর্মার একমাত্র রানী। তাঁর আদেশানুসারে দাগন গ্রামের সিউ দাগন প্যাগোডার সংস্কার হয়। রানী তাঁর ওজনের সমপরিমাণ সোনা দান করেছিলেন এই ৩০২ ফুট উচ্চ প্যাগোডার শীর্ষভাগ তথা চূড়াটিকে সোনার পাতে মুড়ে দেবার জন্য। পরবর্তীকালে ব্রহ্মরাজ মিন্দন-এর সময়ে অর্থাৎ উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে এই প্যাগোডার চূড়ায় একটি রত্নখচিত ছাতা স্থাপন করা হয়।

৬৬.৩.২ ব্রহ্মের কুনবঙ রাজতন্ত্র ও ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ

সুতরাং আলংপায়ার নেতৃত্ব বর্মনদের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় কুনবঙ রাজতন্ত্র। তাঁর সময়ে মোন জাতির সঙ্গে যে সংঘর্ষ উপস্থাপিত হল তাতে অধিকৃত হল দাগন যা পরে রেঙ্গুন নামে পরিচিত হল। এই সময়ে কনবঙ (Konbaung) রাজতন্ত্র ও মোনজাতির আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের সুযোগে ১৭৫৩ সালে ব্রিটিশরা বা ব্রিটিশ-পূর্ব ভারত কোম্পানি (British East Company) দখল করে নেয় বর্মার একটি দ্বীপঅঞ্চল নেগ্রাইস (Negrais)।

বঙ্গোপসাগরে ফরাসি কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা এবং বর্মী বণিজ্যভাণ্ডার দখল করার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের। এখানে ইরাবতী নদীপথে বর্মার বণিজ্যিক পণ্য রাখা হত। তাই এই দ্বীপটি ছিল ব্রিটিশদের কাছে সামরিক ও অর্থনৈতিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

আলংপায়া প্রথমে নম্রভাবে একটি পত্রে ব্রিটিশরাজ দ্বিতীয় জর্জকে ব্রিটিশ অনাধিকার প্রবেশ সম্পর্কে জানিয়ে কোন প্রত্যুত্তর পেলেন না। তখন তিনি একটি খবর পান যে ব্রিটিশরা মোন গোষ্ঠীকে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে উৎসাহিত করছে, এই খবর তিনি মোন যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। এই অবস্থায় আলংপায়া নেগ্রাইস দ্বীপে অধিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লোকজনের উপর হামলা করতে বর্মী সামরিক বাহিনীকে আদেশ দেন।

ইংরেজরা এই সময়ে ভারতবর্ষে ফরাসিদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল বলে এখানে বেশি সময় ব্যয় না করে প্রায় তিনদশকের জন্য বর্মাকে ছেড়ে চলে যায়। এই শতাব্দীর শেষভাগে চীনের সঙ্গে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৭৯৫ সালে ব্রিটিশ বাণিজ্য মিশন বর্মায় উপস্থিত হয়। ক্যাপ্টেন মাইকেল সিমসের (Captain Michael Symes) নেতৃত্ব এই মিশনের উদ্দেশ্য ছিল বর্মার মধ্যে ব্রিটিশ ও চীনের বাণিজ্য পরিচালনা করা। তবে প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বর্মায় কোন ফরাসি কার্যকলাপ-এর অস্তিত্ব আছে কিনা তা পরীক্ষা করা। ঊনবিংশ শতকের প্রথমে সিমস দ্বিতীয়বার বর্মায় আসেন এবং রিপোর্টে বলেন বর্মার ও চীনের তুলো যদি ব্রিটেনে পাঠানো যায় তবে তা ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্পের খুবই সহায়ক হবে। কিন্তু মূল বিষয়টি ছিল অনেক গভীরে। বর্মাকে ফরাসি প্রভাবমুক্ত রাখার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের। বর্মার বাণিজ্য নিয়ে তাদের আগ্রহ ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় রাজাদের সমপর্যায়ে ব্রহ্মের রাজাকে আওতাভুক্ত করা। ভারতীয় রাজন্যবর্গ যেমন ব্রিটিশ আধিপত্য স্বীকার করে নিয়েছে এবং ভারতে ব্রিটেনের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ফরাসি আধিপত্য বিলুপ্ত হয়েছে। ব্রহ্মেও তেমন চিত্র তাঁরা দেখতে চেয়েছিলেন।

৬৬.৩.৩ প্রথম ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধের কারণ

বাস্তবিক পক্ষে সমগ্র ঊনবিংশ শতকে একটি প্রশ্নে ইঙ্গো-ব্রহ্ম সংঘর্ষ চলতে থাকে তা হল চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী কে হবে? ব্রিটিশ না বর্মী রাজতন্ত্র? ব্রিটিশরা যেমন ভারতীয় রাজাদের নিজ অধীন করে ফেলেছে সেই স্তরে বর্মী রাজাকে নামাতে বা নামিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে তেমনভাবে বর্মী রাজতন্ত্রও নিজ সার্বভৌমত্ব রক্ষাকল্পে যাবতীয় উপায়ের অবলম্বন করলেন ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল।

আলংপায়ার আট বছরের দীর্ঘ সময়কালে মোনদের বিরুদ্ধে এবং আরাকান, মণিপুর, শানরাজ্য প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক যুদ্ধাভিযান হয়। তাঁর সুযোগ্য পুত্র বোদাপায়ায় সময় শ্যাম দেশে শক্তিশালী চক্রী রাজবংশের উত্থানের পর বর্মার যুদ্ধাভিযানের দিক পরিবর্তিত হয়। বর্মা পুর্বদিকের পরিবর্তে পশ্চিমদিকে তথা ভারত

অভিযানে মন দেন একই সঙ্গে রাজ্যিক প্রশাসনে কোনবঙ রাজতন্ত্র সচেষ্ট হয়। সীমান্তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা বর্মী নিয়মের লঙ্ঘন করছে এই যুক্তিতে বোদাপায়া আসামকে সংযুক্ত করার জন্য অভিযান পরিচালনা করলেন। মণিপুররাজ ১৮১৯ সালে নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন এবং বোদাপায়ার রাজ্যভিষেকে উপস্থিত হতে অস্বীকার করেন। এবার বর্মী রাজতন্ত্রের এই প্রসারণে ভীত হয়ে তিনি কাছাড় অঞ্চলে পালিয়ে যান। এই কাছাড় ছিল ব্রিটিশ দ্বারা সুরক্ষিত অঞ্চল।

ইতিপূর্বে নেপোলিয়ানে যুদ্ধ, মারাঠা, মহীশূর ও ফরাসিদের সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে ব্রিটেন বর্মার কার্যকারিতার ব্যাপারে মন দেয়নি। কিন্তু ১৮১৫-র পর ব্রিটেন সামুদ্রিক শক্তি হিসাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে ওঠে এবং ১৮১৮ সালের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষের একমাত্র রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের বর্মী আক্রমণ তথা প্রসারণকে প্রতিহত করতে উদ্যত হ'ল।

৬৬.৩.৪ যুদ্ধের ফলাফল

১৮২৪ সালের মার্চ মাসে সংঘটিত হ'ল প্রথম ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধ। যুদ্ধে ব্রিটিশ দ্বারা রেঙ্গুন অধিকৃত হয় এবং বর্মা আসাম ও মণিপুরের ওপর অধিকার ত্যাগ করে এবং ভারতস্থিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে ব্রহ্ম উপকূলবর্তী অঞ্চল, তেনাসেরিম ও আরাকান ছেড়ে দেয়। রাজধানী আভা থেকে পঞ্চাশ মাইল ভিতরে ইয়ান্দবু নামক স্থানে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে বর্মা থাইল্যান্ড বা শ্যামে সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করবে না বলে স্বীকৃত হয়। এছাড়া এক মিলিয়ান পাউন্ড যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দেয়। বর্মার রাজধানীতে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট রাখতে স্বীকৃত হয়।

ব্রিটেন এইভাবে বর্মার সঙ্গে রাজনৈতিক গোলোযোগের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ের আধিপত্য স্থাপন করে। ভারতস্থিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এর পর বর্মায় বাণিজ্যিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী পদক্ষেপ নিল। যদিও সরকারি চিঠিপত্রে দেখা যায় যে তেনাসেমি ও আরাকান অঞ্চল ব্রহ্ম রাজতন্ত্রকে প্রত্যার্পণে কথা ছিল সেই শর্তে যখন ব্রহ্মরাজ যুদ্ধ ক্ষতিপূরণের অর্থ পুরো দেওয়া হয়ে যাবে। অথচ ১৮৩০ সালের মধ্যে দেখা গেল এই আরাকানে উৎপন্ন হল প্রচুর ধান। এবার বর্মার বনজসম্পদ বিশেষ করে সেগুন কাঠ ও চাল রপ্তানির জন্যে নির্মিত হল বন্দর। তেনাসেরিমে মৌলমিয়েন প্রতিষ্ঠিত বন্দরটি ব্রিটিশ বাণিজ্যিক কাজকর্ম পরিচালিত করত। তাই ব্রিটিশদের পক্ষে আরাকান এবং তেনাসেরিম পুনরায় ব্রহ্ম রাজতন্ত্রকে ফেরৎ দেওয়া একান্তই কঠিন হয়ে উঠল। অথচ ব্রহ্মরাজ বোদাপায়া খুবই ধৈর্য্য ও নম্রতার সঙ্গে প্রতীক্ষা করছিলেন এই দুটি অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব পুনরায় ফিরে পাবার জন্য অথচ ইংরেজদের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি পালনের কোন প্রয়াস পরিলক্ষিত হ'ল না। এইসময়ে বোদাপায়ার বিরুদ্ধে প্রাসাদের অভ্যন্তরে ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হ'ল। ভ্রাতা থারওয়াদির নেতৃত্বে একটি বিপ্লব ঘটে এবং ১৮৩৭ সালে বোদাপায়া সিংহাসনচ্যুত হন।

৬৬.৪ দ্বিতীয় ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধ

ইতিমধ্যে বর্মাকে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য করার ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা চলতে থাকে। কারণ চীনের বিপুল জনসংখ্যা ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার, ল্যাঙ্কাশায়ার, ইয়র্কশায়ারের উৎপাদিত বস্ত্রের বিক্রির জন্য এক সম্ভাবনাময় বাজার সৃষ্টি করেছিল। নানকিং চুক্তিতে চীনের পাঁচটি বন্দরের উপর ব্রিটেন অধিকার লাভ করে পশ্চিমী বাণিজ্য পণ্য রপ্তানির রাস্তাও পেয়ে যায়। এখন প্রথম ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধের পর বর্মাকে চীনের এই বিশাল বাজারে পৌঁছবার একটা পিছনের দরজা হিসাবে ব্যবহার করতে ব্রিটেন প্রয়াসী হল। জন ক্রাফোর্ড এই ব্যাপারে একটা প্রতিবেদন প্রস্তুত করলেন এবং বর্মার সঙ্গে বাণিজ্যিক ব্যাপারে সম্ভাবনার দিকটি তুলে ধরলেন। বর্মা ও চীনের তুলো রপ্তানি করে ইংল্যান্ড থেকে প্রস্তুতপণ্যের বাজার তৈরি হবে এবং তার লভ্যাংশের সম্ভাবনায় ব্রিটিশ বণিক, প্রশাসনিক গোষ্ঠীও উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

এই কার্যের প্রারম্ভে প্রয়োজন ছিল বর্মার রাজনীতি ও প্রশাসনিক স্তরে সহায়তার। ইয়ান্দাবু সন্ধির পর ব্রিটিশরা বর্মার অনেকগুলি বাণিজ্যপথ ব্যবহার করছিল যেমন বর্মার চুনী, পান্না প্রভৃতি বহুমূল্য মণি, রত্ন, পাথর প্রভৃতি আসাম-আভা পথে; কাঠ প্রভৃতি বনসম্পদ আরাকান-কলকাতা পথে; তুলো, রৌপ্য, সোনা গবাদি পশু, ঘোড়া প্রভৃতি মৌলমিয়েন-আভা পথে শান রাজ্য হয়ে; আদান-প্রদান চলত। সন্ধিপত্রে এই পথ ব্যবহারের কথা কিছু বলা হয়নি। অথচ ব্রিটিশ কর্তৃক তাই হচ্ছিল। এবার পুনরায় কোন বাণিজ্যিক পথের কথা হলে হয়ত বর্মী রাজতন্ত্র, উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা বিরোধিতা না করে প্রস্তাবটি স্থগিত করে দেবেন। এই রকম ভাবনাই করেছিলেন বর্মাস্থিত ব্রিটিশ রেসিডেন্ট মেজর হেনরী বার্নে (Major Henry Burney 1830-1837)। ব্রহ্মরাজ থারওয়াদি ইয়ান্দাবু সন্ধির অসম্মানজনক শর্তগুলি নাকচ করতে উদ্যত হলেন। ব্রিটিশ সকারের কাছে এই সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্যার তথা ইন্দো-আফগান সম্পর্কের সমস্যা সমাধান একান্ত জরুরী ছিল এবং ১৮৪০ সালে ব্রিটিশ রেসিডেন্সি রেঙ্গুন থেকে স্থানান্তরিত করে নেওয়া হলে পরবর্তীকালে উভয় শক্তির মধ্যে শান্তিপূর্ণ আলোচনার পথটি রুদ্ধ হয়ে যায়।

৬৬.৪.১ দ্বিতীয় ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধ ও ফলশ্রুতি

থারওয়াদির পর তাঁর পুত্র পাগান মিনের সময়কালে শুধু ইঙ্গো-ব্রহ্ম সম্পর্কই নয় সরকারি বাণিজ্য, রাজ-কর্মচারীদের সঙ্গে সম্পর্কেরও অবনতি ঘটে এবং সংঘটিত হয় দ্বিতীয় ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধ। ১৮৫২ সালে সংঘটিত দ্বিতীয় যুদ্ধ কোন সাধারণ সীমান্ত সমস্যার ফলশ্রুতি ছিল না। দ্বিতীয় যুদ্ধ বাণিজ্যিক কারণেই সংঘঠিত হ'ল ১৮৪০ সালের পর রেঙ্গুন বর্মার অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ব্রিটিশরা এখান থেকে তুলোজাত দ্রব্য এবং কাঠের রপ্তানি করত একই সঙ্গে বুলিয়ান (সোনা বা রূপার বাট বা পিন্ড) রপ্তানি হত। বুলিয়ানের রপ্তানির বিষয়টি ইয়ান্দাবু সন্ধিতে নিষিদ্ধ হয়। বর্মা থেকে মূল্যবান ধাতু, মশলার নির্গমন রোধ করার জন্য সরকারি পক্ষ থেকে

তল্লাশি শুরু হলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীর কাছে বর্মাস্থিত ব্রিটিশরা অভিযোগ জানাতে থাকে। কখনোও বা এই বর্মা সরকারের তল্লাশিমূলক কাজকে উদ্ধত, নিষ্ঠুর বলে অভিহিত করা হতে থাকে। বর্মা সরকার ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় কারণটি ছিল সেগুন কাঠ নিয়ে। কাঠ ব্যবসায়ী অর্থ বিনিয়োগের নতুন লাভজনক ক্ষেত্র খুঁজছিলেন। ১৮৪১ সালে সরকারি পক্ষ থেকে কাঠের অপচয় ও অনাবশ্যক গাছকাটা নিষিদ্ধ হয় এবং বর্মার বনজসম্পদের রাজকীয় আধিপত্যের কথা বলা হয়। যা ব্রিটিশ বণিকদের রুষ্ট করে এইসব বণিকরা সিঙ্গাপুরের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে ছিল তাই বর্মার সরকারের পক্ষ থেকে এই ধরনের বিধিনিষেধ স্বাভাবিকভাবে তাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। অথচ ঐতিহ্যগতভাবে ব্রহ্মরাজ তাঁর রাষ্ট্রের যাবতীয় বাণিজ্যের প্রধান ছিলেন এবং যে কোন সম্পদকে তাঁর একাধিপত্যে নিয়ে আসাটা খুবই স্বাভাবিক ছিল।

ইতিমধ্যে বাণিজ্যিক বন্দর হিসাবে রেঙ্গুন খুবই প্রসারিত হয়েছিল ও ব্রিটিশ বণিকরা ভারত সরকারকে চাপ দিচ্ছিলেন যাতে দক্ষিণ ব্রহ্ম সরাসরিভাবে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। মৌলমিয়েনের কমিশনের অফিসে একের পর এক অভিযোগ পত্র এই ব্যাপারে জমা হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্যিক স্বার্থকে প্রতিবন্ধকতা মুক্ত করতে যুদ্ধ ঘটানো ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।

ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী দ্রুতগতিতে রেঙ্গুন দখল করে টোংগু পর্যন্ত দক্ষিণ বর্মা অধিকার করল। ব্রহ্মরাজের অপেক্ষা না করেই উত্তর ও দক্ষিণ ব্রহ্মের সীমানা নির্দিষ্ট করা হল। এইভাবে মারতাবান (Martaban), রেঙ্গুন, বেসিন ও পেগু, প্রোম সহ সম্পূর্ণ দক্ষিণ ব্রহ্ম ব্রিটিশ আওতায় চলে। ব্রহ্মের ক্ষেত্রে আপনারা দেখলেন বাণিজ্যিক বিষয়টি কতখানি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে। অন্তত দ্বিতীয় ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশদের রাজ্যিক প্রসারণ তা প্রমাণ করে।

৬৬.৪.২ ব্রহ্মরাজা মিন্দন ও ইঙ্গো-ব্রহ্ম সম্পর্ক

এই ব্রহ্মের রাজপ্রাসাদে পাগান মিন ও তাঁর সমর্থকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ঘনিয়ে উঠেছিল। পেগুর ব্রিটিশ কমিশনার এই পরিস্থিতিতে বিরুদ্ধ দলের নেতা ও পরবর্তীকালে ব্রহ্মরাজ মিন্দন মিনের সঙ্গে চুক্তি করে ইংরেজ অধিকৃত বর্মার সীমানা টোংগু প্রদেশ থেকে বাড়িয়ে আরো পঞ্চাশ মাইল ভিতরে করে নিলেন। এই অঞ্চলের আওতাভুক্ত একটি বিশাল সেগুন গাছের জঙ্গলও অধিকৃত হল। ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীতে বর্মা টিকে আর সেগুন কাঠের খুব কদর ছিল এবং টোংগু প্রদেশের এই বনভূমির প্রতি ব্রিটিশ বণিকরাও অনেকদিন ধরে লোভাতুর দৃষ্টি দিচ্ছিল।

দ্বিতীয় ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধের (১৮৫২) পর পাগান মিনের স্থানে রাজা হলেন তাঁর ভ্রাতা মিন্দনমিন। মিন্দন ব্রিটিশদের সঙ্গে সর্বদা বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন। তবে তাঁর বর্মার রাজতান্ত্রিক অধিকারভুক্ত অঞ্চলের সীমানা অনেক ছোট হয়ে যায়। সমুদ্র উপকূলভাগ, সমৃদ্ধ সেগুন কাঠের বনভূমি ও ধান উৎপাদনের বিখ্যাত রাজ্যাংশ তিনি ব্রিটিশদের কাছে ছেড়ে দেন। বণিকদের অনেক অর্থনৈতিক সুবিধাদান করেন।

মিন্দর তাঁর রাজত্বকালে (১৮৫৩-১৮৭৮) বর্মাকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতিদানের জন্য কূটনৈতিক মিশর প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর মুখ্যমন্ত্রী আন্তর্জাতিক স্তরে বর্মার হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের জন্য লন্ডন, রোম ও প্যারিস ভ্রমণ করেন। মিন্দন তাঁর রাজত্বকালে নতুন রাজধানী মান্দালয় নির্মাণ করেন। রাজধানী অমরাপুরার পরিবর্তে মান্দালয় তাঁর আমলে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ধর্মের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তিনি অনেকগুলি প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করেন। সংস্কারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল উর্বরতা অনুসারে ভূমিরাজস্ব নির্ধারণ, সরকারি কর্মচারীদের স্থায়ী বেতন, ওজন ও পরিমাণ নির্ধারণ, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার প্রচলন, নতুন সড়ক নির্মাণ প্রভৃতি। এছাড়া বর্মী রাজাদের মধ্যে তিনি প্রথম মুদ্রা প্রচলন করেন। তাঁর রাজত্বকালকে শ্যামদেশের চক্রী রাজবংশের মোঙ্গকুট-এর (Mongkut) শাসনকালের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যদিও শ্যাম দেশ বা থাইল্যান্ড ব্রিটিশ ফরাসিদের মাঝখানে Buffer বা যুদ্ধহীন অঞ্চল হিসাবে স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছিল সেখানে স্বাধীন বর্মার উপস্থিতি ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখানে আপনাদের একটি তথ্য জানা দরকার যে সামরিক ও রণকৌশল এবং নীতি নির্ধারণের জন্য ব্রহ্মের রাজধানী ছয় বার স্থানান্তরিত হয়েছিল প্রথমে পাগান থেকে সেবুতে; দ্বিতীয় ও চতুর্থ বারে আভায়; তৃতীয় ও পঞ্চমবারে অমরাপুরায় এবং শেষবারের মতো মান্দালয়ে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

৬৬.৫ তৃতীয় ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধের ফলাফল

১৮৭৮ সালে মিন্দন মিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র থিবো বর্মার সিংহাসনে বসেন। তিনিই ছিলেন বর্মার শেষ রাজা। তাঁর সময়ে সংঘটিত হল তৃতীয় ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধ এবং যুদ্ধের পর সমগ্র উত্তর ব্রহ্ম ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয়। এইভাবে তিনটি যুদ্ধের দ্বারা স্বাধীন ব্রহ্মদেশ তার অস্তিত্ব ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থের কাছে হারিয়ে ফেলে।

ব্রহ্মরাজ থিবো সিংহাসনে আরোহণ করেই তাঁর বিরোধীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। ব্রিটিশ রেসিডেন্ট এর প্রতিবাদ করেন। তিবোর সঙ্গে প্রথম থেকেই ব্রিটিশ সরকারে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। থিবো ও তাঁর পত্নীর নেতৃত্বে রাজপ্রাসাদে এক ব্রিটিশ বিরোধী দলের সৃষ্টি হয় যারা ব্রিটিশ বণিকদের প্রতি অনেকটা কঠোর নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। এই সময় ভারতবর্ষের সিমলাতে ব্রহ্ম ও ব্রিটিশ প্রতিনিধির মধ্যে আলোচনা স্থগিত করে দেওয়া হয় এবং রাজতন্ত্রের পক্ষ থেকে রাজা সার্বভৌম ও একচেটিয়া অধিকারের কথা ঘোষণা করা হলে পুনরায় সেই পুরাতন প্রশ্নটি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ব্রহ্মে কার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব স্থাপিত হবে বর্মী রাজতন্ত্রে নাকি ব্রিটেনের। ফলে ইঙ্গো-ব্রহ্ম সম্পর্কের অবনতি হয়।

এই সময় থিবো ব্রহ্মরাজ্যে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা একেবারে দূর করার জন্য ফরাসিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ

সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হন। ইতিমধ্যে শ্যামদেশ বা ইন্দোচীনে ফরাসি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ফরাসি শক্তি বর্মায় প্রভাব বিস্তার বাণিজ্যের অনুপ্রবেশ করতে আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে।

১৮৮২ থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত এই দুবছর কিছু কিছু ঘটনা কিছু অপপ্রচার মিলেমিশে ব্রিটিশ বর্মা সম্পর্কের এমন অবনতি ঘটায় যে ১৮৮৬ সালে সমগ্র উত্তর ব্রহ্ম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়। এই সময়ে ব্রিটিশ সরকারে রুস জাতি আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়ে বাধ্য করেছিল। ১৮৮০-র দশকে বর্মায় সম্ভাব্য ফরাসি নিয়ন্ত্রণের ভাবনা ব্রিটেনকে এক দুর্ভাবনাগ্রস্ত করে রেখেছিল। ব্রিটিশ বণিকরা এখানকার কাঠ, তেল, তুলো, মূল্যবান পাথর, টিন প্রভৃতি বাণিজ্যিক ক্ষেত্রগুলিতে অর্থ বিনিয়োগ করে রেখেছিল। এই অবস্থায় বর্মার অন্তর্ভুক্তিকরণ একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে।

৬৬.৫.১ থিবো ও ব্রহ্ম ফরাসি সম্পর্ক

১৮৮৫ সালে ফরাসি সরকার ও ব্রহ্মরাজ থিবোর সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পন্ন হয়। ব্রহ্মরাজ রাজধানী মান্দালয়ে ফরাসি কনসুলেট স্থাপনের অনুমতি দেন। বর্মায় ব্যাপক ফরাসি অনুপ্রবেশ ব্রিটিশ বণিকদের আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়াল। ব্রহ্মে যে সব স্থানে ব্রিটিশ আধিপত্য আছে তা ফরাসিদের হস্তান্তরিত হবার ভীতি দেখা গেল। এই ভীতির ফলে অপপ্রচার হতে লাগল যে মান্দালয়ে বর্মা ও ফ্রান্সের যৌথ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা হবে; রাজকীয় খনি (বিশেষ করে চুনীর খনি)-গুলি গচ্ছিত থাকবে ফরাসিদের কাছে; ডাক, তারও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হবে ফরাসি দ্বারা; মান্দালয় ও টংকিনের মধ্যে রেলপথ স্থাপিত হয়ে ফরাসি ইন্দোচীন থেকে অস্ত্র উত্তর ব্রহ্মে আসবে; ভূগর্ভস্থ তেল, কাঠ, যাতায়াত, ইরাবতী নদীর ফেরী ব্যবস্থা—ইত্যাদি সর্বত্র ফরাসি আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হবে। ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়ের এই ভীতির ফলে শেষ পর্যন্ত রেংগুনের ব্রিটিশ চীফ কমিশনার লন্ডনে টেলিগ্রাফ করে জানালেন মান্দালয়ে ফরাসিরা দৃঢ় ভিত্তিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করছে এবং খুব শীঘ্র ফরাসি আধিপত্য উত্তরে রেড রিভার পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। ব্রিটিশ বণিকদের এইসব ভীতির কোন ভিত্তি ছিল না। বর্মার সুপণ্ডিত Htin Aung তা খন্ডন করেছেন। তাহলেও এই আশংকার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

৬৬.৫.২ তৃতীয় ইঙ্গো-ব্রহ্ম ও বম্বে-বর্মা ট্রেডিং কোম্পানির ভূমিকা

এইরকম অস্থির রাজনৈতিক অবস্থায় ব্রহ্মরাজ ব্রিটিশ-বর্মা ট্রেডিং কোম্পানিকে জরিমানা ধার্য করেন। ১৮৬২ সাল থেকে এই কোম্পানি উত্তর বর্মায় টোংগু প্রদেশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সেগুন গাছের বনভূমি থেকে কাঠের ব্যবসা করছিল ব্রিটিশ জাহাজের ডেক নির্মাণ, রেলপথ নির্মাণ তাছাড়া উচ্চমানের আসবাব তৈরিতে এই সেগুন কাঠ ছিল অপরিহার্য। কাঠ ছাড়া বর্মার চাল, তেল, তুলো এবং নৌবহর (Shipping) বাণিজ্য ও পরিচালনা করত এই কোম্পানি। এখন ব্রহ্মরাজ এই কোম্পানিকে অনাবশ্যক গাছকাটার জন্য তেইশ লক্ষ টাকার জরিমানা ধার্য করলে ভারতস্থিত ব্রিটিশ সরকার প্রতিবাদ জানায় এবং এই সমস্যা সমাধানে মধ্যস্থতার জন্য প্রস্তাব পাঠানো

হয় ব্রহ্মরাজ থিবোর কাছে। কিন্তু বর্মীরাজ মধ্যস্থতায় রাজি না হলে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে রাজতন্ত্রের কাছে চরমপত্র পাঠান হয়, যাতে বর্মার আভ্যন্তরীন নীতি, বাণিজ্য, প্রভৃতির সঙ্গে বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করা হয়। স্বভাবতই ব্রহ্মরাজ এই চরমপত্র মেনে নিতে অস্বীকৃত হলেন এবং শুরু হল তৃতীয় ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধ ১৮৮৫ সালে। ব্রিটিশ সৈন্য মান্দালয় অধিকার করে ব্রহ্মরাজ থিবো পত্নী সহ ভারতে নির্বাসিত হন। এইভাবে কোনবঙ রাজতন্ত্রের পতন হয় এবং সমগ্র ব্রহ্মদেশ এক ঘোষণায় ভারতের একটি প্রদেশে পরিণত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়। নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী মান্দালয় পরিবর্তে রেঙ্গুনে স্থাপিত হয়।

তবে ব্রহ্মে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা করা বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এখানকার দুর্ধর্ষ উপজাতি শান, মোন, কারেন কোন বিদেশী নিয়ম মানতে রাজি ছিল না। তাই ব্রহ্মের উত্তরভাগে গোলযোগ চলতেই থাকে।

৬৬.৬ মালয়ী রাজ্যে উপনিবেশিকতার সূচনা

উপনিবেশিবাদ শুরু হবার পূর্বে মালয়ী রাজ্যগুলি ইন্দোনেশিয়-মালয় সাম্রাজ্যের অংশ রূপেই বিবেচিত হত। মালয় দ্বীপের ছোট ছোট রাজ্যগুলি সুলতান শাসিত অঞ্চল। উপনিবেশিকতার যুগে মালয় দ্বীপের বোর্নিও উত্তরাঞ্চলের এবং পূর্ব সুমাত্রায় স্থাপিত হয়েছিল ডাচ বা ওলন্দাজদের শাসন। মালয়ী দ্বীপের উত্তরাঞ্চলের ভ্যাসাল (Vassal—সামন্ত) সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। থাইল্যান্ডের রাজাদের সঙ্গে এবং দক্ষিণভাগের সুলতানী রাজ্যগুলি ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। এইভাবে গঠিত ছিল ইন্দোনেশিয়-মালয় সাম্রাজ্য।

মালয়ী দ্বীপে পশ্চিমী অনুপ্রবেশ ছিল অনেকটাই ধীরগতি সম্পন্ন এবং খুব বিচ্ছিন্ন। ষোড়শ শতকের প্রথমে পর্তুগীজ, সপ্তদশ শতকে ডাচ বা ওলন্দাজরা এবং পরে ব্রিটিশরা এখানে একের পর এক আসতে থাকে প্রধানত বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক উভয় আধিপত্য বিস্তারে আগ্রহী ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ অনুপ্রবেশের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ফরাসি আক্রমণ থেকে ভারতবর্ষকে সুরক্ষিত রাখা এবং চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য বাণিজ্যপথ (Trade route) প্রতিষ্ঠা করা।

ইউরোপে সংঘটিত যুদ্ধগুলি সর্বদাই এশিয়া আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশের রাজনীতির উপর প্রভাব ফেলেছে।

৬৬.৬.১ ইন্দোনেশিয়-মালয়ী সাম্রাজ্যে ডাচ আদিপত্য

ফরাসি বিপ্লব ও নেপোলিয়নের যুদ্ধ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইঙ্গো-ডাচ সম্পর্কের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই উপমহাদেশের যে সব অঞ্চলে ওলন্দাজ আধিপত্য রয়েছে সেখানে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হতে থাকে। জাভায় একজন ওলন্দাজ প্রশাসক মার্শাল হেরম্যানকে পাঠান হয় ১৮০৮ সালে। তিনি কিছু প্রগতিশীল কার্যক্রম গ্রহণ করলেও ক্রমে তা জাভাবাসীর মনে বিক্ষোভের সঞ্চার করে। ১৮১০ সালে তিনি স্বদেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন। তিনি আমবোনিয়া সুরকারতা, জাকার্তার সুলতান পদের বিলোপ সাধন করে এই তিনটি পরস্পর বিরোধী সুলতানী রাজ্যকে একটি কেন্দ্রীভূত শাসনের আওতায় নিয়ে আসেন। তিনি জাভাকে নয়টি এককে বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি এককে একজন কর্মচারী নিযুক্ত করেন। এই কর্মচারীরা ছিলেন

ডাচ কোম্পানির বেতনভোগী কর্মচারীতে। সবকিছুর উদ্দেশ্য ছিল ইন্দোনেশিয়া ও মালয়ী সাম্রাজকে পত্যক্ষ ডাচ শাসনাধীন করা।

৬৬.৬.২ ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়া

এইভাবে ওলন্দাজ প্রশাসন ধীরে ধীরে জাভায় সাংগঠনিক রূপ লাভ করতে থাকলে তা ভারতস্থিত ব্রিটিশ সরকারের ভীতির কারণ হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সরকার জাভা অধিকার করতে মনস্থ করেন এবং ১৮১১ সালে তদানীন্তন ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিন্টো জাভা দখল করতে অভিযান প্রেরণ করেন। খুব সহজেই জাভা অধিকৃত হয়। জাভা তথা ইন্দোনেশিয় মালয়ী সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক দায়িত্ব টমাস স্টানফোর্ড র‍্যাফেলস (Thomas Stanford Raffles)-কে দেওয়া হয় ও র‍্যাফেলস জাভার গভর্ণর নিযুক্ত হলেন (১৮১১—১৮১৬)।

৬৬.৬.৩ ব্রিটিশ গভর্ণর র‍্যাফলসের ভূমিকা

মালয় দ্বীপের পেনাং-এ ১৮০৫ সালে গভর্নরের সচিব নিযুক্ত হয়ে এসেছিলেন র‍্যাফেলস। মালয়ী ভাষা ও সাহিত্যে তিনি জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এছাড়া স্থানীয় রীতি প্রথা ও ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞানলাভ হয়েছিল। এই কারণে লর্ড মিন্টো ১৯০৭ সালে র‍্যাফেলস্‌কে মালয়ের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। ব্রিটিশ প্রতিনিধি হিসাবে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। স্থানীয় ভাষা জানার ফলে তিনি ডাচ শাসনাধীন জাভাবাসীকে তাদের অসুবিধা বোঝাতে সক্ষম হন এবং তাদের ব্রিটিশ সমর্থকে পরিণত করেন। জাভা অভিযানের প্রাক্কালে তাঁর রণকৌশল ও তথ্যাদি ভারত সরকারে কাছে ছিল অমূল্য সম্পদ। র‍্যাফেলস-এর এই দক্ষতা, অভিজ্ঞতা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতস্থিত ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকা নিরূপণ করতে সাহায্য করেছিল। র‍্যাফেলসের মতে, ওলন্দাজ শাসন ছিল যথেষ্ট ত্রুটিপুর্ণ ও প্রজাপীড়ক তাই এখানে ব্রিটিশ প্রশাসনিক চরিত্রের পরিবর্তন প্রয়োজন। মালয়ী রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্রিটিশ নিরাপত্তার প্রয়োজন ঠিকই কিন্তু তা যেন প্রয়োজনের তুলনায় কঠোর না হয়। মালয়ী সমাজ ও রাষ্ট্রকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে এখানকার আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি দ্রুততর হয়। ফলে জনসমর্থনের ভিতর দিয়ে এখানকার মানব ও প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করা যাবে। তিনি বুঝেছিলেন মালয়ী সম্পদকে ব্রিটিশ উৎপাদকদের জন্য ভাণ্ডারে পরিণত করা যেতে পারে। এজন্য প্রয়োজনের ব্যাপক সংস্কারের, যে সংস্কার কৃষক সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটাবে। কাজেই মালয়ী জনগণের উপযোগী সংস্কার গৃহীত হল, অবশ্যই তা ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের প্রয়োজনে। র‍্যাফেলস যে সংস্কারগুলি নিয়ে এলেন তা ছিল যথেষ্টই সুদূর প্রসারী। র‍্যাফেলস এখানে প্রত্যক্ষ শাসনব্যবস্থা চালু করলেন। বংশানুক্রমিক স্থানীয় শাসকদের বেতনভোগী আমলা শ্রেণীতে পরিণত করলেন। তাদের কঠোরভাবে ব্রিটিশ প্রশাসনিক আওতায় আনা হয়। মালয় দ্বীপকে ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার ধরনে জেলা বিভাগ ও গ্রামে বিভক্ত করা হয়। ওলন্দাজ শাসনের অযথা কঠোর ব্যবস্থাগুলি রহিত করা হয়। র‍্যাফেলস্‌ মুক্ত উদ্যোগে (free enterprise) বিশ্বাসী ছিলেন তাই তিনি জবরদস্তি যোগান ব্যবস্থাকে তুলে দিলেন। শুধু প্রেয়াংগার জেলার কফির চাষ ও যোগানের ক্ষেত্রে তা অব্যাহত রইল।

এই প্রথম কৃষকশ্রেণীকে উৎপাদন ও বিক্রয়ের স্বাধীনতা দেওয়া হল। তারা তাদের পছন্দানুযায়ী শস্য উৎপাদন করতে পারবে বলা হল। ভারতীয় রীতি অনুসারে ব্রিটিশ সরকার এইসব জমিতে কর নির্ধারণ করতে পারবেন। এখানে র‍্যাফেলস্ মাদ্রাজের লেফটানেন্ট কর্নেল কলিন ম্যাকেঞ্জীর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছিলেন। মাদ্রাজের রায়তওয়ারী ব্যবস্থায় উৎপাদক যে জমির মালিক হতেন সেই জমির বার্ষিক খাজনা তাকে সরকারকে দিতে হত। র‍্যাফেলস্ ঘোষণা করেছিলেন সরকার হলেন সব জমির মালিক। জমির উর্বরতা অনুসারে কর ধার্য হবে। তাই উর্বর জমি কৃষককুল উৎপাদনের মূল্যের অর্ধ শতাংশ এবং অল্প উর্বর জমির উৎপাদক তার উৎপাদিত মূল্যের এক-চতুর্থাংশ কর হিসাবে সরকারকে দেবে। এইভাবে জমির করদানের মধ্যে দিয়ে উৎপাদক ও কৃষক সমাজ জবরদস্তি যোগানের হাত থেকে রেহাই পায়। জবরদস্তি শ্রম, যোগান এবং আকস্মিক যোগান প্রভৃতি ছিল ওলন্দাজ শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ব্রিটিশ প্রশাসনাধীন মালয়ী সমাজ এই অন্যায় ব্যবস্থার হাত থেকে মুক্তি পায়।

৬৬.৬.৪ র‍্যাফেলসের কার্যকলাপের ফলশ্রুতি

ব্রিটিশ সরকার র‍্যাফেলসের নেতৃত্বে যে ব্যবস্থা মালয়ে গ্রহণ করলেন তার ফলাফল ছিল দুই ধরনের প্রথমত, সরকার এই ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদকদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারলেন একই সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যবস্থার অন্যতম একক গ্রামসমাজের সঙ্গে তার সংযোগ রইল; দ্বিতীয়ত, সর্বপ্রকার উৎপাদক, কৃষকদের জন্য বাজার উন্মুক্ত হল। তার ফলে নিজ পণ্য বিক্রয় করে কৃষকশ্রেণীর হাতে অর্থ আসতে লাগল যা দিয়ে তারা অন্য কোন ভোগ্যপণ্য ক্রয় করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারল।

J.S. Furnivall বলেছেন র‍্যাফেলসের মানবতাবাদী কর্মকাণ্ড সাধারণ জনতাকে স্থানীয় শাসকের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই দিয়েছিল; তাঁর বাস্তববাদিতা কৃষকদের হাতে অর্থ এনে দিয়েছিল, যাতে তারা ইংল্যান্ডে প্রস্তুত পণ্য কিনতে পারে।

একথা সত্য যে ওলন্দাজ ও ব্রিটিশ সকলেরই প্রয়োজন ছিল বাণিজ্যিক কাঁচামালের কিন্তু ব্রিটেনে প্রস্তুতপণ্য ছিল, বিশেষত বস্ত্র খুবই সস্তা। পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি কাঁচামাল নিয়ে গিয়ে পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে উপনিবেশে সরবরাহ করত। ধীরে ধীরে ব্রিটিশদের কাছে এই রপ্তানি ব্যবসা সস্তা দামের কারণে তাই খুব লাভজনক হয়ে যায়।

৬৬.৬.৫ তাঁর নীতির সীমাবদ্ধতা

তবে র‍্যাফেলসের সংস্কার ত্রুটিমুক্ত ছিল না এবং সর্বত্র সফল ছিল তাও বলা যায় না। প্রথমত, পুরানো regent কে সরিয়ে যে সব গ্রামপ্রধানের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তারা অনেক সময়ে অন্যায়-অবিচার করতেন গ্রামবাসীর উপর। দ্বিতীয়ত, সরকারকে নগদ অর্থে কর দেবার রীতি চালু হওয়াতে নগদ অর্থের জন্য স্থানীয় জনগণ কৃষককুল চীনা মহাজন ও সুদ ব্যবসায়ীদের কাছে দ্বারস্থ হয়ে পড়ে। চীনা মহাজনদের সুদের হার ছিল খুবই চড়া। কারণ ইতিপূর্বে তারা চাল প্রভৃতি উৎপাদিত পণ্যে করদান করে এসেছে। নগদ অর্থ তাদের

কাছে কখন ছিল না। অথচ সরকারি কুঠি (Residency Head-quarters)— গুলিতে নগদ অর্থে তাদের কর প্রদানে বাধ্য করা হয়েছিল। তৃতীয়ত, গ্রামের কৃষকশ্রেণীর মধ্যে জমি বন্টনের ব্যাপারে কোন রূপ সরকারি পরিদর্শন রীতি চালু ছিল না। যদিও এক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীর অপ্রতুলতা ছিল তাই উৎপাদক বা কৃষকশ্রেণী ঠিক কি ধরনের জমি লাভ করছে বা জমি বন্টনের কিরূপ হবে— তা নির্ধারিণের জন্য কোন সরকারি নীতি গৃহীত হয়নি বলে কৃষকশ্রেণী গ্রামপ্রধানের সালিশীর উপরই নির্ভরশীল ছিল। কাজেই গ্রাম প্রধানের ইচ্ছা ও বিবেচনাবোধের উপর কৃষকরা নির্ভর করতে থাকে।

চতুর্থত, র‍্যাফেলস পণ্যের বাধ্যতামূলক উৎপাদনের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করেননি। কারণ যে সব জেলাগুলিতে বাধ্যতামূলক পণ্য উৎপাদন বজায় ছিল, যেমন প্রেয়াংগারের কফি চাষ সেখানে প্রাচীন রীতি বজায় রাখা হয়েছিল অর্থাৎ জবরদস্তি উৎপাদন ও যোগান ব্যবস্থা কফি, কাঠ উৎপাদক জেলাগুলিতে বহাল রইল।

তবে তিনি স্থানীয় বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। অনেকগুলি উৎপীড়নমূলক বাণিজ্যকর তিনি তুলে দিয়েছিলেন। মালয় উপদ্বীপের পূর্বভাগে চোরাচালান বন্ধ করার জন্য নৌ-বাহিনী তৈরি করেছিলেন। ফলে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য লক্ষ্যণীয় হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এখানে বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তিনি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। স্থানীয় বিচার পরিচালনার জন্য স্থাপিত হয় ষোলটি বিচারালয় (Land courts) যার বিচারপতি হলেন রেসিডেন্ট ও স্থানীয় সরকারি কর্মচারীরা সভ্য পেলেন। ছোট ছোট দেওয়ানী ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তি এখানে করা হত, পুলিশী বিচার হত, এছাড়া কোন মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারে লেফটানেন্ট গভর্ণরের অনুমোদন জরুরী ছিল। এখানে জুরী দ্বারা বিচারের ব্যবস্থাও ছিল। যদিও এই ব্যবস্থা সমালোচিত হয়েছিল তবুও বলা যায় জুরী ব্যবস্থা ছিল "typical British institutions to absolutely foreign soil..." ইতিমধ্যে ১৮১৪ সালের পর ইউরোপে নেপোলিয়ানের যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে থেকে হল্যান্ডকে ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ রূপে প্রতিষ্ঠা করে ইউরোপের শক্তিসাম্য রক্ষার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। তাই ডাচ উপনিবেশগুলি থেকে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব সরিয়ে সেখানে ওলন্দাজ বা ডাচদের পুনস্থাপন করে দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়া উপমহাদেশেও ফরাসি প্রতিপক্ষ রূপকে দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা দেখা গেল।

১৮১৪ সালে র‍্যাফেলস লণ্ডনে চলে যান এবং ইন্দোনেশিয়া-মালীয় উপদ্বীপের অঞ্চলগুলিতে পূর্বেকার ওলন্দাজ আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৮ সালে র‍্যাফেলস পুনরায় লেফটেনান্ট গভর্নর হয়ে এলেন বেনকুলেন অঞ্চলে। এটি দক্ষিণ-পশ্চিম সুমাত্রার অখ্যাত এক বাণিজ্য অঞ্চল। ইতিমধ্যে মালয়ী উপদ্বীপে ডাচরা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে।

৬৬.৭ মালয়ী রাজ্যে ওলন্দাজ পুনরভ্যুত্থান

কিছু জায়গায় নতুন ওলন্দাজ বন্দর বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। ওলন্দাজরা ব্রিটিশ বাণিজ্যকে প্রতিহত করার জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এবং বাটাভিয়া (জাকার্তা) ছাড়া অন্য কোথাও ব্রিটিশ বাণিজ্যতরী প্রবেশ নিষিদ্ধ করে। এই অবস্থায় র‍্যাফেলস ভারতস্থিত ব্রিটিশ সরকারকে ব্রিটিশ বাণিজ্যের বিপদ সম্পর্কে সচেতন বাণিজ্যক আধিপত্য থাকবে এবং যেখান থেকে ওলন্দাজ বাণিজ্য এবং কর্তৃত্ব দুটিরই মোকাবিলা করা যেতে পারে। কারণ ওলন্দাজদের হাতে মালাক্কা প্রণালী থাকার ফলে প্রতিদিনই এই উপদ্বীপ অঞ্চলে ডাচ আধিপত্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

৬৬.৭.১ সিংগাপুরের প্রতিষ্ঠা

এখানে উল্লেখ্য যে ব্রিটিশ সরকার এই সময়ে ডাচ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে ব্রিটেন ও নেদারল্যান্ডের মধ্যে তথাকথিথ মিত্রতাকে বিনষ্ট করতে চায়নি। র‍্যাফেলস চেয়েছিলেন রিহো (Rhio) দ্বীপে ব্রিটিশ প্রতিরোধ কেন্দ্র স্থাপন করতে কিন্তু এখানে পূর্বেই ডাচরা চুক্তির মাধ্যমে পৌঁছে গিয়েছিল। এরপর তাঁর দ্বিতীয় পছন্দ ছিল জোহর দ্বীপের সিঙ্গাপুর গ্রামটি। সিঙ্গাপুর ছিল মালয়ী জাতি অধ্যুষিত মৎসজীবীদের একটি চেটি গ্রাম। র‍্যাফেলস এখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুঠি (factory) খোলার বা স্থাপনের অনুমতি পান। সিঙ্গাপুর জোহর (Johore) রাজ্যের একটি অংশ ছিল এবং এখানে ১৮২২ সাল থেকে সুলতানের মৃত্যুর পর থেকে একটি রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছিল। মৃত সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিতাড়িত হয়ে সিঙ্গাপুরের নিকটস্থ বুলাং (Bulang) দ্বীপে ছিলেন এবং সুলতান পুত্রের প্রতি সিঙ্গাপুর, তেমেংগং (Temenggong) অঞ্চলের মালয়ী বাসীর সমর্থন ছিল। র‍্যাফেলস ছিলেন বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন রাজনীতিক। যিনি সুরতানপুত্রকে সিঙ্গাপুরে আমন্ত্রণ জানালেন এবং জোহোরের সুলতান রূপে তাকে স্বীকার করে নিলেন। ১৮১৯ সালে সুলতান হুসেনের সঙ্গে স্বাক্ষরিত হয় ও সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব বৈধতা লাভ করে।

৬৬.৭.২ সিঙ্গাপুরের বাণিজ্যিক গুরুত্ব

সিঙ্গাপুরের অবস্থিতি ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উপমহাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে। মালয়ী উপদ্বীপের সুদূর দক্ষিণে অবস্থিত এই বন্দরটি ইউরোপ ও চীনের মধ্যে সবচেয়ে কম দৈর্ঘ্যের যাত্রাপথকে উন্মুক্ত করুক, যা এতদিন ধরে ব্রিটিশরা আকাঙ্খা করে আসছিল। ইতিপূর্বে উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে মালাক্কা প্রণালীর মধ্যে দিয়ে জাহাজকে আসতে হত কিন্তু সিঙ্গাপুরের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে এরপর থেকে সম্পূর্ণ যাত্রাপথের এক হাজার মাইল দীর্ঘ পথ সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল। একই সঙ্গে প্রাচ্যে ডাচ একাদিপত্যকে প্রতিহত করার জন্য সিঙ্গাপুরের উত্থান সম্পূর্ণ হল। ঠিক যেমনটি হয়েছিল পশ্চিমের মাল্টা দ্বীপের ক্ষেত্রে। তেমনভাবে পূর্বে সিঙ্গাপুরকে প্রতিষ্ঠা করা হল।

খুব স্বাভাবিকভাবে এই অবস্থাকে ওলন্দাজরা মেনে নিতে পারেনি। তারা সুলতান হুসেনের সঙ্গে সম্পাদিত

১৮২৪ সালে ইঙ্গো-জোহর চুক্তি মানতে অস্বীকার করে। তাঁদের মতে সুলতান হুসেনের কোন রাজনৈতিক বৈধতা নেই। এছাড়া ওলন্দাজদের সঙ্গে ইতিপূর্বেই ১৮১৮ সালে রিহো অঞ্চলের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। যাতে জোহর রাজ্যের সিঙ্গাপুরের উপর স্বাভাবিক ভাবেই ডাচই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই নতুন করে ১৮১৯ এর সম্পাদিত ইঙ্গো-জোহর (তথা সিঙ্গাপুর) চুক্তির কোন বৈধতা নেই। তাই সিঙ্গাপুরকে ডাচদের কাছে প্রত্যর্পণ করতে হবে।

ইতিমধ্যে ১৮১৯ সালের পর থেকে সিঙ্গাপুরের দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রায় দশগুণ। একবছরের মধ্যেই এখানকার অগ্রগতি, যা ব্রিটিশদের চুক্তির ফলে শুরু হয়েছিল, দূর-দূরান্তের মানুষকে আকর্ষণ করেছিল। সিঙ্গাপুর বন্দরটি ছিল খুবই উৎকৃষ্ট এক বন্দর। এখান থেকে পরিচালিত হত মুক্ত বাণিজ্য। এখানে ছিল শক্তিশালী ও সুরক্ষিত উন্নত সমুদ্র বাণিজ্য। সিঙ্গাপুরের সামরিক সুরক্ষা ও তৎকালীন সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চল বহু মানুষকে এখানে বসতি স্থাপনে আগ্রহী করে তুলেছিল। এখানে বাণিজ্য, ইনসুরেন্স, ব্যাঙ্কিং ব্যবসা নৌপরিবহন প্রভৃতির ভারতীয় ও সিংহলী শাখা চালু করা হয়েছিল।

এইভাবে প্রতিবছর সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ অবস্থিতি শক্তিশালী ও দৃঢ় হয়ে চলেছিল। সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ সমৃদ্ধি ওলন্দাজদের কাছে সুখবর ছিল না। মালয় উপদ্বীপে ব্রিটিশ আধিপত্য খর্ব করার জন্য ওলন্দাজরা প্রস্তুত হতে থাকে। তবে ব্রিটিশদের কাছে এই সময়টি ছিল সংহতিকরণের পর্যায়কাল তাই অনাবশ্যক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ব্যয়ভার বাড়ানোর ইচ্ছে তাদের ছিল না।

৬৬.৭.৩ ১৮২৪ সালের চুক্তি ও মালয়ী রাজ্যে ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠা লাভ

১৮২৪ সালে নেদারল্যান্ড ও ব্রিটেনের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় উপমহাদেশে পুনরায় কোন যুদ্ধজালে জড়িয়ে না পড়ে স্থায়ী ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে নেদারল্যান্ড মালাক্কা ও সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ অধিকার স্বীকার করে নেয়। এছাড়া উভয় রাষ্ট্রই একে অন্যের বন্দর থেকে নির্দিষ্ট মূল্যে নৌপরিবহন করবে স্থির হয়।

১৮২৪ সালের এই চুক্তির ফলে মালয়ী উপদ্বীপ থেকে ওলন্দাজ বাণিজ্য প্রত্যাহৃত হলে ব্রিটিশ প্রভাব, আধিপত্য স্থাপিত হয়। পক্ষান্তরে ইন্দোনেশিয়ার উপর ডাচ কর্তৃত্ব ব্রিটেন মেনে নেয়। এইভাবে ইন্দোনেশিয়-মালয়ী সাম্রাজ্য দুটি পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবর্গের পৃথক প্রভাবাধীন অঞ্চলে পরিণত হয়।

৬৬.৭.৪ ১৮২৪ সালের পরবর্তী সমস্যাগুলি

১৮২৪ সালের পর প্রায় পঞ্চাশ বছর মালয় উপদ্বীপে ব্রিটিশের পক্ষ থেকে একরকম 'না হস্তক্ষেপ' নীতি প্রযুক্ত হয়েছিল। তবে সরকারি কর্মচারী এবং বণিকগোষ্ঠী বিভিন্ন কারণে সরকারে উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে মালয় দ্বীপে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য। ১৮৫০ সালের পর থেকে টিনের খনিগুলিতে সিঙ্গাপুর ও পেনাং এর চীনা,

ইউরোপীয় বণিকরা অর্থ লগ্নি করছিল। এই বণিকগোষ্ঠী মালয়ী খনিজ ভাণ্ডার ও সম্পদ সম্পর্কে যথেষ্টই ধারণা রাখত। অন্যদিকে মালয় দ্বীপে রাজনৈতিক স্থিরতা ছিল না। বিভিন্ন সুলতানী রাজ্যগুলিতে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সর্বদাই লেগে থাকত। প্রতিটি রাজ্য একে অন্যকে ঈর্ষা করত, চোরাচালান বৃদ্ধি পাচ্ছিল, জলপরিবহন সুরক্ষিত ছিল না। এই পরিস্থিতিতে যে সব বণিকরা বাণিজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিতে অর্থ লগ্নি করেছিল তারা চাইছিল বর্ধিত হারে লাভের অর্থ ফেরৎ পেতে কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তাদের বাণিজ্যিক ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ছিল তাই ব্রিটিশ সরকারের উপর বণিকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে চাপ আসতে থাকে মালয় উপদ্বীপে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ আধিপত্য প্রসারণের জন্য।

এছাড়া যেসব চীনা শ্রমিক কাজ করত তারা সবাই গুপ্ত সমিতির সদস্য ছিল। খনি ব্যবসায়ের সিংহভাগ ছিল চীনা বণিকদের হাতে। এই বণিকরা চীনের গুপ্ত সমিতির সদস্য ছিলেন। রাজনৈতিক অস্থিরতা, গুপ্ত সমিতির কর্মকাণ্ড ইত্যাদি মালয়ে চীনা ও ব্রিটিশদের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত করে। চীনারা বেশিরভাগ সময়ে রাজতান্ত্রিক ক্ষমতার লড়াই ও ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করত। ১৮৭১ থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত দুবছর সময়কালে পেরাক (Perak) অঞ্চলের নৈরাজ্য রাজতান্ত্রিক অস্থিরতা এই পরিস্থিতি অর্থাৎ ব্রিটিশ ও চীনাদের মধ্যে যে টানাপোড়েন চলছিল সেই পরিস্থিতিকে আরো সঙ্কটজনক করে তোলে। ফলে ১৮২৪ সালে মালয়ী সুলতানদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের যে চুক্তি বা বন্দোবস্ত হয়েছিল তা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়, শান্তি বিঘ্নিত হতে থাকে সর্বত্রই, বিশেষ করে পেনাঙ অঞ্চলে।

৬৬.৭.৫ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

এই সময়ে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে টিনের চাহিদা খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমেরিকায় এই সময় চলছিল গৃহযুদ্ধ। সামরিক প্রয়োজনে টিনের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তেল মজুদ রাখারজন্য পিপা তৈরির কারণে টিনের প্রয়োজন হয়। এছাড়া সৈন্য চাউনির জন্য বড়ো টিনের পাতের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। হল্যাণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি আমেরিকাকে টিন সরবরাহ করার জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলে ব্রিটিশ বণিকদের পক্ষ থেকে এই খনিজ দ্রব্য সরবরাহ করার জন্য প্রচণ্ড উৎসাহ দেখা দিলে তারা সরকারি হস্তক্ষেপ দাবি করে মালয়ী টিন খনিগুলির উপর, যেখানে চীনাদের একাধিপত্য ছিল। এই কারণে আকস্মিকভাবে টিনের গুরুত্ব বেড়ে গেলে এই ধাতুটি সরবরাহের জন্য একটা চাহিদা সৃষ্টি হয় ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক দপ্তরে বণিকদের কাছ থেকে চাপ আসতে থাকে।

ইতিমধ্যে সুয়েজ খালের উন্মোচন (১৮৬৯ সালে) ভারত-ব্রিটেনের দূরত্বই নয় ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে দূরত্ব অনেকটা কম করেছিল। ১৮৭১ সালে সিঙ্গাপুরে টেলিগ্রাফ স্থাপিত হয়েছিল, নৌপরিবহনে উন্নতি এসেছিল, বাষ্পীয় জাহাজ চলতে শুরু করেছিল ফলে ইউরোপীয় অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি প্রত্যক্ষভাবে মালয়ী উপদ্বীপ তথা সিঙ্গাপুরের ও বাকি সমুদ্র বন্দরগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। ১৮৬০ সালে মলুক্কাস অধিকার করে নেয়

ওলন্দাজরা। ১৮৫৯ সালে কোচিন-চীনে এবং ১৮৬২ সালে কম্বোডিয়াতে ফরাসি আধিপত্য ও প্রোটেকটরেট স্থাপিত হয়।

মালয়ী উপদ্বীপের নিকটস্থ অঞ্চলগুলিতে অন্যান্য পশ্চিমী রাষ্ট্রের উপস্থিতি ও বাণিজ্য ব্রিটিশ বণিকদের আশংকার কারণ হয়ে ওঠে। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৮৫৭ সালের পর ভারতবর্ষে কোম্পানি শাসনের অবসান হয়ে যাবার পর মহারানী ভিক্টোরিয়ার সনদে ভারত সহ ব্রিটেনের অন্যান্য সহ উপনিবেশগুলিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যক্ষ প্রশাসনাধীনে নিয়ে আসা হয়। ১৮২৪ সালের বন্দোবস্তের ফলে যে সব দ্বীপগুলিতে ব্রিটিশ অধিকার স্থাপিত হয়েছিল [যেমন পেনাং, মালাক্কা, ওয়েলসলী প্রদেশ (Province Wellesley) সিঙ্গাপুর—ইত্যাদি অঞ্চলগুলিকে একত্রে Straits Setlements বলা হত] সেইসব অঞ্চল ১৮৬৭ সাল থেকে ইন্ডিয়া অফিস কর্তৃক শাসিত হতে থাকে।

৬৬.৭.৬ মালয়ী ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা

বস্তুতপক্ষে বাণিজ্যিক স্বার্থ, মালয়ের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও তৎকালীন ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ব্রিটিশ সরকারে নীতি পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে আসে। ১৮৭৩ সালে মালয়ের গভর্নর স্যার হ্যারি অড (Sir Hary Ord) বণিক সম্প্রদায় ও উপনিবেশিকদপ্তরের চীনা প্রতিনিধিদের স্বপক্ষে আবেদন জানালেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে। তাঁর পরবর্তী গভর্নর এ্যান্ড্রু ক্লাক (Sir Andrew Clarke)-কে মালয়ের ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্য সর্বপ্রকার সুবিধা দিতে পাঠান হলে তিনি মালয়ের রাজনৈতিক অস্থিরতাকে দমন করেন। পেরাক, সেলাংগোরের গৃহযুদ্ধ দমন করেন। ১৮৯৫ সালে জোহের (Johore) অঞ্চলে ব্রিটিশ প্রটেকটরেট স্থাপিত হয়। এই বছরই পোরাক, সেলাংগোর পেহাং, নেগ্রিসেমবিলাম— এই চারটি অঞ্চল নিয়ে একটি ফেডারেশন গঠন করাহয় একজন রেসিডেন্ট জেনারেলের অধীনে। এই রেসিডেন্ট জেনারেলের অফিস স্থাপিত হল কুয়ালালামপুরে। এই কুয়ালালামপুরই বর্তমান আধুনিক মালেশিয়া বা মালেশিয়ার রাজধানী। চারটি রাজ্য নিয়ে ফেডারেশন গঠিত হলেও তা ছিল রেসিডেন্ট জেনারেলের নেতৃত্বে ব্রিটিশদেরই কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা। তাই বলাহয় ফেডারেটেড মালয় রাষ্ট্র "...not a nation but an amalgamation".

৬৬.৮ সারাংশ

আলোচ্য এককটিতে উপস্থিত করা হয়েছে ব্রহ্ম দেশ ও ইন্দোনেশিয়-মালয়ী সাম্রাজ্যে ক্রমিক পর্যায়ে পশ্চিমী অনুপ্রবেশ এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। চতুর্দশ পূর্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া [illegible] দেশ ইউরোপীয়দের কাছে অজ্ঞাত ছিল। এখানে আধিপত্য স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের পথ প্রস্তুত করে নেওয়া। বর্মার ক্ষেত্রে

দেখা গেল ইংরেজরা এখানে সাম্রাজ্যবাদী শাসন কায়েম করতে ততটা আগ্রহী ছিল না। পরে ভারতে আধিপত্য স্থাপনের সঙ্গে চীনের উপর প্রভূত্ব বিস্তারের প্রয়াস পরিচালিত হল পেগু, আরাকান, তেনাসেরিমের উপর দিয়ে। এইভাবে ইঙ্গো-ব্রহ্ম রাজনৈতিক সম্পর্কের সূত্রপাত হলো। বর্মায় সম্ভাব্য ফরাসি আধিপত্য প্রতিহত করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিল ব্রিটিশরা তেমনই মালয়ী রাজ্যে ডাচ আধিপত্য খর্ব করার জন্য ব্রিটিশ প্রসারণ শুরু হল।

শেষ পর্যায়ে আমরা দেখতে পেয়েছি দুটি রাষ্ট্রে উপস্থিত ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায় নিজ স্বার্থে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ পরিচালিত করেছিল। বণিকশ্রেণীর অকারণ ভীতির কারণে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্য দুটি রাষ্ট্র ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের শিকার ক্ষেত্রে পরিণত হয়।

৬৬.৯ অনুশীলনী

ক। বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। বর্মার প্রাচীন রাল্ধানীর নাম কি?
২। বর্মার রাজধানী কতবার এবং কোথায় স্থানান্তরিত হয়?
৩। ব্রহ্মের একমাত্র রানীর নাম লিখুন।
৪। শান ও মোন জাতি কোথায় বসবাস করত?
৫। কুনবঙ রাজতন্ত্রের প্রথম রাজার নাম কি?
৬। রেঙ্গুন শব্দের অর্থ কি?
৭। ইয়ান্দাবু সন্ধি কত সালে সম্পাদিত হয়?
৮। র‍্যাফেলস কে ছিলেন?

খ। সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

১। মালয়ী ফেডারেশন কীভাবে স্থাপিত হয়?
২। ব্রহ্মরাজ মিন্দন মিনের সঙ্গে ব্রিটিশ সম্পর্ক বর্ণনা করুন।
৩। ব্রিটিশ বণিকদের ভীতি কীভাবে ব্রহ্মে ও মালয়ে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদকে সক্রিয় করেছিল?
৪। ব্রহ্মরাজ মিন্দনের সংস্কারগুলির একটি চিত্র প্রস্তুত করুন।
৫। কী পরিস্থিতিতে সিঙ্গাপুরে উত্থান হল?

গ। দীর্ঘ উত্তরে প্রশ্ন :

১। উনবিংশ শতাব্দীতে কী কারণে বর্মায় ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সূচনা হয়। এর ফলাফল কি ছিল?
২। মালয়ে ব্রিটিশ গভর্নর র‍্যাফেলসের অবদান কিরূপ?
৩। ১৮২৪ সালের পর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর বাদে ব্রিটিশরা কেন মালয় পুনরায় মনোযোগী হয়ে ওঠে?
৪। সিঙ্গাপুরের গুরুত্ব নিরুপণ করুন।

৬৬.১০ গ্রন্থপঞ্জী

1. H.M. wright—The making of South-East Asia. Routledge and kegan paul 1970.
2. J.F. Cady—A History of Modern Burma Cornell University Press.
3. D.R. Sardesai—South-East Asia—Past and Present. Vikas Publishing 1981.
4. Khoo Kay Kim (ed)—The History of South-East Asia—Essays and Documents. O.U.P. 1977.
5. J.F. Cady—South-East Asia—Its historical development, Mcgraw Hill 1979.
6. Lea E. Williams—South-East Asia—A History, O.U.P. 1976.
7. জহর সেন—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস।

একক ৬৭ □ থাইল্যান্ড বা শ্যামদেশে পাশ্চাত্য শক্তির অনুপ্রবেশ

গঠন

৬৭.০ উদ্দেশ্য

৬৭.১ প্রস্তাবনা

৬৭.২ শ্যামদেশে ঔপনিবেশিক শক্তির বিস্তার

৬৭.৩ শ্যামদেশে চক্রীরাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

  ৬৭.৩.১ চক্রীরাজতন্ত্রের বাস্তবমুখী নীতি
  ৬৭.৩.২ ঔপনিবেশিকতার যুগে থাইল্যান্ডের ব্যতিক্রমী চরিত্র
  ৬৭.৩.৩ থাইল্যান্ডে পরিবর্তনের সূত্রপাত
  ৬৭.৩.৪ চক্রী রাজতন্ত্রের কৃতিত্ব
  ৬৭.৩.৫ চতুর্থ রাম বা মঙ্কুটের সময়কাল
  ৬৭.৩.৬ থাইলরাডে নতুন যুগের সূচনা

৬৭.৪ চক্রীরাজ চুলালংকর্ণ-র সময়কালে ঔপনিপেবিকতাবাদ

৬৭.৫ শ্যামদেশে ঔপনিবেশিকতাবাদের ফলাফল

৬৭.৬ সারাংশ

৬৭.৭ অনুশীলনী

৬৭.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৬৭.০ উদ্দেশ্য

শ্যামদেশ বা থাইল্যান্ডের রাজতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির থেকে পৃথক ছিল। বর্তমান এককটি পাঠ করে আপনারা সেগুলি অর্থাৎ নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন—

- থাই রাজতন্ত্রের বাস্তববাদী প্রকৃতি।
- ঔপনিবেশিকতার যুগেবিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন।
- কূটনৈতিক দক্ষতায় থাইল্যান্ডের স্বাধীনতা রক্ষা।
- বিবিধ পশ্চিমী প্রযুক্তি গ্রহণ।
- শ্যামদেশের সার্বিক পরিবর্তন।

৬৭.১ প্রস্তাবনা

উনবিংশ শতকে যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশ ইউরোপের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পদানত তখন শ্যামদেশ বা থাইল্যান্ডে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অক্ষুন্ন ছিল। বস্তুতপক্ষে ব্রহ্ম এবং শ্যামদেশে বিদ্যমান ছিল শক্তিশালী রাজতন্ত্র অর্থাৎ এইদুটি রাষ্ট্রে রাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য পরিলক্ষিত হয়েছিল। ব্রহ্মের রাজতন্ত্র যেমন বর্মী জনগণের দুঃখের কারণ হয়েছিল বিপরীতভাবে শ্যামের রাজতন্ত্র সেই রাষ্ট্র ও জনতার গর্বের কারণ হয়ে উঠেছিল। এখন ত'আই বা তাই শব্দের অর্থ হল 'মুক্ত' (Tai means free)। থাইল্যান্ডের মানুষ ছিলেন স্বাধীনতাপ্রিয়। এই কারণে যে সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রে যখন দেখা যাচ্ছিল বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, রাজতান্ত্রিক সংঘর্ষ সেই সময়ে থাইল্যান্ড বা শ্যামদেশে ছিল ব্যতিক্রম। তবে ঐতিহাসিক নথিপত্রে থাইল্যান্ডকে বর্ণনা করাহয়েছে 'রাজতন্ত্র ও যুদ্ধবিগ্রহের কথা' বলে (tales of dynasties and battles)।

ব্রহ্মদেশের ইতিহাস থেকে জানা যায় থাই-ব্রহ্ম সংঘর্ষ লেগেই থাকত। থাইল্যান্ডের প্রাচীন রাজধানী আয়ুধায়া (Ayudhaya)-র উপর বর্মী আক্রমণ সমগ্র ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ছিল সাধারণ ঘটনা। এর মূল্যে অবশ্য একটা কারণ ছিল এই যে আয়ুধায়ায় একটি অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যায় শ্বেতহস্তী বাস করত। শ্বেতহস্তী ছিল একাধারে রাজকীয় মহিমা প্রদর্শনের লক্ষণ ও হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্মের পূজ্য প্রাণী।

৬৭.২ শ্যামদেশে ঔপনিবেশিক শক্তির বিস্তার

ব্রিটেন ও ফ্রান্স দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে বাণিজ্যিক কাজকর্মের অন্তরালে তৈরি করে চলেছিল রাজনৈতিক প্রভাবাধীন অঞ্চল, যেখানে বজায় থাকবে তাদের অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব। এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা সফল ছিল ব্রিটেন। ব্রিটিশরা একের পর এক ভারত, বর্মা, চীন প্রভৃতি রাষ্ট্রে বাণিজ্যের আড়ালে চূড়ান্ত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করছিল। এক্ষেত্রে ফ্রান্সও পিছিয়ে ছিল না। ইন্দোচীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ফরাসি আধিপত্য।

এই সময়ে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে দেখা গেল ব্রিটেন পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ হয়ে পূর্বে অগ্রসর হচ্ছিল এবং ফ্রান্স টংকিন হয়ে পশ্চিম মেকঙের দিকে আসছিল আর এই দুই বৃহৎ শক্তি প্রসারিত অঞ্চলের মধ্যর্তী স্থানে ছিল শ্যামদেশ। পশ্চিমী রাষ্ট্রদুটির কেউই তাদের জায়গা ছাড়তে রাজী ছিল না। সুতরাং এই অবস্থায় শ্যাম বা থাইল্যান্ডের মধ্যবর্তী অবস্থান দুটি রাষ্ট্রেরই প্রয়োজন ছিল। ফলে আপাতভাবে থাইল্যান্ড তার স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছিল।

ঐতিহাসিক মহলে শ্যামদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বজায় কারণ নিয়ে মতভেদ দেখা যায়। বলা হয়ে থাকে এই স্বাধীনতা কি থাই রাজতন্ত্রের দ্বারা আদৌ বজায় রাখতে পারা গিয়েছিল নাকি ব্রিটিশ ও ফরাসিরা পরিকল্পিতভাবে শ্যামদেশকে buffer state-এ পরিণত করে রেখেছিল বলে তার স্বাধীনতা বজায় ছিল।

৬৭.৩ শ্যামদেশে চক্রী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

অষ্টাদশ শতকে ব্রহ্মদেশের আক্রমণে থাইল্যান্ডের ইতিহাসে আয়ুধায়া রাজতন্ত্রের পর্যায়টি সমাপ্ত হয়। ১৭৮২ সালে চাওফায়া চক্রী নামক সেনাপতির নেতৃত্বে ব্যাংককে প্রতিষ্ঠিত হয় চক্রী রাজতন্ত্র। তিনি পরবর্তীকালে 'রাম' উপাধি নিয়ে রাজনৈতিক সংহতি ও সুবিচার এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করেন থাইল্যান্ডে। বস্তুতপক্ষে ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের সময়কালে চক্রী রাজতন্ত্র ও সুদক্ষ রাজকর্মচারীদের সুযোগ্য নেতৃত্ব লাভ করে থাইল্যান্ড নিজ রাষ্ট্রে এক নতুন যুগের সূচনা করে।

৬৭.৩.১ চক্রী রাজতন্ত্রের বাস্তবমুখী নীতি

পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির আগ্রাসনের বিপদ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্রই দেখা গিয়েছিল। পাশ্চাত্যের এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার মতো মানসিকতা কোন রাজতন্ত্রেরই ছিল না থাই চক্রী রাজবংশ ছাড়া। বস্তুপক্ষে পশ্চিমী প্রভাব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল এবং তার গঠনমূলক দিকটিকে উপেক্ষা না করে রাষ্ট্রের উন্নয়নে কাজে লাগিয়ে চক্রী রাজবংশ থাইল্যান্ডে পরির্তন নিয়ে আসে এবং ইউরোপীয় চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। বিপরীতভাবে ব্রহ্মদেশের রাজতন্ত্র ও সরকারি কর্মচারীরা পশ্চিমের এই অচেনা প্রভাবকে স্বীকার করতে পারেনি এবং তাকে প্রতিরোধ করার জন্য নিজ রাষ্ট্রীয় পন্থা অবলম্বন করেছিল যা ব্রিটিশ বাহিনীর সামনে ছিল নেহাৎই অপ্রতুল তাই ব্রহ্ম রাজতন্ত্রের পতন খুব সহজেই হয়ে গেল আর চক্রী রাজবংশ সেই উপনিবেশিক আগ্রাসনের যুগে ইউরোপীয় বিজ্ঞান, প্রযুক্তিকে রাষ্ট্রক্ষমতার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করে নিজ মহিমায় দাঁড়িয়ে রইল।

আবার এটাও ঠিক, কোন সরকারি নথিপত্রে ব্রিটিশ ও ফরাসিদের মধ্যে কোন দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনের তথ্য পাওয়া যায় নি যাতে করে এই মনে হতে পারে যে উভয় থাইল্যান্ডকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে চেয়েছিল। উনবিংশ শতকে থাইল্যান্ড তার সার্বভৌমত্ব বজায় রাখলেও দুটি পশ্চিমী রাষ্ট্রের কাছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের অধিকার ত্যাগ করেছিল।

৬৭.৩.২ উপনিবেশিকতার যুগে থাইল্যান্ডের ব্যতিক্রমী প্রকৃতি

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার থাইল্যান্ডে পশ্চিমী অনুপ্রবেশের পূর্বে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ১৫১২ সালে প্রথম এখানে এসে উপস্থিত হয় পর্তুগীজরা। তার প্রায় শতবর্ষ পরে ১৬০২ ও ১৬০৮ সালে ডাচ বা ওলন্দাজরা এখানে আসে। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ ও শেষার্ধে ফরাসিরা থাইল্যান্ডে প্রবেশ করে। ১৬৬১ সালে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ইংরাজ কোম্পানির ফ্যাক্টরি স্থাপিত হয়। তবে কোন ফরাসি কুঠি বা ফ্যাক্টরি এখানে স্থাপিত হয়নি। ভারতবর্ষে যেমন শক্তিশালী রাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হয়েছিল। থাইল্যান্ড ছিল তার ব্যতিক্রম। এখানে কিন্তু ব্রিটিশদের রাজদণ্ড প্রতিষ্ঠা হয়নি।

৬৭.৩.৩ থাইল্যাণ্ডে পরিবর্তনের সূত্রপাত

ব্যাংককে চক্রী রাজবংশ স্থাপনার (১৭৮২ খ্রিঃ) চার বছর পর ইউরোপীয়রা আবার থাইল্যাণ্ডে আসতে আরম্ভ করে। ইংরেজরা ইতিমধ্যে কেধা (Kedah) দ্বীপে, পেনাং-এ উপনিবেশ স্থাপন করেছে। আপনাদের সামনে ব্রহ্মদেশের রাজনৈতিক চিত্র উপস্থাপন করে বলা যেতে পারে ১৮২৫-এ ইয়ান্দাবু সন্ধি এবং তারপর আরো দুটি যুদ্ধে ব্রিটিশরা বর্মায় জয়লাভ করেছে। অন্যদিকে ফরাসিরা ভিয়েতনাম দখল করেছে উনবিংশ শতকের আগেই।

এইসব দ্রুত ঔপনিবেশিক বিস্তারের সামনে থাইল্যাণ্ড অসহায় ছিল তবে চতুর্থ রাম বা মোঙ্গকুট (Mongkut)-এর সময় থেকে শ্যামদেশে পরিবর্তনের সূচনা হয়। দেখা গেল মোঙ্গকুট পশ্চিমী নীতি (পরিবর্তনের প্রচেষ্টা অর্থাৎ ইউরোপীয় প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্রের উন্নয়নের প্রচেষ্টা) গ্রহণ করে পশ্চিমের আগ্রাসনকে ঠেকিয়ে রাখলেন। তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারীরা যোগ্যতার সঙ্গে এই নীতিকে ধরে রেখেছিলেন। অর্থাৎ পশ্চিমী অনুপ্রবেশের পদগুলিকে রাষ্ট্রের প্রগতির জন্য কাজে লাগিয়ে ছিলেন।

৬৭.৩.৪ চক্রী রাজতন্ত্রের কৃতিত্ব

প্রথম রাম (১৭৮২-১৮০৯) তাঁর সময়কালে চক্রী রাজতন্ত্রকে সংহত ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন করেন। দ্বিতীয় রামের সময়কাল থেকে (১৮০৯-১৮২৪) পশ্চিমী চাপ তথা বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ের চাপ শুরু হয়। দ্বিতীয় রাম ব্রিটিশ বণিকদের সুনজরে দেখে নি। কেধা ছিল ব্যাংককের অধীনস্ত, ইংরেজরা এই অঞ্চল দখল করে নিলে তাদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব খুব স্বাভাবিকভাবে থাইবাসীদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল। ১৮২৪ সালে ক্যাপ্টেন বার্নে (Burney)-এ নেতৃত্বে ব্রিটিশ মিশন বা দৌত্য ব্যাংককে আসে এবং ১৮২৬ সালে একটি বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পন্ন হয় যাতে ব্রিটিশ বণিকরা ব্যাংকক বন্দরের সুবিধা, দক্ষিণ-পূর্ব মালয়ী উপদ্বীপ অঞ্চলের উপর বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করে। একইভাবে আমেরিকাও ১৮৩৩ সালে কিছু বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেয় কিন্তু দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে কেউই থাইল্যাণ্ডে নিজ প্রতিনিধি রেখে বাণিজ্যিক পরিচালন ক্ষমতা লাভ করতে পারেনি। এখানেই চক্রী রাজবংশের কৃতিত্ব। উপদ্বীপের অঞ্চলগুলি যথানিয়মে থাই রাজতন্ত্রকে কর প্রদান করত, রাজকীয় নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করত। আরো বিশদভাবে বলা যায় রাজকীয় নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হত চিনি, কাঠ, চাল, মশলার রপ্তানি বাণিজ্য। আলোচ্য সময়কালে থাই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তৃতীয় রাম (১৮২৪-১৮৫১)। তাঁর সময়েই সম্পাদিত হয়েছিল ১৮২৬ সালে চুক্তিটি। এই চুক্তিটিতে ব্যতিক্রমীভাবে থাই কর্তৃত্ব বজায় ছিল এবং কেধার ওপর থাই কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয় এবং পেরাক ও সেলানগোর (Perak-Selangor)-এর স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। তবে মালয়ী অঞ্চল ট্রিংগানু, কেলানতন প্রদেশে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করার অধিকার পেয়েছিল ব্রিটিশরা।

৬৭.৩.৫ চতুর্থ রাম বা মঙ্কুটের সময়কাল

১৮২৪ সালে যখন দ্বিতীয় রামের মৃত্যু হয় তখন তাঁর পুত্র মংকুটের বয়স মাত্র উনিশ এবং তিনিই ছিলেন সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী। তিনি তখন প্রথানুযায়ী মঠে পড়াশুনা করছিলেন। রাজসভার প্রভাবশালী গোষ্ঠীর কূটনীতির কারণে তাঁকে আরো সাতাশ বছর মঠে রাখা হয় ও তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা সিংহাসন লাভ করেন তৃতীয় রাম উপাধি নিয়ে। দীর্ঘ এই সাতাশ বছর তিনি গভীরভাবে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, ভাষা শিক্ষা করেছিলেন আর পালন করেছিলেন মঠের গণতান্ত্রিক, শৃংখলাপরায়ণ জীবনযাত্রা। ফলে নিজেকে তিনি রাজা নয় সাধারণ মানুষ বলে ভাবতে শিখেছিলেন, বাস্তববোধের জন্ম হয়েছিল তাঁর মধ্যে। থাই রাজতন্ত্র যতজন রাজাকে লাভ করেছে তার মধ্যে মঙ্কুট ছিলেন সর্বাপেক্ষা বিদ্বান, বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন রাজা। ইউরোপীয় বণিকরাও এযাবৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যত সুলতান, রাজার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে মঙ্কুট ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তিনি তৎকালীন পৃথিবীর ঘটনালীর সম্পর্কে খবর রাখতেন। বিজ্ঞান, গণিত, কলা, জ্যোতিষশাস্ত্রে বিদ্যালাভ করেন এবং পাশ্চাত্য প্রযুক্তি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সামরিক শক্তির সম্যক ধারণা রাখতেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল স্বরাষ্ট্রে সংস্কারের আবশ্যিক প্রয়োজন রয়েছে। ১৮৪২ সালে ইংরেজদের কাছে চীনের পরাজয়ের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর মনে এই ধারণা হয় যে দুর্বল থাইল্যান্ডের প্রথাগত সমাজ ও সরকার খুব বেশিদিন প্রচণ্ড উপনিবেশিক শক্তিকে এড়াতে পারবে না। মঠে জীবনযাপন কালে তাঁর এই অভিজ্ঞতাটিও হয়েছিল যে রাষ্ট্রের সনাতন ঐতিহ্যকে পশ্চিমী ভাবধারায় নিশ্চিহ্ন করা অনুচিত। থাই ঐতিহ্যে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। তিনি গভীরভাবে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, পালি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁর মনে ধারণা জন্মেছিল বৌদ্ধধর্মের সংগঠনে ও সংস্কার করা আশু প্রয়োজনীয় কারণ ধর্ম এই সময় আচার-অনুষ্ঠানভিত্তিক হয়ে ওঠে। ১৮৩৭ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন নতুন আঙ্গিকে এক বৌদ্ধধর্ম সম্প্রদায় যার নাম ছিল ধম্মাযুতিকা (Dhamma yutika)। তিনি আমেরিকান ও ফরাসি মিশনারীদের কাছ থেকে বিদ্যা আয়ত্ত করেন। ফলে তিনি যখন সিংহাসনে আরোহন করেন তখন বাস্তব সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি তাঁর লব্ধপ্রতিষ্ঠ জ্ঞান, অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন।

১৮৫১ সালে তিনি চতুর্থ রাম উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। এই সময় ইউরোপীয় ওপনিবেশিকবাদ প্রবল প্রতাপে প্রসারিত হচ্ছিল ভারত, চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি অর্থনৈতিক শোষণে ভীষণভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে পশ্চিমী হস্তক্ষেপ তিনি সহ্য করেননি তবে বাণিজ্য, যাতায়াত, যোগাযোগ, মুদ্রাব্যবস্থার ক্ষেত্রে পশ্চিমী রেওয়াজ গৃহীত হয়েছিল। যতটা সম্ভব পশ্চিমের প্রযুক্তিকে গ্রহণ করে রাষ্ট্রব্যবস্থা শক্তিশালী করাই হল একজন বাস্তববোধ সম্পন্ন রাজার লক্ষণ।

চতুর্থ রাম (১৮৫১-১৮৬৮) ১৮৫৫ সালে স্যার জন বাওরিং নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক দৌত্যকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে সর্বপ্রকার বাণিজ্যিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করালেন।

এই সন্ধির ফলে আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত শুল্কনীতি স্থির করা হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ আফিং আমদানির উপর শুল্ক ছাড় দেওয়া হয়। আমদানি শুল্কের উপর ৩ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়। বেশি করের ভার থেকে ব্রিটিশদের রেহাই দেওয়া হয়। ব্যাংককে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট রাখার অনুমতি দেওয়া হয় এবং থাইল্যান্ডে বসবাসকারী ব্রিটিশ নাগরিকের উপর তাদের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এইভাবে বারোটি বিভিন্ন শর্তে মোটামুটিভাবে ব্রিটিশরা প্রায় অতিরাষ্ট্রিক অধিকারের সমতুল্য ক্ষমতা লাভ করে। পরের বছর আরো একটি চুক্তি করে পূর্ববর্তী চুক্তিগুলিকে সংশোধন করে নেওয়া হল। তবে এতসব সুবিধাদানের পশ্চাতে ছিল তোষামোদ করে প্রতারণা করা এবং সূক্ষ্মভাবে আবৃত ভয়ের প্রদর্শন। তাই একইভাবে ১৮৫৬-তে ফ্রান্সের সঙ্গে, ১৮৫৮-তে ডেনমার্কের সঙ্গে, ১৮৫৯ সালে পর্তুগালের সঙ্গে, ১৮৬০ সালে হল্যান্ডের, ১৮৬২ তে প্রাশিয়া এবং ইটালী, বেলজিয়াম, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সমানভাবে চুক্তি করে শ্যামদেশে বিদেশী বাণিজ্যিক উদ্যোগের রাস্তা খুলে দেওয়া হয়। এর একটাই উদ্দেশ্য ছিল সাবধানতা অবলম্বন যাতে কোন একটি রাষ্ট্র এককভাবে চূড়ান্ত ক্ষমতা অধিকারী হতে চাইলে বাকি রাষ্ট্রগুলি সমানভাবে তাকে প্রতিরোধ করবে।

৬৭.৩.৬ থাইল্যান্ডে নতুন যুগের সূচনা

১৮৫৫ সালের এই বাণিজ্যিক চুক্তিকে D.G. Hall বলেছেন "epoch-making"। বাস্তবিকপক্ষে এরপর থেকেই থাইল্যান্ডে নতুন যুগের সূচনা হয়। শুরু হল ব্যাপক আভ্যন্তরীণ সংস্কার যা চলেছিল মংকুটের পুত্র চুলালংকর্ণ-এর (Chulalongkorn) সময়কাল পর্যন্ত। রাষ্ট্রের প্রধান রূপে রাজার সুযোগ্য নেতৃত্বে শ্যামদেশ আধুনিক যুগে পদাপর্ণ করল। কিছু সামন্ততান্ত্রিক অধিকারকে লুপ্ত করে দেওয়া হল যেমন উচ্চ সরকারি কর্মচারীদের বিশেষ সুবিধা, রাষ্ট্রের কিছু একচেটিয়া অধিকার প্রভৃতি। শ্যামদেশে অর্থনৈতিক পরিবর্তন শুরু হয়েছিল তবে মংকুট তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় প্রাচীন সব অধিকারকে (বিশেষ করে অভিজাতদের) বিলোপ করেননি। থাইল্যান্ডে পশ্চিমী সংস্কৃতি অনুপ্রবেশ করল। পশ্চিমী শিক্ষক, প্রশিক্ষক, পরামর্শদাতা উপস্থিত হলেন শ্যামদেশে মংকুট তাই অভিজাতদের পশ্চিমী শিক্ষা প্রদানে সচেষ্ট হলেন। তিনি নিজেই পরিবর্তন নিয়ে এলেন। কিছু প্রাচীন রাজতান্ত্রিক রীতিনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন এলো যেমন রাজার মুখ আবৃত করে রাখার রীতি তিনি তুলে দিলেন মংকুটের পূর্ববর্তী রাজাদের মন্দিরে পুজো দিতে যাবার বাৎসরিক রীতি রহিত করেন। তিনি রাজাদের জনসমক্ষে বের হবার রেওয়াজ শুরু করেন। এতে রাজার সঙ্গে প্রত্যক্ষ জনসংযোগ স্থাপিত হয়। এছাড়া জনগণ যাতে রাজার কাছে সরাসরি আবেদন জানতে পারে সেই ব্যবস্থাও চালু করেন। রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করেন জাহাজ তৈরির কারখানা। একাধিক উন্নতমানের সড়ক ও জলপথ চালু করেন। ১৮৬০ সালে রাজকীয় টাকশাল প্রতিষ্ঠা করেন। মংকুট তৈরি করান ছাপাখানা। বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্য অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান চালু করেন।

৬৭.৪ চক্রীরাজ চুলালংকর্ণ-র সময় ঔপনিবেশিকতাবাদ

১৮৬৮ সালে মংকুটের স্থলাভিষিক্ত হলেন পঞ্চম রাম বা তাঁর পুত্র চুলালংকর্ণ। তাঁর শাসনকালে (১৮৬৮-১৯১০) কম্বোডিয়া সহ বেশ কয়েক মালয়ী অঞ্চলের উপর শ্যামের কর্তৃত্ব নষ্ট হয়ে যায়। এইভাবে ফ্রান্সের চাপে পড়ে থাইল্যান্ডের সীমা অনেকাংশে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। অন্যতম থাই এলাকা লাওসের ওপর ফ্রান্সের দৃষ্টি ছিল অনেকদিন থেকেই কিন্তু মংকুট কূটনৈতিক দক্ষতায় শ্যামদেশে ফরাসি প্রটেকটোরেট স্থাপনের অধিকার দিয়েছিলেন। অধিকার নিঃশর্ত ছিল না। পশ্চিম কম্বোডিয়ার বাতমবাং (Battambang) ও সিয়ামরীপের (Siem Reap) ওপর থাই আধিপত্য ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ব্রিটিশদের ও বিশেষ করে ফরাসি অনুপ্রবেশের চাপ বৃদ্ধি পায়। ১৮৮৫ সালের মধ্যে টংকিন, আন্নাম ছাড়া কোচিন-চীন এবং কম্বোডিয়াতে ফরাসি আগ্রাসন সম্পূর্ণ হয় এবং লাওসের ওপর ফ্রান্সের লুব্ধ দৃষ্টি পড়ে। এই সময়ে ফরাসি কার্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছিল তারা লাওসে প্রোটেকটোরেট স্থাপন করবে। এছাড়া টংকিনে অধিকার স্থাপন করে মেকঙের পশ্চিমে অগ্রসর হওয়া স্বাভাবিক ছিল। পশ্চিমে অগ্রসর হলে লাওসের উপর দাবি অনিবার্য হয়ে উঠত। ফ্রান্সের এই ধরনের দাবির ব্যাপারে থাইল্যান্ডের সন্দেহ হতে থাকে। থাইরাজ এই সন্দেহের ব্যাপারটি তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন 'বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় সমস্যাটি হলো আমাদের রাষ্ট্রকে রক্ষা করা ..... আজকের দিনে আমাদের বামে রয়েছে ব্রিটেন এবং ডানদিকে ফ্রান্স...' এই অবস্থায় প্রয়োজন ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কূটনীতি এবং প্রতিরোধের। তবে থাইল্যান্ডের সঙ্গে ব্রিটেনেরই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। থাই-ফরাসি সম্পর্কের অনেকটা সংঘর্ষমূলক হয়ে গেল ১৮৯৩ সালে। লাওসকে নিয়ে অনেকদিন ধরেই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা চলছিল। এবার শ্যামদেশকে অধীনস্ত করার জন্য ফরাসি রণপোত শ্যামের চাও ফারিয়া (Chao Pharaya) জলবিভাজিকার মুখে অবরোধ সৃষ্টি করে শ্যামের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টি করে। মেকঙের পশ্চিম তীর থেকে থাই সৈন্য প্রত্যর্পণের জন্য চরমপত্র পেশ করে ফ্রান্স। দুদিন অবরুদ্ধ থাকার পর থাইল্যান্ড ফ্রান্সের দাবি মেনে নেয় এবং ১৮৬৭ সালে অধিকৃত বাতামবাং ও সিয়েমরীপ ফরাসিদের হাতে তুলে দেয়।

এই সময়ে ব্রিটেনের পক্ষ থেকে মৌখিক আশ্বাস ছাড়া থাইল্যান্ডের প্রতি অন্য কোন সহযোগিতা করতে দেখা যায়নি। ঔপনিবেশিক স্বার্থে ফরাসি আগ্রাসনকে ভালো নজরে দেখেনি কিন্তু এই সময়ে ব্রিটেন কোন সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চায়নি।

৬৭.৫ শ্যামদেশে উপনিবেশিকতাবাদের ফলাফল

এরপর ১৯০৪ ও ১৯০৭ সালের চুক্তি দ্বারা ফ্রান্স লাওস এবং কম্বোডিয়ার ওপর অধিকার লাভ করে। ১৯০৭ সালে সম্পাদিত হয় ইঙ্গো-থাই চুক্তি যাতে ব্রিটেন লাভ উত্তরে মালয়ের চারটি সমৃদ্ধ রাজ্য যেমন কেলানতন (Kelantan), কেধা (Kedah), পেরলিস (Perlis), এবং ত্রেংগানু (Trengganu)। এখান থেকে থাই কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়। এইভাবে ব্রিটিশ আধিপত্য করা বা 'ক্রা' যোজক (Kra Isthmus) পর্যন্ত বিস্তৃত হল।

১৯০৯ সালে শ্যামদেশে ব্রিটিশ ও ফরাসিদের বাফার রাজ্যে পরিণত হয়ে যায়। বিশাল ভূখণ্ড (Mainland country) থাইলরান্ড ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে যায়। বিদেশীদের বহু অতিরাষ্ট্রিক অধিকার দান করতে বাধ্য হয়। এইভাবে থাইল্যান্ড বহু গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে অধিকার ত্যাগ করে। এখান থেকে সার্বভৌম অধিকারও ছেড়ে দিতে হয়। তবে শ্যামের স্বাধীনতা কিন্তু অক্ষুণ্ণ ছিল। যদিও আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও সময়কালীন যুগে আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন অংশের ঔপনিবেশিক দুর্দশার মাঝে থাইল্যান্ড বা শ্যামদেশের অবস্থিতি অবশ্যই কিছুটা গর্বের বিষয় ছিল। উপরিউক্ত আলোচনা সত্ত্বেও একথা বলা যায় ব্রিটেন ও ফ্রান্সের স্বার্থপর বদান্যতা শ্যামদেশের স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রেখেছিল। বাস্তবিক পক্ষে শ্যামদেশে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের আধা উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল।

৬৭.৬ সারাংশ

ঔপনিবেশিক বিস্তারের সময়কালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় উপদ্বীপ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র শ্যামদেশ বা থাইল্যান্ডের স্বাধীনতা বজায় ছিল। সর্বত্রই দেখা গিয়েছিল বিদেশী আগ্রাসন অথচ শ্যামদেশের শক্তিশালী বাস্তবমুখী রাজতন্ত্র এই আগ্রাসনকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত রেখেছিল। চক্রী রাজতন্ত্র রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছিলেন বিবিধ জনকল্যাণমুখী সংস্কার। অর্থনৈতিক দিক থেকে রাষ্ট্রকে প্রগতিশীল করে তুলে এবং সমৃদ্ধি নিয়ে এসে শ্যামদেশকে আর্থিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। বস্তুতপক্ষে এই শক্তিশালী আর্থিক কাঠামো রাষ্ট্রকে স্বাধীন রাখার ক্ষেত্রে শক্তি যুগিয়েছিল। চক্রী রাজারা এটাও উপলব্ধি করেছিলেন যে কোন একটি পশ্চিমী শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে সেই শক্তির অতিরিক্ত প্রভাব থাই স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। এইজন্য একাধিক রাষ্ট্রকে শ্যামদেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে কিছুটা জাপানের কায়দায়, তাদের পারস্পরিক বিবাদের সুযোগ নিয়ে চক্রী রাজারা থাইল্যান্ডের স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৬৭.৭ অনুশীলনী

ক। বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। থাই বা তাই শব্দের অর্থ কি?

২। থাইল্যান্ডের প্রাচীন রাজধানীর নাম কি লিখুন।

৩। থাইল্যান্ডে কোন প্রাণী রাজকীয় মহিমার প্রতীক ছিল?

৪। চক্রী রাজতন্ত্র কোথায়? কত সালে এবং কে প্রতিষ্ঠা করেন?

৫। চক্রী রাজাদের উপাদি কি ছিল?

৬। থাইল্যান্ডের রপ্তানি বাণিজ্যের পণ্যগুলি কি কি?

৭। শ্যামের জলবিভাজিকার নাম উল্লেখ করুন।

খ। সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

১। উপনিবেশবাদের যুগে শ্যামের রাজনৈতিক অবস্থিতি কী রূপ ছিল?

২। চক্রী রাজতন্ত্রের প্রকৃতি কেন ব্যতিক্রমী ছিল?

৩। ১৮৫৫ সালের চুক্তিকে কেন 'epoch making' বলা হয়?

৪। উপনিবেশবাদের যুগে চক্রী রাজতন্ত্রের স্বাধীনতা কী প্রকৃত স্বাধীনতা ছিল?

গ। দীর্ঘ উত্তরে প্রশ্ন :

১। রাজা মংকুটের সময়কালে চক্রী রাজতন্ত্রের অগ্রগতি বর্ণনা করুন।

২। থাই অগ্রগতি চুলালংকর্ণ'র সময়ে কতটা বজায় রেখেছিল"— আলোচনা করুন।

৩। "ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের স্বার্থপর বদান্যতা থাইল্যান্ডের স্বাধীনতা বজায় রেখেছিল"— আলোচনা করুন।

৬৬.৮ গ্রন্থপঞ্জী

1. Hong Lysa—Thailand in the Nineteenth Century. Institute of South Asia Studies 1994.
2. D.R. Sardesai—South-East Asia—past and Present. Vikas Pulishing 1981.
3. Kailash K. Beri—History and Culture of South-East Asia. Starling Publishers 1994.
4. Milton Osborne—South-East Asia—An Introductory History.
5. D.J.M. Tate—Making of Modern South-East Asia.

একক ৬৮ ☐ ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ ও ইন্দোচীনে পশ্চিমী উপনিবেশাদ ও প্রসার

গঠন

৬৮.০ উদ্দেশ্য

৬৮.১ প্রস্তাবনা

৬৮.২ ফিলিপিন দ্বীপে স্পেনীয় আধিপত্যের সূচনা

  ৬৮.২.১ ফিলিপিনে স্পেনীয় বাণিজ্য

  ৬৮.২.২ ফিলিপিনের সমাজ ও বাণিজ্যে ইসলামের প্রভাব

  ৬৮.২.৩ স্পেনীয় আধিপত্যের সংহতিকরণ

  ৬৮.২.৪ ফিলিপিনে স্পেনীয় প্রশাসন

৬৮.৩ প্রাক্-ঔপনিবেশিক ফিলিপিনের ধর্মব্যবস্থা

  ৬৮.৩.১ ফিলিপিনের অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্পেনের ভূমিকা

  ৬৮.৩.২ স্পেনীয় প্রসারণের প্রকৃতি

৬৮.৪ মিশনারীদের ভূমিকা

৬৮.৫ ফিলিপিনে স্পেনীয় প্রভাব

  ৬৮.৫.১ ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে স্পেনীয় আধিপত্যের ফলাফল

  ৬৮.৫.২ দ্বীপপুঞ্জে বিদ্রোহের প্রসার

৬৮.৬ আমেরিকীয় শাসনের সুচনা ও ফলাফল

৬৮.৭ ইন্দোচীনে ফরাসি অনুপ্রবেশ

  ৬৮.৭.১ ফরাসি মিশনারীদের সক্রিয়তা

  ৬৮.৭.২ ইন্দোচীনের রাজতন্ত্র ও ফরাসি সম্পর্ক

  ৬৮.৭.৩ গিয়াল্যাং রাজতন্ত্র ও সমাজ সংস্কার

  ৬৮.৭.৪ ইন্দোচীনের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি

    ৬৮.৭.৫ ফরাসি আধিপত্য প্রসারণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা
৬৮.৮ ইন্দোচীনের রাজতন্ত্রের বিরোধিতা
    ৬৮.৮.১ ইন্দোচীনের যুদ্ধ ও কোচিন-চীনের অধিকার
    ৬৮.৮.২ কম্বোডিয়া দখল
    ৬৮.৮.৩ লাওস অধিকার
    ৬৮.৮.৪ থাই-ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সমগ্র ইন্দোচীনে ফরাসি অধিকার স্থাপন
৬৮.৯ সারাংশ
৬৮.১০ অনুশীলনী
৬৮.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৬৮.০ উদ্দেশ্য

ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ ও ইন্দোচীনে স্পেনীয় ও ফরাসি ঔপনিবেশিকতাবাদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। এককটি পাঠ করে আপনি নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি জানতে পারবেন—

- ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে স্পেনীয় বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক সংহতিকরণ।
- স্পেনীয় শাসনের নির্মম প্রকৃতি।
- সমাজজীবনে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের বিস্তার।
- ইন্দোচীন রাজতন্ত্রের ইউরোপীয় বিরোধী মনোভাব।
- ফরাসি একাধিপত্য স্থাপনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।
- স্পেনীয় ও ফরাসি মিশনারীদের সক্রিয়তা।
- ফিলিপিনে স্পেনীয় শাসনের অবসান ও আমেরিকার শাসনের সূচনা।

৬৮.১ প্রস্তাবনা

ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে ঔপনিবেশিক প্রসারণবাদের সময়কালে অনিবার্যভাবে উপস্থিত হয়েছিল পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ। যদিও এখানে প্রাচীনকাল থেকে সমাজব্যবস্থায় চীনাদের আধিপত্য ছিল, এছাড়াও ছিল ইসলামীয় ও ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব। তবে স্পেনীয় আধিপত্যের সময়কালে ফিলিপিনের সমাজ, বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূচনা হয়। স্পেনীয় শাসনের পর ফিলিপিনে আমেরিকীয় শাসনের সূত্রপাত হয়। দুটি পাশ্চাত্য শক্তির প্রভাবে এখানে সামগ্রিকভাবে যে পরিবর্তন আসে তা এখানকার জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রসারণের এবং একাধিক বিদ্রোহের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপ অঞ্চল ছাড়া মূল ভূখণ্ড অঞ্চলেও পশ্চিমীশক্তির সমাবেশ হয়েছিল। ইন্দোচীনে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল ফরাসিরা। ফরাসিরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে অন্যান্য পশ্চিমী রাষ্ট্রের আগ্রাসনের পথ এখানে রুদ্ধ করে রেখেছিল। শেষ পর্যন্ত সমগ্র ইন্দোচীনে ফরাসি আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

৬৮.২ ফিলিপিন দ্বীপে স্পেনীয় আধিপত্যের সূচনা

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে স্পেনীয় আধিপত্যের সূচনা হয় ১৫৬৫ সালে। যদিও ইতিপূর্বে প্রায় চল্লিশ বছর আগে ম্যাগেলান এই পথে এসেছিলেন কিন্তু স্পেনীয়রা আমেরিকাতেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিল। ১৫৬৫ সালে মিগুয়েল লোপেজ ডি লেগাসপি একটি ছোট জাহাজ প্রায় চারশত স্পেনীয়দের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার Cebu-তে এসে উপস্থিত হলেন। মেক্সিকো থেকে তৎকালীন স্পেন সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের সম্মানার্থে এই উপদ্বীপের নামকরণ করা হয় ফিলিপিন্স। মেক্সিকো ও ফিলিপিনের সংযোগ ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ফিলিপিন্স দ্বীপপুঞ্জ যেন পশ্চিম গোলার্ধের স্পেনীয় সাম্রাজ্যের অতিরিক্ত একটা অংশ হয়ে উঠেছিল।

৬৮.২.১ ফিলিপিনে স্পেনীয় বাণিজ্য

প্রাচ্য অভিযানের মূলেই ছিল সুগন্ধী মশলার আকর্ষণ। তবে ফিলিপিনে বাণিজ্যঘাঁটি স্থাপন করাটা স্পেনীয়দের পক্ষে আর্থিক দিক থেকে তেমন একটা লাভজনক ছিল না। কারণ এখানে মশালার উৎপাদন হত না আর সম্পদের অন্য কোন উৎসও এখানে ছিল না। মানিলা ছিল চীনা সিল্ক ও অন্যান্য চীনা পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্যক্ষেত্র তাই Cebu থেকে মানিলাতে স্পেনীয় বাণিজ্যকেন্দ্রটি স্থান পরিবর্তন করে ১৫৭১ সালে। একানে সিল্ক, চন্দন কাঠ ও মশলা এবং অন্যান্য ক্রান্তীয় উৎপাদন দ্রব্য বিনিময়ে বাজার গড়ে ওঠে। মানিলার অবস্থান ছিল বাণিজ্যিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এখানকার বন্দরে আসত চীনা বাণিজ্যতরী ও ফিলিপিনের দক্ষিণ থেকে বাণিজ্যিক নৌকাগুলিও এখানকার বন্দরে আশ্রয় নিত। তাই মানিলা হয়ে উঠেছিল ফিলিপিনের মুখ্য-বাণিজ্যকেন্দ্র।

৬৮.২.২ ফিলিপিনের সমাজ ও বাণিজ্যে ইসলামের প্রভাব

মানিলাতে দক্ষিণ ফিলিপিন্স থেকে বেশিরভাগ মুসলমানরাই আসত বাণিজ্য করতে। এদের মুর বলা হত। এই মোরে (Moor/Moro)-দের সঙ্গে স্পেনীয়দের ছিল বহু প্রাচীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মানিলার উপকূলে স্পেনীয় বাণিজ্যের মূলে কাজ করেছিল দুটি প্রয়োজন। প্রথমত, এই বিশাল বাণিজ্য উপকূল থেকে মুসলমানদের বিতাড়ন। দ্বিতীয়ত, এই মুসলমানদের বাণিজ্যক্ষেত্র থেকে বহিষ্কার করে চীনা বাণিজ্যদ্রব্যের উপর স্বাভাবিক অধিকার স্থাপন করতে পারলে এই বাণিজ্যদ্রব্য স্পেনীয় অভিজাতমণ্ডলী (grandess) ও মহিলাদের কাছে অত্যন্ত লাভজনক চড়া মূল্যে বিক্রি করে লাভবান হবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। চীনা বণিকরাও অনেক প্রকার বিলাসদ্রব্য, সূক্ষ্ম ভোগ্যপণ্য যেমন পোর্সেলিনের বাসনপত্র প্রভৃতির ব্যবসায়ে খুবই আগ্রহী ছিল।

এখানকার সমাজব্যবস্থায় খুব দ্রুততার সঙ্গে ইসলাম ধর্ম ঢুকে পড়েছিল। মিন্দানাও ও পালাওয়ানের কিছু কিছু অংশে ছড়িয়ে গিয়েছিল ইসলাম ধর্ম তবে স্পেনীয় প্রসারণের সময়ে লুজন (Luzon) ও বিসায়াসের (Visyas)

উপর প্রভাব কিছু ছিল না। ফিলিপিনের অপর বৈশিষ্ট্য হল এখানে প্রচলিত ছিল স্থানীয় রাজনৈতিক কাঠামো ও বাণিজ্যিক জীবনযাত্রা। স্থানীয় রাজনীতি ও বাণিজ্য ছিল ফিলিপিনের প্রাথমিক রাষ্ট্রীয় উপাদান। ফিলিপিনে, কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অভাবে বাণিজ্যপথে বন্দর শহরগুলিতে ও লোকালয়ে ইসলাম ধর্ম প্রসারিত হচ্ছিল। বণিক ও বাণিজ্যকেন্দ্রের পরিচালকরা এই ব্যাপারে অংশ নিতেন। তাই বাণিজ্যসূত্রে যেমন ইসলাম ধর্ম ঢুকে পড়ল তেমনই কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবে স্পেন অতি দ্রুত ফিলিপিনে বাণিজ্যিক প্রসারণ ও রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করে।

৬৮.২.৩ স্পেনীয় আধিপত্যের সংহতিকরণ

ফিলিপিনের নিম্নভূমিতে চাষযোগ্য অঞ্চল নিয়ে কোন বড় রাজ্য ছিল না এবং পার্বত্য অঞ্চলে কোন বড় জাতিগোষ্ঠীও ছিল না। জ্ঞাতিত্ব নির্ভ করত কৃষক ও মৎসজীবীদের তৈরি ছোট দলগুলির উপর। এই ছোট দলগুলিই স্থানীয় রাজনীতি নির্ধারণ করত। এই স্থানীয় রাজনীতিক দলগুলিকে বলা হত বারাঙ্গে (Barrangay)। একটি বারাঙ্গে দুইশত থেকে দুই হাজার স্থানীয় মানুষ নিয়ে তৈরি হত। যার শীর্ষে থাকতেন Datu বা একজন দলপতি (Clansman)। ফলে ফিলিপিনে কোন উচ্চ প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের অভাব ছিল না। এই ছোট ছোট বরাঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক একতা, সহযোগিতার পরিবর্তে ছিল সন্দেহ, অবিশ্বাস, শত্রুতা। এই বিকেন্দ্রীকৃত বিচ্ছিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো স্পেনীয়দের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেনি।

তাই প্রায়শই প্রতিরোধমূলক প্রবণতা কখনও বা নিষ্ক্রিয়তা কিংবা যুদ্ধ সংঘটিত হত স্থানীয় স্তরে। বরাঙ্গের পক্ষ থেকে স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে কখনোই ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়নি। ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বারাঙ্গেদের অক্ষমতা স্পেনীয় শাসন ও ধর্মকে খুব দ্রুত প্রসারে সাহায্য করে। তবে দক্ষিণভাগের মুসলমান ও দুর্গম পার্বত্য প্রদেশের মানুষরা স্পেনীয়দের চাপিয়ে দেওয়া অর্ধদাসত্ব ও ব্যাপটাইজড হওয়া থেকে রেহাই পেয়ে গিয়েছিল।

৬৮.২.৪ ফিলিপিনের স্পেনীয় প্রশাসন

ফিলিপিন্সের বিজিত অঞ্চলগুলিকে স্পেনীয়রা প্রশাসনিক এককে বিভক্ত করে তার নাম দিয়েছিল এনকোমিয়েন্ডাস (Enconomiendas) এবং রাজকীয় আদেশানুসারে তার প্রধানকে বলা হত এনকোমেন্ডারো (Encomerdero)। একটি এনকোমিয়েন্ডার অধীন কৃষক সম্প্রদায়গুলির মানুষরা বার্ষিক খাজনা হিসাবে পণ্যদ্রব্য ও কায়িক শ্রম দানে বাধ্য থাকত এবং এনকোমেন্ডা তার অধীনস্থদের সুরক্ষা প্রদান ও তাদের মধ্যে ব্যাপ্টিস্ট ধর্ম প্রসারের কাজ করতেন। এরা হতেন সাধারণত প্রবীণ স্পেনীয় বিজেতা, যাঁরা পুরস্কারস্বরূপ এই এনকোমিয়েন্ডাস লাভ করতেন। বহু সংখ্যক ফিলিপিনো জেলাগুলির সম্পদ ব্যবহার করা হত উপনিবেশিক স্পেনীয় সৈন্য প্রতিপালনের জন্য। তবে সম্পদের অপব্যবহারও হত বহু পরিমাণ। এনকোমান্ডো তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে প্রয়োজনের অধিক ব্যয় করতেন। বারাঙ্গে দলপতিও নিজস্থান রক্ষার্থে অসাধু উপায় নিতেন। এই ব্যবস্থায় সর্বাপেক্ষা বেশি নিপীড়নমূলক

দিকটি ছিল এনকোমেন্ডারো তাঁর অধীনস্থদের উদ্বৃত্ত ফসল নির্দিষ্ট মূল্যে তাঁর কাছে বিক্রি করতে বাধ্য করতেন। এতে কৃষকদের দারিদ্র্য আরো বাড়ত কারণ উদ্বৃত্ত ফসলের লভ্যাংশ তাদের কাছে পৌঁছাত না।

৬৮.৩ প্রাক্-ঔপনিবেশিক ফিলিপিনের ধর্মব্যবস্থা

সপ্তদশ সতাব্দীর সূচনায় লুজন ও বিসায়াসের উপকূল ও নিম্নভাগের জনগণের মধ্যে ধর্মান্তিকরণের জোয়ার আসে। এখানে অর্থাৎ প্রাক্-ঔপনিবেশিক ফিলিপিনে কোন প্রতিষ্ঠিত ধর্মব্যবস্থা ছিল না; ছিলেন না পুরোহিত গোষ্ঠী। এখানকার মানুষ মাটি, পাথর প্রকৃতিকে দেবতা রূপে পূজা করতেন। তাই কোন পুরোহিত শ্রেণী এখানে গড়ে উঠতে পারেনি। ফলে স্পেনীয় মিশনারীদের ধর্মনৈতিক কোন প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হয়নি।

৬৮.৩.১ ফিলিপিনের অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্পেনের ভূমিকা

সাম্রাজ্যের অকারণ প্রসারও সাম্রাজ্য রক্ষায় সহায়তা করতে পারে না। যেমনটি দেখা গিয়েছিল সপ্তদশ শতকের সূচনায় পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের পতনের ক্ষেত্রে। আমেরিকায় সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে যে উদ্যম স্পেনীয়রা প্রদর্শন করেছিল তার সামান্যতমও ফিলিপিনের অর্থনৈতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি ফলে সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল। অর্থনৈতিক প্রগতি, রাজনৈতিক জাগরণ প্রভৃতি আরো কয়েকশ বছর পিছিয়ে গেল। এই দ্বীপপুঞ্জ স্পেনীয় সাম্রাজ্যের একটা Outpost হিসাবে রয়ে গেল। অবশ্য উপনিবেশের ক্ষেত্রে যে রাজকীয় নীতিগৃহীত হয়েছিল তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণে উৎসাহ দানে বিরত থাকা ও সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে উপনিবেশকে ব্যবহার করা। ফলে বহু ক্ষেত্রে উপনিবেশগুলি অবহেলিত হত।

৬৮.৩.২ স্পেনীয় প্রসারণের প্রকৃতি

ফিলিপিনে স্পেনীয় প্রসারণ ছিল খুব ধীরগতির এবং তা অসম্পূর্ণও ছিল। কারণ দক্ষিণ ফিলিপিনে স্পেনীয় আধিপত্য স্বীকৃত হয়নি। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের মধ্যে উত্তর ফিলিপিনের নিম্নভূমি অঞ্চলগুলিতেই স্পেনীয় আধিপত্য প্রসারিত হতে পেরেছিল। দক্ষিণ ফিলিপিনের মুসলিম প্রধান ও সুলতান শাসিত অঞ্চলগুলি তাদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। দক্ষিণভাগের কিছু বড়ো অঞ্চল যেমন জামবোয়াঙ্গে (Zamboanga) প্রভৃতি স্থানে স্পেনীয় কর্তৃত্ব প্রসারিত হয় কিন্তু Sulu, Mindanao-র সুলতানরা স্পেনের অধীনস্ত হননি। বলা যায় অনেক আগে থেকেই মুসলিম বিভেদের বীজ এখানে ছড়িয়ে যায়।

৬৮.৪ মিশনারীদের ভূমিকা

ফিলিপিনে স্পেনীয় প্রসারণের অতিরিক্ত বিষয়টি ছিল ক্যাথলিক ধর্মের প্রসার। ঐতিহাসিক John L. Phelon যাকে “Philippinization of Spanish Catholicism” অর্থাৎ স্পেনীয় ক্যাথলিক ধর্মে ফিলিপিনোকরণ বলেছেন।

এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে এখান তেকে ক্যাথলিক ধর্মের প্রসারলাভ করে। ১৫৭১ থেকে ১৮৯৮ এই সময়কালে ফিলিপিন ছিল একমাত্র এশিয় রাষ্ট্র যেখানে সবচেয়ে বেশি খ্রিস্টধর্মাবলম্বী মানুষ ছিলেন এবং যারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য যে কোন অঞ্চলের তুলনায় ছিলেন অনেক বেশি পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত। এখানে চার্চ ও যাজকের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা ফিলিপিনের তাগালোগ (Tagalog) ভাষা ও অন্যান্য স্থানীয় কথ্যভাষা শিক্ষা করেছিলেন যাতে স্থানীয় ভাষায় তাঁরা খ্রিস্টধর্মের খুঁটিনাটি জনগণকে জানাতে পারেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে প্রাচীন কলেজটি তাঁরাই প্রতিষ্ঠা করেন (১৬১১ সালে সেন্ট থমাস কলেজ যা পরে, ১৬৪৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়)।

ম্যানিলাতে চার্চ ও যাজকের ভূমিকার কথা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ব্রিটিশ পর্যটক স্যর জন বোরিং (Sir John Bowring)-এর উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে "গভর্নর জেনারেল আছেন দূরে ম্যানিলাতে; রাজা আছেন স্পেনে; এবং ঈশ্বর রয়েছেন স্বর্গে; কিন্তু যাজকরা আছেন সর্বত্র।" বস্তুতপক্ষে চার্চের প্রতিনিধি হিসাবে যাজকরা ছিলেন সর্বদিমান এবং জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনের উপর তাঁদের কর্তৃত্ব ছিল সাংঘাতিক। চার্লস এলিয়ট তাঁর দি ফিলিপিন্স গ্রন্থে বলেছেন, "The key to the early history Phillippines is Found in the missionary character of the enterpeise."

৬৮.৫ ফিলিপিনে স্পেনীয় প্রভাব

বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল স্পেনীয় শাসন উত্তর ফিলিপিনে একটি নতুন সামাজিক কাঠামো প্রস্তুত করেছিল। প্রাক্-ঔপনিবেশিক গ্রামীন কাঠামোর উপর তৈরি হয়েছিল এক বিদেশী ব্যবস্থা (non-indegenous system)। তবে স্পেনীয়রা যাবতীয় স্থানীয় বিষয় নাকচ করেছিল ভাবা সঠিক নয়। আবার এটাও ঠিক যে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক যে রূপরেখা স্পেনীয়া তৈরি করেছিল তার প্রভাবও গভীর ছিল।

ফিলিপিনে স্পেনীয় ক্যাথলিক ধর্ম সংখ্যালঘুদের ধর্ম হবার পরিবর্তে হয়ে উঠেছিল সমগ্র উত্তর ফিলিপিনের ধর্ম। এখানকার গ্রামীন সামাজিক জীবনে স্পেনীয় মিশনারীরা অনেক তাৎক্ষনিক পরিবর্তন এনেছিলেন। স্পেনীয় উপনিবেশিক শাসনের প্রভাব কৃষকসমাজকে স্পর্শ করেছিল এবং প্রথাগত স্থানীয় দলপতিরা লাভ করেছিলেন কিছু নতুন ও অতিরিক্ত ক্ষমতা। উনবিংশ শতকের সূচনায় কিছু স্থানীয় ফিলিপিনো গোষ্ঠীর উদ্ভব হয় যারা স্পেনীয় শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত ছিলেন এবং রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থায় ভূমিকা পালনের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। বলা যায় এরা ছিলেন স্পেনীয় উপনিবেশিক ব্যবস্থায় একটি শিক্ষিত গোষ্ঠী। কিন্তু তাদের এই যোগ্যতা অস্বীকৃত হয় কারণ তারা জাতিসূত্রে স্পেনীয় ছিলেন না।

৬৮.৫.১ ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে স্পেনীয় আধিপত্যের ফলাফল

বস্তুতপক্ষে তিনশত তেত্রিশ বছরে উপনিবেশিক শাসনকালে ফিলিপিনো জনগণের খুব নগণ্য ভাগই প্রশাসন, রাজনীতি ইত্যাদিতে অংশ নিতে পেরেছিলেন। এঁরাও যে আবার স্থানীয় জনগণের বিশেষ সাহায্য করতে

পেরেছিলেন তাও বলা যায় না। কারণ তাঁরা পুরোপুরি স্পেনীয় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে থেকে কর্তব্য সম্পাদন করতেন। এছাড়া স্পেনীয় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে যে বিশাল বাণিজ্য সম্পাদন হতো ম্যানিলা ও মেক্সিকোর বন্দর সহর আকাপালকোর (Acapulco) মধ্যে। এই লাভজনক ব্যবসায়ে ফিলিপিনোদের প্রবেশাধিকার ছিল না। এই গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক লভ্যাংশ চলে যেত পুরোপুরিভাবে স্পেনীয়দের হাতে। এইসব কারণ ধীরে ধীরে স্থানীয় মানুষের মনে বিরুদ্ধ মনোভাব সৃষ্টি করে। শুধু ফিলিপিনোরাই নয় ব্রিটিশ; ফরাসি, ডাচ কেউই এই বাণিজ্যে অংশ নিতে পারত না। ম্যানিলা-আকাপালকো বাণিজ্যপথে একাধিপত্য ছিল স্পেনীয়দের। বলা হয়ে থাকে স্পেনীয়রা প্রশান্ত মহাসাগরকে একটি স্পেনীয় হ্রদে পরিণত করে ফেলেছিল। ফিলিপিন উপদ্বীপকে স্পেনীয় বাণিজ্য (Gallon Trade) অন্য কোন রাষ্ট্রের কাছে নিষিদ্ধ করে রেখেছিল। এই দমবন্ধ অবস্থার হাত থেকে মুক্তি পেতে ফিলিপিনোরা আগ্রহী হলেও উনবিংশ শতক পর্যন্ত পরিস্থিতিকে মানিয়ে নিতে তারা বাধ্য ছিল।

৬৮.৫.২ দ্বীপপুঞ্জে বিদ্রোহের প্রসার

আলোচ্য সময়কালে অর্থাৎ স্পেনীয় উপনিবেশিক শাসনকালে ফিলিপিনে অনেকগুলি বিদ্রোহ সংঘটিত হতে দেখা যায়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জোস রিজাল (Jose Rizal)-এর নেতৃত্বে কাতিপুনান বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের নেতারা বহু সংস্কারধর্মী কার্যকলাপ নিয়েছিলেন। তবে অত্যন্ত দমননীতির দ্বারা ফিলিপিনের রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রয়াস রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। ফিলিপিনে স্পেনীয় শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষের জোয়ার আসে। স্থানীয় বিপ্লবী নেতারা স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খায় এই অসহনীয় স্পেনীয় শাসনকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার অপ্রশম্য আগ্রহে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। ১৮৪১-৪ সালে এবং ১৮৪৩ সালে বিদ্রোহের আগুন সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। দমনমূলক নীতির দ্বারা বিদ্রোহী ব্যর্থ হলেও ১৮৬৯ সালে তা পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। এই সময়ে ফিলিপিনোদের উল্লেখযোগ্য দাবিগুলির মধ্যে ছিল আইনের চোখে স্পেনীয় ও ফিলিপিনোদের সমান অধিকার; বাক্-স্বাধীনতা, সভা-সমিতির অধিকার প্রভৃতি। সুয়েজ খালের উন্মোচনের ফলে পশ্চিমের উদারনৈতিক চিন্তাভাবনা খুব দ্রুতগতিতে ফিলিপিনের মানুষকে প্রভাবিত করছিল।

৬৮.৬ আমেরিকীয় শাসনে সূচনা ও ফলাফল

১৮৯৮ সালে স্পেনীয়-আমেরিকীয় যুদ্ধে স্পেনের পরাজয় ফিলিপিনের রাজনীতিতে পরিবর্তন আনে। ফিলিপিন্সের ঔপনিবেশিক শাসকের চরিত্র বদলে যায়। জনগণ স্পেনের পরিবর্তে আমেরিকার শাসনক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ১৮৯৯ সালে প্রথম ফিলিপিনো রিপাবলিক/সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয়। তাহলেও আমেরিকার শাসন এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল যদিও ১৯৪১-১৯৪৫ পর্যন্ত এখানে জাপানী অধিকার স্থাপিত হয়েছিল।

দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর পশ্চিমী প্রশাসনের আওতায় ফিলিপিনের মানুষজদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্যকরণ হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বহু মানুষ ক্যাথলিক ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। ফিলিপিন সমাজ সংস্কৃতিতে এসেছিল

পাশ্চাত্য রীতি রেওয়াজ। স্পেনীয় প্রশাসন এই উপদ্বীপ অঞ্চলকে রীতিমতো পশ্চিমী কায়দায় আধুনিক করে তুলেছিল। পশ্চিমী শিক্ষা এখানে জাতীয়তাবাদের প্রসারণ ঘটিয়েছিল। প্রশাসনের দৃঢ় কেন্দ্রীকরণ ছিল ফিলিপিনের স্পেনীয় প্রশাসনিক আওতায় তৈরি হয়েছিল প্রাদেশিক ও পৌর সাংগঠনিক এককগুলি। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে। এই ব্যবস্থা তাকে অন্যান্য উপনিবেশের থেকে পৃথক সত্তা দান করেছিল।

আমেরিকার শাসনকালে ফিলিপিনে অনেক প্রগতি পরিলক্ষিত হয়। স্পেনীয় শাসনের তুলনায় তা ছিল অনেক উদার ও সহানুভূতিমূলক। দুটি প্রশাসন ব্যবস্থায় পার্থক্য ছিল। কারণ স্পেনীয়রা যে সময়ে ফিলিপিনে আবির্ভূত হয়েছিল তখন পশ্চিম ইউরোপে উদার নৈতিকতা বা গণতন্ত্র কোনটিই তেমনভাবে প্রসারলাভ করেনি অথচ বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকা পরিচিত হল পৃথিবীর প্রথম গণতান্ত্রিক ও আধুনিক প্রগতিমূলক রাষ্ট্ররূপে। এই হিসাবে স্পেন অনেক পিছিয়ে ছিল তাই উপনিবেশগুলিতে কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। অন্যদিকে আমেরিকার শাসনে ফিলিপিন্সে অগ্রগতি দেখা গেল।

স্পেনীয় শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ধর্মমূলক ও চার্চের নিয়ন্ত্রণাধীন। কোন ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা দেওয়া হত না স্পেনীয় উপনিবেশগুলিতে। আমেরিকার প্রশাসনকালে শিক্ষাকে ধর্মব্যবস্থা থেকে পৃথক করা হল। যদিও স্পেনীয়রা ফিলিপিন্স দ্বীপে কলেজ স্থাপন করেছিল তা কিন্তু ধর্মভিত্তিক। আমেরিকা ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা এখানে চালু করে। বহু শিক্ষক আমেরিকা থেকে আসতে থাকেন, ইংরেজী ভাষার ব্যাপক প্রসার হয়, নতুন শিক্ষাক্রম চালু হয়। স্বাস্থ্য, শরীর, পৌর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। শেখানো হতে থাকে মানবিক মূল্যবোধ। ফলে ফিলিপিনের সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্র থেকে স্পেনীয় প্রভাব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আমেরিকীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ফিলিপিনোরা আধুনিক রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। তাদের মনের প্রসারতা লাভ হয় এবং রাজনৈতিক সচেতনতা আসতে থাকে। দ্বীপবাসীরা রাজনীতির গণতান্ত্রিকরণে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেখা গেল এক পরিবর্তিত চিত্র। সমাজব্যবস্থা এমনভাবে আমেরিকার আধুনিকতাকে গ্রহণ করেছিল যাতে ফিলিপিনের পোশাক, কথাবার্তা, আচরণ সবকিছু থেকে একটা বিষয় যেন স্পষ্ট হতে লাগল যে তারা ফিলিপিনো নয় তারা আমেরিকান। অর্থাৎ আমেরিকার প্রভাব জনজীবনের সর্বাঙ্গীন স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। ফিলিপিনে মৃত্যুহার কমে গিয়েছিল। জনগণ স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে উঠেছিল।

অন্যদিকে আমেরিকাতেও ফিলিপিন সম্পর্কে নীতি নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। ১৯০২ সালে Organic Act পাস হয়। এই বছরই Cooper Act পাস করে বলা হয় যে ফিলিপিন যাতে ক্রমিক পর্যায়ে স্বাধীনতা লাভ করতে পারে তার জন্য আমেরিকা সাহায্য করবে। ১৯১৬ সালে Jones Act পাস করে পিলিপিন জীবনযাত্রার অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার প্রসার ঘটানো হয়। ১৯৩৪ সালে পাস হয় Tydings Meduffic Act। এই আইনে বলা হল স্বায়ত্তশাসনের দশ বছর কালের অধিকার শেষ হলে ফিলিপিনোরা স্বাধীনতা পাবে। ১৯৩৫ সালে তাদের নিয়ে গঠিত হয় ফিলিপিন কমনওয়েলথ। অবশেষে ১৯৪৬ সালে ফিলিপিন স্বাধীনতা লাভ করে।

৬৮.৭ ইন্দোচীনে ফরাসি অনুপ্রবেশ

ইন্দোচীনে ফরাসিরাই একমাত্র তাদের আধিপত্য বজায় রেখেছিল এবং অন্য কোন পশ্চিমী শক্তি যাতে এখানে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে সে বিষয়েও সতর্ক ছিল। ব্রিটিশদের মতো তারাও একই উদ্দেশ্য পোষণ করত। ডাচ ও ব্রিটিশদের সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া, নিজ প্রভাবাধীন অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করে নেওয়া। ইন্দোচীন রাষ্ট্র বলতে বোঝান হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় উপমহাদেশের পূর্ব উপকূলবর্তী রাজ্যসমূহ নিয়ে গঠিত অঞ্চলকে। এই রাজ্যগুলির মধ্যে অন্নাম, টংকিন, লাওস ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়াকে বোঝায়। আপনারা আগেই জেনেছেন এখানে প্রথমে পর্তুগীজরা এসেছিল এবং ১৬১৫ সালে ফাইফো (Faifo) অঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। এই অঞ্চলটি ছিল আন্নাম ও টংকিনের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী একটি অংশ। এখানকার উলেখ্য বাণিজ্যপণ্য ছিল কাঁচা রেশম। ফরাসিরা ইন্দোচীনে পর্তুগীজদের পরেই আসে কিন্তু এদের অনুপ্রবেশের গতি ছিল খুব ধীরে। ১৬৬৮-তে ভারতের পশ্চিম উপকূলের সুরাটে, ১৬৬৯ সালে জাভার বান্টমে এবং ১৬৭৪ সালে পূর্ব ভারতীয় পন্ডিচেরীতে ফরাসি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছিল। এই সময়কালের মধ্যেই অনেকবার ভিয়েতনামের হিউ ও তুরেনে ফরাসি কুঠি স্থাপনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। ইন্দোচীনের পাঁচটি রাজ্যে ফরাসি আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৪৭ সালে এবং তা ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে ওঠে ১৮৫৪ সালের মধ্যে ব্রিটিশদের মতো ফরাসিরাও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে এখানে নিজেদের কুঠি (Factory) প্রতিষ্ঠা করে। অবশ্যম্ভাবী ভাবে অন্যান্য পশ্চিমী শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে পশ্চিমী উপনিবেশিক অনুপ্রবেশের যুগে এই চিত্র অবধারিতভাবে উপস্থিত হয়েছে।

৬৮.৭.১ ফরাসি মিশনারীদের সক্রিয়তা

ফরাসি মিশনারীরা ১৬২৭ সালে টংকিনে প্রথম এসে উপস্থিত হন। এরপর ১৬৬৪ সালের মধ্যে আন্নাম, টংবিন অঞ্চলে ক্যাথলিন চার্চ, পাঠাগার প্রভৃতি নির্মিত হয়। ফরাসি মিশনারীগণ কখনো রাজাদের কাছ থেকে ভূখণ্ড লাভ করতেন। কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনাম অঞ্চলে এইসব ভূখণ্ডে নির্মিত প্রতিষ্ঠানগুলি মিসনারী কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠতে থাকে। দেখা যেত এখানকার মিশনারীরাও রাজাদের মধ্যে ফরাসি সরকারে সঙ্গে কূটনৈতিক মিত্রতায় আবদ্ধ হবার জন্য সামান্য চাপ সৃষ্টিও করতেন। ভিয়েতনামী রাজারা কোন কোন সময়ে কূটনৈতিক মিশন প্রেরণ করেছেন ফ্রান্সে। এই মিশনারীরা রাজার দরবারে দো-ভাষীর কাজ করতেন। তাই দেখা যায় মিশনারীরা রাজনৈতিক ভূমিকাও পালন করেছিলেন। তবে ভিয়েতনামী বা ইন্দোচীনের জনগণ খুব সহজে মিশনারীদের মনে নেয়নি। শুধু মিশনারী নয় ফরাসি অনুপ্রবেশও খুব সহজে ইন্দোচীনের জনগণের কাছে স্বীকৃতি পায়নি। প্রতিরোধ সবসময়েই ছিল কিন্তু মিশ্র সমাজ ও সংস্কৃতির কারণে প্রতিরোধ কখনোই ঐক্যবদ্ধ রূপ নেয়নি। তাই দেখা যায় খুব অল্প সময়েই এখানে ফরাসি আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৬৮.৭.২ ইন্দোচীনের রাজতন্ত্র ও ফরাসি সম্পর্ক

অষ্টাদশ শতকে ইন্দোচীনের হিউকে রাজধানী করে গিয়া ল্যাং-এর এঙ্গুয়েন রাজতন্ত্র (Nguyen Dynasty) স্থাপিত হয়। এই স্থাপনের ক্ষেত্রে ফরাসি রাজকর্মচারী, বণিকদের যথেষ্ট সহায়তা ছিল। রাজধানীর নির্মাণ, সড়ক, যাতায়াত ইত্যাদি ক্ষেত্রে ফরাসি ইঞ্জিনীয়ারদের অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ আর এই কারণেই রাজতন্ত্র ফরাসিদের প্রতি খুবই মিত্রতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। একই সঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবে ফরাসি ক্যাথলিক মিশনারীরা যথেষ্ট স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন। আন্নাম, কোচিন-চীনেও ফরাসি বণিক ও মিশনারীরা খুবই সক্রিয় ছিলেন। গিয়া লং তাঁররাজদরবারের ফরাসি প্রতিনিধিদের উচ্চ সরকারিপদ 'মান্ডারিন' (Mandarin) খেতাব প্রদান করেন একই সঙ্গে কয়েকটি বিশেষ অধিকার এবং সুবিধাও দিয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে ফরাসিদের কাছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাজকীয় উপনিবেশ স্থাপন করাই ছিল সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক ও মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্রীয় বিষয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল ফরাসিদের কাছে অপেক্ষাকৃত এক গৌণ ব্যাপার।

৬৮.৭.৩ গিয়া ল্যাং রাজতন্ত্র ও সমাজ সংস্কার

গিয়া ল্যাং চীনা রীতি অনুযায়ী কনফুসিও ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন একই সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল নতুন আইন সংহিতা (Legal code)। নেপোলিয়ানের যুদ্ধ এবং ফ্রান্সের বুরবোঁ রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় যুদ্ধের পর নতুন করে ফরাসি বাণিজ্যতরী ভিয়েতনামের বন্দরগুলিতে ভীড় জমাতে আরম্ভ করে। ১৮১৭ সাল থেকে ১৮২০ সাল পর্যন্ত ফরাসি-কনসাল (Chaignean) এখানে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক কাজকর্ম পরিচালনা করেছিলেন।

৬৮.৭.৪ ইন্দোচীনের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি

১৮২০ সালে গিয়া ল্যাং-এর মৃত্যু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন নিয়ে আসে। নতুন রাজ্য মিং-মাং তাঁর রাজ্যে কনফুসিও ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও ক্যাথলিক ধর্মকে সম্মান প্রদর্শন করলেও কনফুসিওবাদ ও চীনা সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন। কনফুসিও ধারায় রাষ্ট্র, সমাজ, সংস্কৃতি, প্রশাসন সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তন শুরু হল। সনাতনপন্থী হবার ফলেই তিনি বিদেশীদের খুব একটা বিশ্বাস করতেন না। ব্রিটিশ, ফরাসি ও আমেরিকান কেউই তাঁর কাছে বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন না। ইউরোপীয়রা তাঁর চোখে ছিলেন বর্বর।

ইউরোপীয় বণিকদের রাজনৈতিক চাপ তাঁকে অনেকখানি বিরোধী মনোভাবাপন্ন করে তুলেচিল। ১৮২৫ সালে তিনি রাজ্যে সমস্ত মিশনারীদের প্রবেশ বন্ধ করে দিলেন। এর প্রায় দশ বছরের মধ্যে রাজকীয় আদেশে সমস্ত প্রকার খ্রিস্টীয় প্রতিষ্ঠান ধবংস করে ফেলার এবং খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসীদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। বহু যাজক, মিশনারী প্রাণ হারান এর ফলে। ১৮৩৬ সালে ইউরোপীয় বাণিজ্য জাহাজের প্রবেশের পথ হিসাবে হিউ, হ্যানয়

বন্দরগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয়। অবশ্য এখানে অতিরিক্ত কঠোরতর কারণ হিসারে ১৮২৪-২৫ সালে ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধ ও দক্ষিণ বর্মার উপর ব্রিটিশ অধিকারকে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করে বলা হয় ইউরোপীয় বণিকদের এই কর্মকাণ্ড ইন্দোচীনের রাজতন্ত্রে সন্দেহের সৃষ্টি করেছিল।

৬৮.৭.৫ ফরাসি আধিপত্য প্রসারণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা

রাজতন্ত্রের কঠোরতা সত্ত্বেও ফরাসি মিশনারীরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ভিয়েতনাম, কোচিন-চীনে প্রবেশ করতে থাকে। এই সময়ে বহু ফরাসি মিশনারীরা বন্দী অবস্থায় মৃত্যুর দিন গুণছিলেন ১৮৪৬ সালে ফরাসিদের দাবি তুরেন বন্দর দা নাঙ্গ (Da Nang) অবরোধ করে। প্রায় দুসপ্তাহ ধরে গোলাবর্ষণ চলতে থাকে ফরাসিদের দাবি ছিল ফরাসি ধর্মযাজক লেফেভের (lefevre) সহ আরো পাঁচজন মিশনারীর মুক্তি। এঁরা প্রাণদণ্ডের আদেশে ভিয়েতনামী কারাগারে বন্দী ছিলেন। ফরাসি রণকৌশল ও উন্নত অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক বাহিনীর কাছে রাজতন্ত্র হার মানতে বাধ্য হয় এবং ফরাসি মিশনারীরা মুক্তি পান।

৬৮.৮ ইন্দোচীন রাজতন্ত্রের বিরোধিতা

ইতিমধ্যে ১৮৪১ সালে মিং-মাং' এর মৃত্যু হয়েছে তাঁর পুত্র থিউ-ট্রি (Thieu-Tri) রাজা হয়েছেন। থিউ-ট্রি ছিলেন পিতার থেকেও বেশি ইউরোপীয় বিরোধী মনোভাবাপন্ন। ইউরোপীয় রাজনীতিতেও এসেছিল পরিবর্তন। লুই নেপোলিয়ান মেক্সিকোর ব্যর্থতা কোচিন-চীনে পূরণ করে নিতে চাইলেন। ফরাসি ঔপনিবেশিকতাবাদ এই সময় উগ্ররূপ নিল। ১৮৪৬ সালে তুরেন (দা-নাঙ্গ) ফরাসি অধিকৃত হয়েছিল। যুদ্ধকালীন নৌঘাঁটি এবং শান্তির সময়ে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে দা-নাঙ্গ দ্বিবিধ উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারবে। এই চিন্তাভাবনা করে ফ্রান্সেও এইসময় নৌ-মন্ত্রক, বিদেশী দপ্তর প্রভৃতি স্থাপন করে জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি করার প্রয়াস দেখা যায়।

১৮৪৮ সালে থিউ-ট্রির স্থলাভিষিক্ত হলেন পুত্র তু-ডাক (Tu-Duc) তাঁর সময়ে ইউরোপীয় বিরোধিতা সন্দেহ মনোভাব, মিশনারী বন্দী এবং হত্যা ব্যাপকভাবে হতে থাকে। রাজদ্রোহিতার অপরাধে অনেক ফরাসি মিশনারী কারারুদ্ধ হলে পুনরায় তুরেনে ফরাসি নৌ-অবরোধ শুরু হয়। এই সময় ১৮৫৬ সালে শুধু ফরাসি নয় কিছু স্পেনীয় ধর্মযাজক প্রাণদণ্ডের আদেশ পেয়েছিলেন।

৬৮.৮.১ ইন্দোচীনের যুদ্ধ ও কোচিন চীনের অধিকাব

ইউরোপে ১৮৫৬ সালে শুরু হয়েছিল ক্রিমিয়া যুদ্ধ। আন্তজাতিক পরিস্থিতি ব্রিটিশ ও ফ্রান্সকে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ করেছিল তাই প্রাচ্যে ভিয়েতনামের রাজতন্ত্রের কাছে ব্রিটিশ, ফ্রান্স ও ফিলিপিনের একত্র দাবি উপস্থিত

করে বলা হয় মিশনারীদের মুক্তি, খ্রিস্টধর্মের স্বাধীনতা দেওয়া, এবং হিউ অঞ্চলে ফরাসি কনসাল রাখতে রাজতন্ত্র স্বীকৃতি প্রদান করুন। এটা অবধারিতবাবে অনুপ্রবেশেরই একটা প্রয়াস ছিল। তবে রাজতন্ত্র কর্তৃক এই দাবি অস্বীকৃত হলে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে ১৮৫৮ সালে যুগ্মভাবে স্পেনীয় ও ফরাসি অভিযান শুরু হয়। তিনবছর যুদ্ধ চলার পর ১৮৬২ সালে রাজা তু-ডাক সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। চুক্তি অনুযায়ী কোচিন চীন, সায়গন ফ্রান্সকে ছেড়ে দিলেন, রাষ্ট্রের সর্বত্র ফরাসি অনুপ্রবেশ স্বীকৃত হল, আন্নামে ফরাসি প্রটেকটরেট প্রতিষ্ঠা হল, আন্নামের তিনটি বন্দর ফরাসি বাণিজ্যের জন্য খুলে দেওয়া হল। রাজা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জন্য ৪ মিলিয়ন অর্থ দশটি কিস্তিতে দেবেন বলে স্বীকার করেন। এছাড়া খ্রিস্টধর্ম ভিয়েতনামে স্বীকৃত হয় এবং ফরাসিরা মেকং নদীতে নৌ পরিচালনার অধিকার লাভ করে। ১৮৬৭ সালের মধ্যে ফরাসিরা কোচিন-চীনের বাকি অংশ ও মেকং নদীর অববাহিকা অঞ্চলে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

৬৮.৮.২ কম্বোডিয়া দখল

কোচিন-চীনের পর ফরাসি আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় ক্ষেত্র ছিল কম্বোডিয়া। দুটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের (থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম) মধ্যবর্তী অঞ্চলে কম্বোডিয়া ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছিল। ১৮০২ সাল থেকে স্বরাষ্ট্র বিরোধ এড়ানোর জন্য কম্বোডিয়া দুটি রাষ্ট্রেই নজরানা পাঠাতে থাকে কিন্তু তার রাজনৈতিক তথা রাজতান্ত্রিক সঙ্কটের কারণে দুটি রাষ্ট্রই কম্বোডিয়ার প্রতি মনোযোগী হয়। রাজতন্ত্রের উত্তরাধিকারী দুটি পক্ষের মধ্যে একে অন্য পক্ষের বিরোধী দলে দুটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের সমাবেশ হয়। কম্বোডিয়ার ভাবী রাজা ও তাঁর ভ্রাতার পক্ষে একদিকে থাইরাজ দ্বিতীয় রাম এবং অন্যদিকে ভিয়েতনামের রাজা মিন-মিং সমর্থন দিচ্ছিলেন। যেহেতু কম্বোডিয়া ছিল থাইল্যান্ডের ভ্যাসাল অঞ্চল সেই কারণে দ্বিতীয় রাম রক্তপাতের পরিবর্তে কিছু অঞ্চল কম্বোডিয়ার কাছ থেকে নিয়ে নেন। এই অবস্থা চলতে থাকে ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত। ১৮৩৪ সালে কম্বোডিয়ার রাজার মৃত্যুতে ভিয়েতনাম এই অঞ্চলকে কার্যত নিজ রাষ্ট্রভুক্ত করে নেয়। ১৮৪১ থেকে ১৮৫১ সাল পর্যন্ত সময় ছিল কম্বোডিয়ার স্বাধীনতা দুটি রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।

১৮৫২ সালে কম্বোডিয়ার রাজা ফরাসি সম্রাট লুই নেপোলিয়নকে পত্র মারফত তাঁর রাজ্যে হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। ফ্রান্সও ভিয়েতনামের কোচিন-চীনের পর কম্বোডিয়াতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী ছিল। ১৮৬৩ সালে একটি চুক্তির দ্বারা এখানে ফরাসি প্রোটেকটরেট স্থাপিত হয়।

১৮৬৮ সালে উৎসাহী ফরাসী বণিকরা রেডরিভার নদীপথে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের রাস্তা আবিষ্কার করে ফেলে। টংকিন থেকে রেডরিভার হয়ে দক্ষিণ চীনে সিল্ক, চা, বস্ত্র প্রভৃতির ব্যবসা করার জন্য ফরাসিরা উদ্যোগী হতে থাকে। ইতিপূর্বে এখানকার বাণিজ্যপথগুলিতে বিশেষ করে টংকিন অঞ্চলের চীন-ভিয়েতনাম সীমান্ত এলাকায় কিছু চীনা উপজাতির (Yellow flag and Black flag) দুধর্ষ বাহিনী রেডরিভার নদীপথের অঞ্চলে লুঠতরাজ চালাত। অরাজকতা, লুঠপাট, অস্থিরতা এখানকার বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। উৎসাহী ফরাসী বণিকগোষ্ঠী এখানকার অঞ্চল থেকে

বেআইনীভাবে লবণ খনিজদ্রব্য ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতির বাণিজ্যে আগ্রহী ছিলেন। ভিয়েতনামী বণিকরা এখানে ফরাসি আধিপত্য স্থাপনের বিরোধিতা শুরু করে। কিন্তু ফরাসিরা কৌশলে এখানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। রেডরিভার নদীপথে বিদেশী বাণিজ্য স্বীকৃত হয়। ফরাসিদের জন্য টংকিনের তিনটি বন্দর উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। ১৮৮৩-৮৪ সালে ফরাসিরা চাপ সৃষ্টি করে হ্যানয় এবং হিউ অঞ্চলে ফরাসি রেসিডেন্ট রাখার অনুমতি আদায় করে নেয়। আন্নামের রাজতন্ত্রের পক্ষ থেকে চীন সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করা হয় এবং ১৮৮৫ সালে ফ্রান্সের সঙ্গে চীনের সংঘর্ষ শুরু হয়। দুর্বল প্রতিপক্ষ চীন খুব সহজেই ফ্রান্সের কাছে পরাজিত হয়ে আন্নাম, টংকিনে ফরাসি অধিকার স্বীকার করে এবং দক্ষিণ চীনে ফরাসী বণিকদের বাণিজ্যিক অধিকার দান করে। এছাড়া ফরাসিরা রেডরিভার উপত্যকায় হ্যানয় থেকে কুনমিং (Kunming) পর্যন্ত রেলপথ স্থাপনের অধিকার পায়।

১৮৮৫ সালের এই চুক্তিতে প্রায় কয়েক শতাব্দী ব্যাপী চীনের সঙ্গে ভিয়েতনামের যে অধীনতামূলক সম্পর্ক ছিল তা পরিবর্তিত হয়ে যায়। এরপর থেকে সমগ্র ভিয়েতনামে একচ্ছত্র ফরাসি অধিকার স্থাপিত হয়।

৬৮.৮.৩ লাওস অধিকার

ভিয়েতনামের একমাত্র স্বাধীন অবশিষ্ট অঞ্চলটি ছিল লাওস। এই অঞ্চলের উপর ফরাসিদের সজাগ দৃষ্টি অনেকদিন ধরে বিদ্যমান ছিল। মেকং নদীর উপত্যকা অঞ্চলেই ঘন সন্নিবিষ্ট ছিল লাওসবাসীরা। লাওসের অধিবাসীদের কাছে ভিয়েতনামের আধিপত্য পছন্দই ছিল না। পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী রাষ্ট্র থাইল্যান্ডও লাওসের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন ছিলেন। বস্তুতপক্ষে চতুর্দশ থেকে ষোড়শ পর্যন্ত লাওস ছিল ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের যুদ্ধ করার মুক্ত অঞ্চল। ঊনবিংশ শতকে চক্রী রাজতন্ত্রের সময়কালে লাওসের উপর শ্যামদেশ বা থাইল্যান্ডের আধিপত্য স্থাপিত হলে, ভিয়েতনাম তা মানতে অস্বীকার করে ফলে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই থাই-ভিয়েতনামী সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হয় লাওসের রাজধানী লান জ্যাং (Lan Xang) এবং তা তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে যায়—ভিয়েনতিয়ান, লুয়াং প্রবাং এবং চম্পাসাক। শেষোক্ত অঞ্চল দুটিকে ১৮৩৬ সালে থাইরাজ তৃতীয় রাম শ্যামদেশভুক্ত করেন। ফলে লাওসবাসীরা প্রায় থাইল্যান্ডেরই অধীন হয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে ফরাসি অনুপ্রবেশ শুরু হয়ে গেছে। ভিয়েতনামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ফরাসি প্রটেক্টরেট। এই বিষয়টি চক্রীরাজ চুলালংকর্ণ খুব সুনজরে দেখেন নি এবং যাতে লাওসে থাই অধিকার আরো সুনির্দিষ্ট হয় তাই তিনি লুয়াং প্রবাং—এর উপর পূর্ব অঞ্চল হয়ে ব্ল্যাক রিভার উপত্যকা পর্যন্ত ১৮৮৫ সালের মধ্যে দখল করে নেন। ফরাসিরা এ ব্যাপারে চক্রী রাজের সঙ্গে ব্রিটিশ সমর্থন আশংকা করে। কারণ ইঙ্গো-ফরাসি দ্বন্দ্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং সমগ্র ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশ অধিকার সম্পূর্ণ হয়েছিল।

৬৮.৮.৪ থাই-ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ইন্দোচীনে ফরাসি অধিকার স্থাপন

ইতিমধ্যে থাইরাজতন্ত্রের নির্দেশে ফরাসি গভর্ণরকে ব্যাংককে বন্দী করে রাখা হয়। কারণ লুয়াং অঞ্চলে ফরাসি প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং চক্রীরাজ তা নিশ্চিহ্ন করতে চাইছিলেন। এরপর ফরাসিরা লুয়াং-এ থাই সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয় পরিবর্তে এখানে একটি Vicc-Consulate স্থাপনের অধিকার পায়। ফরাসি

কনসাল লাওসের জনতাকে বোঝাতে থাকেন ফরাসি প্রটেকটরেটের আওতাভুক্ত হলে তারা কিভাবে পশ্চিমী শক্তি দ্বারা উপকৃত হবে। ফলে জনগণের থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ ছিল তা পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে এবং ফরাসি কনসাল ১৮৯২ সালে রেসিডেন্ট রূপে ব্যাংককে উপস্থিত হলেন। ফরাসি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল কি করে লাওসের উপর থেকে থাই নিয়ন্ত্রণ দূরীভূত করা যায় এবং ফরাসি কনসালও সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। ১৮৯৩ সালে দুজন ফরাসি প্রতিনিধিকে থাইল্যান্ড থেকে বিতাড়িত করা হলে ফরাসি সরকার পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয় এবং ব্যাংককে রেসিডেন্ট (Auguste Pavie) মেকং নদীর বামপ্রান্ত সম্পূর্ণভাবে ফরাসীদের পক্ষে দাবী করে সেখান থেকে থাই সৈন্য অপসারণে থাই সরকারকে বাধ্য করেন। ১৮৯৩ সালে ফরাসি ও থাই সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে মেকং নদীর বামপ্রান্ত ফরাসি অধিকার স্বীকৃত হয়।

ফ্রান্স ঔপনিবেশিকতাদের চরম রূপ এখানে প্রদর্শন করেছিল। ফ্রান্স ভিয়েতনামের রাজনীতিকে নিজপক্ষে নিয়ে এসে প্রয়োজনীয় অঞ্চলগুলিকে দখল করে ১৮৯৯ সালের মধ্যে লাওসের ওপর সম্পূর্ণ ফরাসি অধিকার স্থাপিত হয়। ১৮৯৯ সালের ফরাসি থাই চুক্তি ব্রিটিশদের অনুমোদনও লাভ করেছিল।

৬৮.৯ সারাংশ

এই এককটিতে আপনাদের কাছে আলোচিত হয়েছে ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে স্পেনীয় উপনিবেশিক বিস্তার ও ইন্দোচীনে ফরাসি ঔপনিবেশিক অধিকার স্থাপনের প্রয়াস। দুটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ দ্বীপ অঞ্চল ফিলিপিন্স ও মূল ভূখণ্ড অঞ্চল ইন্দোচীন যথাক্রমে স্পেনীয় ও ফরাসিরা খুব দৃঢ়তার ভিত্তিতে নিজ একাধিপত্য বজায় রেখেছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনীয়রা যখন ফিলিপিন্স দ্বীপে আসে তখন এখানে কোন শক্তিশালী রাজতন্ত্র ছিল না। মানুষ ছিলেন গ্রামবাসী যে গ্রামকে বলা হত বারাঙ্গে এবং বারাঙ্গে অধিপতি দাতু নামে পরিচিত হতেন। এই শক্তিপূর্ণ গ্রামীণ জীবনে স্পেনীয়রা পদার্পণ করে প্রায় সাড়ে তিনশ বছর ঔপনিবেশিক শাসন পরিচালনা করলেন যে শাসনের প্রকৃতি ছিল কেন্দ্রীভূত স্বেচ্ছাচার। এই নিষ্ঠুর শাসনের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে জন-অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে বিদ্রোহ রূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। জোস রিজাল, আগুইনালডো প্রমুখ ছিলেন বিখ্যাত বিদ্রোহী নেতা। এরপর ১৮৯৮ সালে আমেরিকার কাছে স্পেন পরাজিত হলে, আমেরিকার সমর্থনে ফিলিপিনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। কয়েক শতকের দাসত্বের পর ফিলিপিনবাসী গণতন্ত্রের স্বাদ পেল।

অন্যদিকে ফরাসিরা ইন্দোচীন বা ভিয়েতনামকে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য একটা 'Spring Board' হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ইন্দোচীনের ভৌগোলিক অবস্থান চীনের সঙ্গে প্রায় যুক্ত হবার ফলে ফরাসিদের মধ্যে একটি ধারণা হয়েছিল যে খুব সহজেই এই সম্পর্ক স্থাপন করা যেতে পারে। প্রথমদিকে ইন্দোচীনের রাজতন্ত্র ফরাসিদের প্রতি মিত্রতাভাবাপন্ন হলেও পরবর্তীকালে রাজতন্ত্র বিদেশীদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব

পোষণ করতে থাকে কারণ তারা চীন বর্মার উপর বিদেশী অনুপ্রবেশের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত ছিল। তবুও উন্নত রণকৌশল, প্রযুক্তির অভাবে ভিয়েতনাম নতি স্বীকারে বাধ্য হলেও একেবারেই সমগ্র ইন্দোচীনের উপর ফরাসি আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পায়। তবে উৎসাহী ফরাসী বণিকরা নিরন্তর প্রয়াস চালাতে থাকে কিভাবে সমগ্র ইন্দোচীনে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের পথ উন্মুক্ত করা যায়। এই প্রয়াসে শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স জয়ী হয়। আবিষ্কৃত হয় নতুন বণিজ্যপথ এবং কূটনৈতিক কৌশলে সমগ্র ইন্দোচীনে ফরাসি ঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণ হয়।

৬৮.১০ অনুশীলনী

ক। বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। ফিলিপিন দ্বীপের নামকরণ কিভাবে হয়?
২। এখানকার বাণিজ্যপণ্যগুলি কি?
৩। মুর কাদের বলা হত?
৪। দাতু কাদের বলা হত?
৫। ফিলিপিনের স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নাম কি?
৬। ফিলিপিনের স্থানীয় ভাষা কি?
৭। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় কবে স্থাপিত হয়?
৮। ইন্দোচীন রাষ্ট্র বলতে কি বোঝেন?
৯। এখানে প্রথম ঘাঁটি কে কোথায় স্থাপন করেন?
১০। 'মান্ডারিন' কি?

খ। সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

১। কীরূপ আন্তজার্তিক পরিস্থিতিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে স্পেনীয় আধিপত্যের সূচনা হয়?
২। ম্যানিলা কী কারণে মুখ্য বাণিজকেন্দ্রে পরিণত হয়?
৩। টংকিন ও আন্নামে ফরাসি অধিকার কীভাবে স্থাপিত হয় তার একটি চিত্র প্রস্তুত করুন।
৪। ইন্দোচীনে ফরাসি আধিপত্য স্থাপনের মূলে কারণগুলি বর্ণনা করুন।

গ। দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

১। ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে স্পেনীয় বাণিজ্যের ও প্রশাসনিক সংহতিকরণের একটি চিত্র প্রস্তুত করুন।
২। ইন্দোচীনের রাজতন্ত্রের সঙ্গে ফরাসি সম্পর্কের ধারাবাহিক বিবরণ দিন।
৩। ইন্দোচীনে ফরাসি মিশনারীর কার্যকলাপের প্রকৃতি কীরূপ ছিল?
৪। স্পেনীয় মিশনারীরা ফিলিপিন্সে কি কি কাজ করেছিলেন তার ফল কী হয়েছিল?
৫। ফিলিপিনে স্পেনীয় প্রশাসনের ফলাফল কী হয়েছিল?

৬৮.১১ গ্রন্থপঞ্জী

1. History and Culture of South-East Asia by Kailash. K. Beri, Starling Publishers 1994.
2. South-East Asia—A History by Lea E. Williams, O.U.P. 1976.
3. Modern Asia by M. N. Venkata Ramanappa, Vikas Publishing, 1979.
4. J.F. Cady—South-East Asia—Its Historical development Mcgrow Hill 1979.
5. South-East Asia—An Introductory History by Milton Osborne, George Allen and Unwin 1979.
6. The History of South-East, South and East Asia—Essays and Documents ed. by Khoo kay Kim, O.U.P. 1977.
7. Thailand in the Nineteenth Century by Hong Lysa Institute of South Asian Studies 1994.
8. The making of South-East Asia—Translated by H.M. Wright (By G. CEEDES) Routledge and Kegan Paul 1970.
9. D.R. Sardesai—South-East Asia—past and Present, Vikas Publishing 198.
10. J.F. Cady—A History of Modern Burma, Cornele University Press.

একক ৬৯ ❑ ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ইন্দোনেশিয়ার সমাজ ও অর্থনীতি

গঠন

- ৬৯.০ উদ্দেশ্য
- ৬৯.১ প্রস্তাবনা
- ৬৯.২ ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা
    - ৬৯.২.১ ইন্দোনেশিয়ার অর্থব্যবস্থায় ডাচ-পূর্ব ভারত কোম্পানির ভূমিকা
    - ৬৯.২.২ ডাচ কোম্পানির বৈশিষ্ট্য
- ৬৯.৩ কালচার সিস্টেম
    - ৬৯.৩.১ কালচার সিস্টেমের ফলাফল
- ৬৯.৪ ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক বিবর্তনে লিবারেল দলের ভূমিকা
    - ৬৯.৪.১ ফলশ্রুতি
    - ৬৯.৪.২ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে ইন্দোনেশিয়ার পরিবর্তিত অর্থনীতি
- ৬৯.৫ ইন্দোনেশিয়ার সামাজিক চিত্র
    - ৬৯.৫.১ দেশা ব্যবস্থা
    - ৬৯.৫.২ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সামাজিক পরিবর্তন
- ৬৯.৬ সারাংশ
- ৬৯.৭ অনুশীলনী
- ৬৯.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৬৯.০ উদ্দেশ্য

সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপদ্বীপ অঞ্চল পশ্চিমী শাসনের আওতায় আসার পর সেখানকার অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থায় কি প্রকার পরিবর্তন এল তা আলোচনা করাই এই এককটির উদ্দেশ্য। এখানে অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়ার ঔপনিবেশিক শাসনের যে চিহ্নগুলি আপনারা খুঁজে পাবেন তা হল ঃ

- গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে রূপান্তর।
- ডাচ বণিকদের শোষণ ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ।
- সমাজ জীবনে পাশ্চাত্য প্রভাব।
- নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব।

৬৯.১ প্রস্তাবনা

ঔপনিবেশিক শাসনের ইতিহাস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শুরু হয় ১৫১১ সালে যখন পর্তুগীজরা মালাক্কায় তাদের অধিকার কায়েম করে। এই ঘটনার প্রায় এক শতক বছর পর থেকে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে তাদের ঔপনিবেশ স্থাপন করে। মুলত টিন, রবার, মশলা, কফি, কাঠ, চিনি ও অন্যান্য বাণিজ্য পণ্য সংগ্রহ ও ব্যবসার জন্য তারা ইন্দোনেশিয়া, মালয়, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার) ইত্যাদি অঞ্চলে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। ঔপনিবেশিক শাসনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান বিশেষভাবে আলোচনা করা হল।

৬৯.২ ইন্দোনেশিয়া ঃ অর্থনৈতিক অবস্থা

ষোড়শ শতকের শেষের দিকে পর্তুগীজ শক্তির ক্ষয়িষ্ণুতার সুযোগে অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পর্তুগীজদের মশলা বাণিজ্য একচেটিয়া অধিকারে আঘাত হানে। এক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয় মূলত ডাচ ওলন্দাজরা। ১৫৯৪ খ্রিঃ স্পেনের শাসক দ্বিতীয় ফিলিপ লিসবনে ওলন্দাজদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়। সুতরাং পূর্বাঞ্চলের পণ্য নিজেরাই সংগ্রহ কার জন্য তারা এই অঞ্চলে আসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

৬৯.২.১ ইন্দোনেশিয়ায় অর্থব্যবস্থায় ডাচ-পূর্ব ভারত কোম্পানির ভূমিকা

ইন্দোনেশিয়ার ওলন্দাজদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মূল কেন্দ্র ছিল জাভা। পশ্চিমে পারস্য, ভারত, সিংহল ও পূর্বে মলুক্কাস, চীন ও জাপানের বাণিজ্য চালান হত জাভাকে কেন্দ্র করে। ওলন্দাজরা উত্তর ইউরোপে প্রাচ্যের মশলা ও গোলমরিচ বিক্রির পরিকল্পনা নেয়। ১৬০২ খ্রিঃ ওলন্দাজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। একুশ বছর মেয়াদী এক সনদ জারী করে বলা হয় বাণিজ্য, জাহাজ চালনা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকবে এই কোম্পানির হাতে। ৭৬টি কোম্পানি সংযুক্ত করে এই ডচ্ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়। এই কোম্পানি গঠনের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল। স্পেনের বিরুদ্ধে ওলন্দাজ স্বার্থে প্রাচ্যে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য উপযুক্ত রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয় এই কোম্পানীর হাতে। নিয়োগ করা হয় ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে পিটার বোথকে প্রথম গভর্ণর জেনারেল হিসাবে এবং অবসান হয় ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন বাণিজ্যিক উদ্যোগের।

কোম্পানির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল থেকে গভর্ণর Coen-এর নেতৃত্বে জোর করে উৎপন্ন পণ্য আদায় করার ব্যবস্থা করা হয়। নতুন ফসল হিসাবে কফির চাষ শুরু হ'ল। ওলন্দাজ বাণিজ্য সংগঠন পর্তুগীজ বাণিজ্য সংগঠনের থেকে অনেক বেশি সুসংগঠিত ছিল। জাভা ও মলুক্কার বাইরে পুরাতন বাণিজ কাঠামোর মধ্যেই প্রতিযোগী হিসাবে ওলন্দাজ শক্তি টিকে থাকল।

মালাই, চীনা, ভারতীয়, আরব এবং এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের বণিকরা আগের মতই বাণিজ্য চালানোর সুযোগ পায়। বাটাভিয়ায় চীনা বণিকরা খুব সক্রিয় ছিল। গভর্ণর জেনারেল কোন (Coen) প্রায় সব খুচরো বাণিজ্য এবং উপকূল বাণিজ্য এদের হাতে ছেড়ে দেন। চীনাদের বাণিজ্য পণ্য ছিল চাল, চিনি, দেশীয় আরক ইত্যাদি। তাছাড়া জাহাজের শুল্ক আদায়, বাজার কর, নুন উৎপাদন বাবদ কর ইত্যাদি আদায়ের দায়িত্ব পালন করত চীনারা।

চীনারা ছাড়া ছিল অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠী। ওলন্দাজরা প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় শক্তিবর্গকে একেবারে উচ্ছেদ করেনি। তবে স্থানীয় অধিবাসীরা ওলন্দাজদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হয়। আঞ্চলিক বাণিজ্যে মালাই যবদ্বীপীয়দের আধিপত্য প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। জাভার অধিবাসীরা অনেক ক্ষেত্রে ওলন্দাজদের ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়। অবশ্য Ven Leur (ভ্যান ল্যের) বলেছেন ওলন্দাজ কোম্পানির বাণিজ্যের ফলে এশীয় বাণিজ্যে নতুন কিছু রদবদল ঘটেনি। তবে জে. ডি. লেগ (J.D. Legge) বলেছেন ওলন্দাজ কোম্পানির আকার, জটিলতা, প্রতিপত্তি ও একচেটিয়া কারবার এই অঞ্চলে নতুন ছিল। তাছাড়া ওলন্দাজ মূলধন বিনিয়োগে বড় বড় খামার গড়ে উঠেছিল। তিনি মনে করেন উনিশ শতকে ইন্দোনেশিয়ায় নতুন অর্থনীতি, রাজনৈতিক সংহতি ও নতুন সমাজ রূপান্তর ঘটেছিল।

৬৯.২.২ ডাচ কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য

যাই হোক, ওলন্দাজদের অর্থনৈতিক স্বার্থ যখনই বিঘ্নিত হয়েছিল তখন তারা প্রায় নৃশংসভাবে তা রক্ষা করেছেন। মশলা বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার রক্ষার জন্য তারা বদ্ধপরিকর ছিল। যেখানে যখন মশলা অতি উৎপাদনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল সেখানেই নির্দ্বিধায় গাছ নষ্ট করা হত। কোন অঞ্চল কি উৎপাদন করবে ওলন্দাজরা সেটাও ঠিক করে দিত।

ওলন্দাজরা ইউরোপের অন্যতম প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ বণিকগোষ্ঠী ছিল। বাণিজ্যের ব্যাপারে তারা ছিল দক্ষ ও পেশাদার। তাদের নৌবিদ্যা, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ইত্যাদি ছিল অত্যন্ত উন্নত। এদের মূলধন ছিল প্রচুর এবং বিভিন্ন বিষয়ে হল্যান্ড এদের নির্দেশ দিত।

ওলন্দাজদের এশিয় বাণিজ্য ছিল বহুমুখী ও সুপরিকল্পিত। ওষুধ, সুগন্ধী কাঠ, সুগন্ধ, দামী রত্ন, গন্ডারের খড়্গ ইত্যাদি পণ্যের গুরুত্ব এসময় কমে যায়। মশলা, গোলমরিচ, বস্ত্র চীনে পাঠিয়ে তার বদলে ওলন্দাজরা চীনেমাটির জিনিস সংগ্রহ করত। চীনেমাটির জিনিসের চাহিদা ছিল জাপানে। পরিবর্তে জাপান থেকে সংগ্রহ করা হত সোনা, রুপা, তামা। এই পণ্যগুলির চাহিদা ছিল ভারতে। ভারত থেকে ওলন্দাজরা সংগ্রহ করত কাপড়।

ওলন্দাজরা জাভায় চিনি উৎপাদনের অত্যন্ত গুরুত্ব দিল। চিনি উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল এশিয় বাজার এবং কফির চাষ শুরু করা হল ইউরোপীয় বাজারকে মাথায় রেখে। জাভায় বিভিন্ন শ্রেণীর কাছ থেকে কর হিসাবে কপি সংগ্রহ করা শুরু হ'ল। কফির উৎপাদন ও বন্টন নিয়ন্ত্রণের জন্য ইউরোপীয় কর্মচারী নিয়োগ করা হ'ল। ১৭০৬ খ্রিঃ পর জাভায় কফি চাষ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। কফির চারা গ্রামের মোড়লদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হ'ল। কফি চাষে উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রতি ১২২ পাউন্ড শুকনো কফি বীজের জন্য বাড়তি ৫০ গিল্ডার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ১৭২৫ খ্রিঃ নাগাদ কপির উৎপাদন দ্বিগুণ হলে স্বাভাবিকভাবেই কফির দাম পড়ে যায়। স্থানীয় শাসকগোষ্ঠী নিজেদের আর্থিক স্বাচ্ছল্য বজায় রাখার জন্য কফি চাষে বাধ্যতামূলক শ্রম ব্যবহার শুরু করল। গ্রামবাসীর স্বাধীন অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সুযোগ প্রায় থাকল না বলা চলে। ১৭২৬-১৭২৮ খ্রিঃ মধ্যে ইউরোপে ওলন্দাজদের কফি বিক্রির পরিমাণ প্রায় তিনগুণ হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে যে কফি ও চিনি উৎপাদন কিন্তু মধ্য ও পূর্বাঞ্চলের ধান উৎপাদনভিত্তিক সাবেকী অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে দেয়নি।

ওলন্দাজদের কাছে অপর গুরুত্বপূর্ণ পণ্য ছিল গোলমরিচ। ইউরোপ, ভারত, চীন ও পারস্যে গোলমরিচ সরবরাহ করা হত। গোলমরিচ সংগ্রহ করা হত জাভা, নিম্ন সুমাত্রা ও মালয়ের পূর্ব উপকূল থেকে। অর্থনৈতিক

কারণে ওলন্দাজরা বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলেও প্রবেশ করতে থাকে—এর দরুন শুধুমাত্র দ্বীপময় অঞ্চলে নয় অন্যান্য স্থানেও নতুন অর্থনীতির প্রভাব লক্ষিত হয়।

ইতিমধ্যে ১৭৮১ খ্রিঃ ওলন্দাজরা ব্রিটিশদের হাতে পরাজিত হ'ল আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত এক যুদ্ধে। এরপর ব্রিটিশ বাণিজ্য জাহাজ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ১৮১১ খ্রিঃ জাভা ইংরেজদের অধীনে চলে যায়। ১৮১১ খ্রিঃ ১৮১৬ খ্রিঃ এই সময়কালে জাভা ইংরেজদের অধীনে ছিল।

ইংরেজ শাসনকালে টি.এস. র‍্যাফেলস (T.S. Raffles) ছিলেন জাভার গভর্ণর। বলা হল শাসক হল প্রকৃত ভূস্বামী। তাই জমির উৎপাদিকা শক্তি অনুযায়ী খাজনা আদায়ের অধিকার তার আছে। ১৮১৬ খ্রিঃ ইন্দোনেশিয়া পুনরায় ওলন্দাজ শাসনাধীনে চলে এলে এই খাজনা আদায়ের অধিকার তারা বজায় রাখে। জমি জরিপের ব্যবস্থা বা মূল্য নির্ধারণের সঠিক মাপকাঠি কোন কিছুই ছিল না। খাজনা আদায়ের পরিমাণ ছিল যথেষ্ট নিপীড়নমূলক।

৬৯.৩ কালচার সিস্টেম

ওলন্দাজদের আর্থিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য গভর্ণর ভ্যান ডেন বস (Van Den Bosch) ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে কালটিভেশন সিস্টেম বা কালচার সিস্টেম চালু করলেন। ইউরোপীয় বাজারে চাহিদা আছে এমন ফসল চাষ করার নির্দেশ দেওয়া হল। তবে এর জন্য কৃষক বা জমি মালিককে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। প্রয়োজনীয় শস্য উৎপাদনের জন্য দেশা'র (গ্রামের) $^{১}/_{৪}$ বা $^{১}/_{৫}$ আবাদী জমি আলাদা করে রাখার নির্দেশ দেওয়া হ'ল। এই আলাদা করে রাখা জমি কৃষিকর মুক্ত করা হয়। উৎপন্ন ফসলের দাম যদি মকুব করা ভূমিকর থেকে বেশি হয় তবে উভয়ের পার্থক্যের আর্থিক পরিমাণ জনগণকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হ'ল। সরকারের গাফিলতি বা শ্রমের অভাবে ফসল নষ্ট হলে সরকার সেই দায় বহন করতে সম্মত হ'ল। উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশীয় শ্রমিকদের ব্যবহার করা হলেও ফসল কাটা, পরিবহন এসব ছিল ইউরোপীয় সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্বে। রপ্তানি বাণিজ্যও ছিল সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণাধীনে। এসময় নীল, চিনি, কফি ইত্যাদি পণ্য হিসাবে প্রচণ্ড গুরুত্ব পায়।

প্রত্যেক রেসিডেন্সী মাথাপিছু দুই গিল্ডার অর্থের রপ্তানি পণ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকল। বাজারদরের থেকে কম দামে সমস্ত কফি ওলন্দাজদের কাছে বিক্রি করা বাধ্যতামূলক ছিল। চিনি কলগুলির কাছাকাছি জমিগুলিতে আখচাষ বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল।

কৃষকের অবস্থা এই নতুন পরিস্থিতিতে আরো শোচনীয় হয়ে উঠল। কালটিভেশন সিস্টেম চালু করার পর বলা হল কৃষকের ধান উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ শ্রম দেওয়ার কথা বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনের সে সেটুকু শ্রমই দেবে। স্থানীয় শাসক, জমিদার এদের অত্যাচার থেকে কৃষককে রক্ষা করার কথাও বলা হ'ল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃষকের দুর্দশা বিন্দুমাত্র কমেনি। কৃষকদের বেগার শ্রমের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়। পুরোনো শাসন-কাঠামোর খাজনা আদায় ও তার জন্য আনুষঙ্গিক অত্যাচার, অনাচার প্রায় সবই বজায় ছিল। চড়া হারে বাজার শুল্ক, লবণ শুল্ক দিয়ে কৃষক প্রায় সেই সময় নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল।

৬৯.৩.১ কালচার সিস্টেমের ফলাফল

এই কালটিভেশন সিস্টেম থেকে লাভ হল প্রচুর। নেদারল্যান্ডের রেলপথে এই অর্থ ব্যবহার করা হল। এই অর্থ দিয়ে নেদারল্যান্ড সরকার তার ঋণশোধ করেছে, বেলজিয়ামের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করেছে। তবে পশ্চিমী জগতে তৎকালীন উদারনৈতিক মতবাদ কালচার সিস্টেমের অনুকূল ছিল না।

সাধারণ মানুষরা এই ব্যবস্থায় কোনভাবেই লাভবান হয়নি। বহুক্ষেত্রেই সরকারের হাতে জমি ও আবাদী ফসল সমর্পণ করা সত্ত্বেও অতিরিক্ত ভূমিকর দিতে হত এবং সেই ভূমিকর ছিল ক্রমবর্ধমান। তবে মোড়ল বা জমিদাররা এই ব্যবস্থায় তাদের পুরান সম্মান ও সম্পদের অনেকটাই বজায় রাখতে পেরেছিল। নতুন কালটিভেশন সিস্টেমের কিছুটা সুফল ভোগ করার সৌভাগ্য এদের হয়েছিল। সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করল ১৮৪৩ খ্রিঃ— ধানচাষের জমি এবং শ্রমিক এই দুইটিই অন্য প্রয়োজনে ব্যবহার করার ফলে এসময় দুর্ভিক্ষ হয়। ১৮৪৮-৫০ খ্রিঃ এই সময় মধ্যজাভার বহু মানুষ অনাহারে কাটাতে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে যেসব মজুর নিযুক্ত ছিল তাদের পারিশ্রমিকও ছিল অত্যন্ত কম। বিশ্ব বাজারে সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার যোগাযোগ হল — কিন্তু জাভার কৃষক তার থেকে কিছুই পেল না। বৃহত্তর অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কোন সুযোগ কৃষকের সেইসময় ছিল না।

৬৯.৪ ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক বিবর্তনে লিবারেল দলের ভূমিকা

১৮৬০-এর দশকে লিবারেল দল ক্ষমতায় এলে তারা জাভায় শোষণ কমানোর চেষ্টা করে। বেসরকারি উদ্যোগ জাভায় অনুপ্রবেশের অনুমতি পেল। ১৮৬০ সালে Max Havelaar নামে একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়—এই উপন্যাসটি সাধারণ মানুষকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করে। সাধারণ মানুষও ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ শাসন ও শোষণের তীব্র সমালোচনা শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে ওলন্দাজ সরকার প্রবর্তিত কালচার সিস্টেম গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

নতুন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উন্মেষ ঘটে ঔপনিবেশিক শাসনের লিবারল পলিসির যুগ (১৮৭০-১৯০০) খ্রিঃ। তবে গুরুত্বহীন অবস্থায় কালচার সিস্টেম আরও কয়েক দশক টিকে ছিল।

নতুন পরিস্থিতিতে বলাহল ১/৪ বেশি জমি সরকারি ফসল উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। ১৮৬৫ খ্রিঃ বনাঞ্চলে রাষ্ট্রের জন্য দেয় বাধ্যতামূলক শ্রমের অবসান ঘটল। যে সব জমি নিয়মিত চাষ করা হত না সেগুলি অবশ্য রাষ্ট্রের সমাপ্তি বলে ঘোষণা করা হল এবং এগুলি ৭৫ বছরের জন্য ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হ'ল। জাভা ও অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জেও নিয়মিত চাষ করা জমি ৩ থেকে ৫ বছরের জন্য ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হ'ল। বিদেশীদের কাছে আবাদী জমি বিক্রি নিষিদ্ধ করা হল। ইউরোপীয় বিনিয়োগকারীদের কাজকর্ম শুধুমাত্র লিজহোল্ড জমিতে সীমাবদ্ধ রাখা হল। ইন্দোনেশিয়ায় জীবনধারণের উপযোগী জমি যাতে লিজ দেওয়া না হয় সে বিষয়ে ওলন্দাজ সরকার দৃষ্টি দেয়। শ্রমিক স্বার্থ সংক্রান্ত আইনে ইন্দোনেশীয় শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন ও কাজের শর্ত স্থির করে দেওয়া হয়।

নতুন পণ্য হিসাবে কোপরা (শুকনো নারকেল), পাম তেল, কাসাভা (Cassava), কোকো চাষ জনপ্রিয় হল। ১৮৭০-১৯১০ খ্রিঃ মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার রপ্তানির বাজার দ্বিগুণ হয়ে গেল। মেশিন, যন্ত্রপাতি, ইস্পাত, সার ইত্যাদির আমদানি বৃদ্ধি পেল, সুমাত্রা ও বোর্ণিওতে খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেল। ১৮৮৩ খ্রিঃ থেকে তেল এবং ১৯১০ খ্রিঃ পর থেকে রবার উৎপাদনে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

উদারনৈতিক পর্বের অর্থনৈতিক সাফল্য কালচার সিস্টেমের সময়কাল সাফল্যকে ছাড়িয়ে যায়। বৃহৎ খামার ও রোপণ অর্থনীতি এসময় থেকেই ইন্দোনেশিয়ায় জনপ্রিয় হয়। এসময় ব্যক্তিগত উদ্যোগে চিনি, চা, তামাক উৎপাদন বৃদ্ধি পায়—আর সরকারি উদ্যোগে কফির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

৬৯.৪.১ ফলশ্রুতি

উচ্চবর্গের অত্যাচার থেকে কৃষককে রক্ষা করার জন্য আইন রচনা করা হয় এবং রিজেন্ট বা সর্বোচ্চ রাজকর্মচারীদের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়। তবে ক্লিফোর্ড গ্রিটজ লিবারল পলিসির মধ্যে নতুনত্ব খুঁজে পাননি। তিনি বলেন এসময় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়নি—এবং নীতিগতভাবে গ্রামগুলি স্বশাসিত হলেও উচ্চস্তরের শাসকদের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা পায়নি।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে আবার নতুন নীতির সূচনা হ'ল— এই নীতির মুল কথা জনকল্যাণ। এই ethical policy-র যুগে সেচ ব্যবস্থা, চিকিৎসার সুযোগ, পাশ্চাত্য শিক্ষা ইত্যাদির দিকে রাষ্ট্র নজর দিল। উন্নতমানের রবার, সিঙ্কোনা, নারকেল চাষের ব্যবস্থা হ'ল। টিনের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা হ'ল—তবে প্রায় সব টিনের খনিই ছিল সরকারে নিয়ন্ত্রণাধীন। কয়লা উৎপাদনের ১/৪ ছিল সরকারে পরিচালনাধীন। ১৯৩০ খ্রিঃ ৫৭০০ কিমি রেলপথ বানান হয়।

অনেক বেসরকারি শিল্প কর্পোরেশন এসময় বিশাল আকার ধারণ করে। আন্তর্জাতিক মূলধন ব্যবহার শুরু হল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইন্দোনেশিয়ার বহির্দ্বীপপুঞ্জে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। তামাক, তেল, রাবার ও টিন উৎপাদনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ব্যাঙ্কিং বা অন্যান্য শিল্পগুলি সবই কিন্তু ছিল বিদেশী অর্থনৈতিক কাঠামোকে সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য। ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক বিকাশ কিন্তু বিদেশীদের লক্ষ্য ছিল না। তবে ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক নীতিতে কিছু সংখ্যক উচ্চশ্রেণীর ইন্দোনেশিয় লাভবান হয়। ১৯২৭ খ্রিঃ প্রায় ৫২ হাজার ইন্দোনেশিয় মক্কায় গিয়েছিলেন হজ করতে। এটা অবশ্যই প্রমাণ করে তাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্য। তবে একটা কথা অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, লভ্যাংশের ভাগাভাগিতে দেশীয় ও বিদেশীদের মধ্যে ফারাক ছিল যথেষ্ট দুস্তর।

৬৯.৪.২ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে ইন্দোনেশিয়ার পরিবর্তিত অর্থনীতি

১৯১৫-৩০ খ্রিঃ এসময় রোপণ অর্থনীতি বিকাশ লাভ করে। চিনি, ট্যাপিওকা, চা, কাসাভা, কফি চাষ হত জাভায় এবং বহির্দ্বীপপুঞ্জে চাষ হত রবার ও তামাক। ইন্দোনেশিয় প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং গ্রামের মোড়লরা জমি ইজারা দেওয়া, শ্রমিক সংগ্রহ ইত্যাদি কাজের দায়িত্বে ছিল। এই পণ্যগুলি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এমনভাবে চারা নির্বাচন, চাষ, সারে প্রয়োগ করা হত যে কারও পক্ষে অনুকরণ করে ব্যক্তিগতভাবে এসব পণ্য উৎপাদন করা অসম্ভব ছিল। অন্যদিকে ১৯২০ খ্রিঃ পর থেকে সাধারণ চাষীদের কাছ থেকে ওলন্দাজ মালিকানাধীনে চিনি কলগুলি আখ কিনতে অস্বীকার করে। ফলে ক্রমে ক্রমে ইন্দোনেশিয় কৃষকরা আখচাষ থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়।

জমিদার ও বিভিন্ন স্তরের আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ জমি ইজারার ব্যবস্থা করে, শ্রমিক সরবরাহ করে বিত্তশালী হয়ে ওঠে, কৃষকরা বছরের বিশেষ মরশুমে মজুর হিসাবে অনেকসময় বাগানে কাজ করত—এবং বাকি সময় ধান চাষে নিযুক্ত থাকত। পুরোনো সমাজকাঠামো বজায় রাখায় ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের লাভ ছিল কারণ এতে অর্থনৈতিক শোষণের সুবিধা হত। অতি উৎপাদনের (boom Period) সময়েও কিন্তু মাথাপিছু আয় বাড়ল না।

১৯২৯-৩৪ খ্রিঃ মধ্যে বিশ্ববাজারে বাগিচা পণ্যের চাহিদা কমে গেলও বড় প্রতিষ্ঠানগুলি দাম কমিয়ে রপ্তানি করতে থাকে কিন্তু দেশীয় ও ছোট প্রতিষ্ঠানগুলি পণ্য উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে পুরোপুরি চিরাচরিত কাঠামোয় কৃষি উৎপাদনে বিশেষ করে চাল উৎপাদনে মনোনিবেশ করে। এসময় রপ্তানি থেকে প্রাপ্ত অর্থ ৭৫% কমে যায়। রোপণ অর্থনীতির প্রাঙ্গণ থেকে বহু শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়ে গ্রামে ফিরে আসে—যার ফলে গ্রামগুলি অতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন হয়।

ওলন্দাজ আমলে ইন্দোনেশিয়ায় একদিকে বিকাশলাভ করেছিল আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আমদানি-রপ্তানি দপ্তর, ব্যাঙ্ক—অন্যদিকে পরিবর্তন বিমুখ গ্রামীণ অর্থনীতিও অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। স্বাভাবিকভাবে ঔপনিবেশিক শক্তির অর্থনৈতিক কার্যাবলীর লক্ষ্য ছিল বিদেশী গোষ্ঠীর স্বাচ্ছল্য। সাধারণ ইন্দোনেশীয় কৃষক শ্রমিক এতে শ্রমদান করেছিল কিন্তু কোনভাবেই লাভবান হয়নি।

৬৯.৫ ঔপনিবেশিক শাসনে ইন্দোনেশিয় সামাজিক চিত্র

ওলন্দাজ শাসনে ইন্দোনেশিয় সমাজ স্বাভাবিকভাবেই বহু পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়। তবে এই পরিবর্তন সামগ্রিক ছিল না। এই পরিবর্তনের চেহারা বা সীমানা ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে স্পষ্ট ছিল না। বলা যেতে পারে এলন্দাজ শাসনকালে একদিকে সনাতন ব্যবস্থা ও পরিবর্তন এই দুই-এর সহাবস্থান বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায়।

ওলন্দাজ শাসনে গ্রাম বা ক্ষুদ্র চাষীদের অস্তিত্ব সংকট ঘটে গিয়েছিল বলা যায় না। প্রথাসিদ্ধ আইন, রীতিনীতি, সাবেকী আমলাতন্ত্র, গ্রামপতি নির্বাচন এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অনেকটাই অপরিবর্তিত অবস্থায় ছিল। ফার্ণিভাল (Furnivall) সাধারণভাবে ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক নীতিকে সমালোচনা করলেও তিনিও বলেছেন সাবেকী রীতিনীতি প্রথার পরিবর্তন ঘটেনি। ওলন্দাজদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক প্রভাব ছিল কম— এরা স্থানীয় সমাজে মেলামেশা বা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থানে আড়ষ্ট ছিল। পর্তুগীজদের মতো কোন জেহাদের পরিকল্পনাও এদের মধ্যে ছিল না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও পরিবর্তন অবশ্যই হয়েছিল। ওলন্দাজরা জাভায় দাস ব্যবস্থায় প্রবর্তন করে— এর আগে জাভায় দাস ব্যবস্তা প্রায় অজানা ছিল বলা যেতে পারে। ওলন্দাজ অর্থনৈতিক শোষণ এবং অন্যদিকে ইসলামের কঠোর অনুশাসনে জাভার ঐতিহ্যপূর্ণ সাহিত্যচর্চা, চারুকলার বিকাশ ব্যাহত হয়। লিবারল সিস্টেমের যুগেও এই শোষণের অবসান ঘটেনি।

৬৯.৫.১ দেশা ব্যবস্থা

জাভার প্রচলিত সমাজ-কাঠামোর দেশা (desa) বা গ্রামের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামের নৈতিক জীবন রক্ষা থেকে শুরু করে অনাথ শিশুর লালন-পালন সবই ছিল দেশার দায়িত্ব। গ্রামে ব্যক্তির সম্মান সমাজ কল্যাণে ব্যক্তির অবদানের উপর নির্ভর করত। ব্যক্তির অস্তিত্ব ও জীবনধারণের ক্ষেত্রে দেশের গুরুত্ব ও মর্যাদা ছিল অসীম। চীনা বা আরব বণিকদের আগমন এই দৃঢ় সংঘবদ্ধ গ্রামীণ জীবনে কোন বিশেষ ছাপ ফেলতে পারেনি।

কিন্তু ওলন্দাজরা আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় শাসকদের তাদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের অংশীদার করে নিল, সুতরাং দেশা ধীরে ধীরে হয়তো বা নিজের অজান্তে পরিবর্তনের সম্মুখীন হল। বাজার অর্থনীতির ফলে মোড়লের ক্ষমতার প্রকৃতি পরিবর্তিত হল। লিবারল সিস্টেমের যুগে এই পরিবর্তন আরও দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়েছে। এই পরিবর্তন রোধ করার ক্ষমতা ইন্দোনেশিয় অভিজাত বা শাসকগোষ্ঠীর ছিল না।

ওলন্দাজ শাসনকালে সাধারণ মানুষের একাংশ ও অভিজ্ঞতরা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আসে— এরা ছিল নতুন নগর সভ্যতার প্রতিনিধি। পাশ্চাত্য শিক্ষা এদের মূল্যবোধ পরিবর্তন এনেছিল। অনেকের জাতিগত আনুগত্যও শিথিল হয়ে পড়েছিল। এরা অনেকেই ওলন্দাজ প্রশাসন ও বাণিজ্যের বিভিন্ন স্তরে চাকুরীর সুযোগ পেয়েছিল, তবে উচ্চস্তরগুলি থেকে দেশীয়রা বঞ্চিত ছিল। শিক্ষিত ইন্দোনেশিয়রা এটা পছন্দ করে নি।

৬৯.৫.২ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সামাজিক পরিবর্তন

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ইন্দোনেশিয় সমাজ জীবনে পাশ্চাত্য প্রভাব বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন করত যেসব কৃষক তারা নগদ অর্থের লেনদেনে অভ্যস্ত হল এবং পোশাক, সাইকেল, ওষুধ, নতুন ধরনের স্কুল ইত্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি পেল। যারা দেশা ছেড়ে খনিগুলিতে বা বাগিচাগুলিতে কাজ নিয়েছিল তাদের জীবনযাত্রায় দেশীয় আচার-অনুষ্ঠান, ঐতিহ্যপূর্ণ ছায়া নাটক, পুরোনো রীতির চাষ-আবাদ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল।

ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ফলে বাটাভিয়া, সুরাবায়া ইত্যাদি বাণিজ্য নগরের উত্থান ঘটে। এই নতুন পরিবেশে গ্রামের সনাতন প্রথা, ব্যবস্থা অর্থহীন হয়ে পড়ে। আবার শহরে কাজের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে যখন এরা গ্রামে ফিরে গেছে গ্রামসমাজ এদের কিন্তু স্বচ্ছন্দে মেনে নেয়নি।

ঔপনিবেশিক শাসন ইন্দোনেশিয় সমাজে যে পরিবর্তন এনেছিল তা প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় বহু নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজিত করে। এই নতুন ব্যবস্থা বা বৈশিষ্ট্য বা পরিবর্তন সম্বন্ধে সবসময় ঔপনিবেশিক শক্তি বা ইন্দোনেশিয়রা সচেতন ছিল তা নয় কিন্তু এই পরিবর্তন কমবেশি সকলকেই প্রভাবিত করেছিল।

৬৯.৬ সারাংশ

সমগ্র এককটি অধ্যয়ন করার পর আপনারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন যে ডাচ শাসনাধীন ইন্দোনেশিয়া তার আর্থ-সামাজিক জীবনে বহু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সংযোজিত করে। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল পরিবর্তনের বিষয়টি যা কোন না কোনভাবে সমাজ ও অর্থনীতিকে স্পর্শ করেছিল। তবে ফলশ্রুতিতে সামাজিক

ও অর্থনৈতিক জীবনে কতটা লাভ হয়েছিল সেটাই আলোচ্য বিষয়। ডাচ অর্থনৈতিক কাঠামোয় গ্রামীণ কৃষক সমাজ লাভবান হতে পারেনি। তাদের স্বাধীন অর্থনৈতিক কাজের সুযোগ খুব কমে যায়। কৃষক সমাজ বাধ্যতামূলক শ্রমদানে নিয়োজিত থেকে প্রায় ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়। ডাচ শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষিত ইন্দোনেশিয় সমাজ উচ্চস্তরের চাকুরী লাভে বঞ্চিত ছিল। ইন্দোনেশিয়ায় গ্রামীণ সমাজে দাসপ্রথার প্রচলনও হয় ওলন্দাজদের দ্বারা।

৬৯.৭ অনুশীলনী

ক। বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। কালচার সিস্টেম কে প্রবর্তন করেন?

২। 'দেশা' কাকে বলে?

৩। ইন্দোনেশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ মশলাটি কি?

৪। কালচার সিস্টেম থেকে প্রাপ্ত অর্থ কোন কাজে লাগান হয়?

৫। ডাচ লিবারল দল কবে ক্ষমতায় আসে?

৬। ইন্দোনেশিয়ার বাগিচা পণ্যগুলি কি?

খ। সংক্ষিত উত্তরের প্রশ্ন :

১। কালচার সিস্টেম বা কালটিভেশন সিস্টেম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

২। লিবারেল পলিসি বা উদারনৈতিক পলিসি কি?

৩। ইন্দোনেশিয়ার ওলন্দাজ বাণিজ্যিক স্বার্থ কিভাবে সংরক্ষিত হত?

৪। ওলন্দাজরা কোন অঞ্চল থেকে কি কি পণ্য সংগ্রহ করত।

গ। রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

১। কালচার সিস্টেম বা কালটিভেশন সিস্টেমের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন। এই ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা কি ছিল।

২। ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করুন। এই অর্থনীতি উদারনীতি দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছিল?

৩। ওলন্দাজ শাসনের ইন্দোনেশিয়ার সামাজিক ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন আসে?

৪। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় 'দেশা'র ভূমিকা আলোচনা করুন।

৬৯.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। জহর সেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস; (মালয় ও ইন্দোনেশিয়া), পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। (কলকাতা, ১৯৮৫)।

২। J.S. Furnival, Netherlands India : A study of Plural Economy, Cambridge University Press, 1939.

৩। G.C Allen and A.G. Donnithorne, Western Enterprise in Indonesia and Malay; A study in Economic Development, George Allen and Unwin, London 1957.

৪। D.G.E. Hall, A History of southeast Asia, Macmillan, London 1970.

৫। K. Bandopadhyaya, Burma and Indonesia, Comparative Political Economy and Foreign Policy, South Asian Publishers, new Delhi 1983.

একক ৭০ ❑ মালয় সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি

গঠন

৭০.০ উদ্দেশ্য

৭০.১ প্রস্তাবনা

৭০.২ মালয় : অর্থনৈতিক অবস্থা

৭০.৩ মালয়ী অর্তনীতিতে রবার চাষের ভূমিকা

  ৭০.৩.১ মালয়ের অন্যান্য কৃষিজ পণ্য

৭০.৪ মালয়ের অর্থনীতিতে সিঙ্গাপুরের গুরুত্ব

৭০.৫ উপনিবেশ শাসনকালে মালয়ী সমাজ

৭০.৬ বর্মার অর্থনৈতিক অবস্থা

  ৭০.৬.১ বর্মার অর্থব্যবস্থার পরিবর্তন

  ৭০.৬.২ বর্মার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি

  ৭০.৬.৩ যুদ্ধ পরবর্তীকালীন অর্থনৈতিক চিত্র

  ৭০.৬.৪ কৃষক সমাজের অবস্থা

  ৭০.৬.৫ বর্মায় ঔপনিবেশ অর্থনীতির ফলাফল

৭০.৭ বর্মার সামাজিক পরিস্থিতি

৭০.৮ অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্ররিস্থিতি

৭০.৯ সারাংশ

৭০.১০ অনুশীলনী

৭০.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৭০.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি অধ্যয়ন করে ঔপনিবেশিক শাসনাধীন মালয় এবং ব্রহ্মদেশের সমাজ ও অর্থনীতির একটি চিত্র আপনাদের কাছে পরিস্ফূট হবে, যার বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

- মালয়ের কৃষি ও অর্থনীতির মধ্যে সম্পর্ক।
- এই সম্পর্কে রবার চাষের ভূমিকা।
- বিশ্ববাণিজ্যে মালয়ের স্থান গ্রহণ।
- মালয়ের বহুজাতিভিত্তিক সমাজ (Pluralistic Socicty)।
- ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বর্মার অর্থনৈতিক শোষণ।
- সামাজিক অবক্ষয়।

৭০.১ প্রস্তাবনা

ইউরোপীয় বাণিজ্যগোষ্ঠীগুলি যেমন পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ব্রিটিশরা একের পর এক মালয়ে তাদের অধিকার কায়েম করেছে। তবে এই প্রক্রিয়া হয়েছে অনেক ধীরগতিতে ও বিচ্ছিন্নভাবে। এসত্ত্বেও প্রভাবিত হয়েছে এখানকার সমাজও অর্থনীতি। অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় রাষ্ট্রগুলির মতো বর্মা বা মায়ানমারও অনিবার্যভাবে পশ্চিমী শাসনাধীন উপনিবেশে পরিণত হয়। এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত হতে থাকে। বর্মা ছিল বনজ সম্পদে সম্পদশালী। ব্রিটিশরা এই সম্পদ ব্যবহার করেছিল নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য। এছাড়া বর্মার কৃষিজ পণ্য, খনিজ দ্রব্য ব্যবহার করে লাভবান হয়েছিল পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ। অর্থনৈতিক শোষণ বর্মার অর্থনীতিকে পরিবর্তিত করে পাল্টে দেয় সামাজিক চিত্র।

৭০.২ মালয় : অর্থনৈতিক অবস্থা

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে মালয়ের অর্থনৈতিক জীবন আবর্তিত হয়েছে মুলতঃ টিন ও রবারকে কেন্দ্র করে। টিন ও রবার ছাড়া অবশ্য আখ, কফি, মশলা ইত্যাদিও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই পণ্যগুলি উৎপাদন ও রপ্তানির উপর মালয় অর্থনীতির সমৃদ্ধি নির্ভরশীল ছিল।

১৮৮০-এর দশকের শেষের দিক থেকে টিন উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় মূলধনের অনুপ্রবেশ ঘটে। তবে মোটামুটি বলা যেতে পারে ১৯১২ খ্রিঃ আগে পর্যন্ত মালয়ের টিন উৎপাদন ছিল চৈনিকদের নিয়ন্ত্রণে। বিশ

শতকের প্রথম দিকে ব্রিটিশ ধনিকগোষ্ঠী মূলধন বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করে। তবে তারা টিন উৎপাদনের ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক চীনা শ্রমিক ও তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেছিল। টিন রপ্তানির টাকা মালয়ের আধুনিকীকরণে ব্যবহার হয়েছিল। মালয়ের প্রথম শিল্পোদ্যোগ ছিল টিন গলানো শিল্প। এমনকি ইন্দোনেশিয়া ও শ্যামদেশের টিনও মালয়েশিয়াতে আনা হত গলানোর জন্য। টিন শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মালয়ে বহু নতুন শহরের উত্থান ঘটে—বহু শ্রমিক এসব শহরে আসে জীবিকার সন্ধানে। শহরের চারপাশে গড়ে উঠেছিল কৃষিক্ষেত। সেখানে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটাতে ধান, ফল, শাকসব্জী চাষ করা হত।

ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে মালয়ে রবার চাষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এসময় আন্তর্জাতিক বাজারে কফির দাম পড়ে গেলে অনেকেই রবার চাষে মন দেয়। রবার গাছ বড় হতে সময় লাগত ছয়-সাত বছর—শুধুমাত্র বড় ফার্মগুলির পক্ষে বিনিয়োগ করে তারপর ছয়-সাত বছর অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে শুধুমাত্র বড় ফার্মগুলি নয় বিত্তবান শ্রেণী, মাঝারি বড়লোক, সাধারণ চাষী সকলেই রবার চাষে উৎসাহী ছিল। রবার চাষের বিস্তারের ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে লোকবসতি গড়ে ওঠে এবং রেলপথ ও অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে।

কিন্তু এটা সামগ্রিক চিত্র ছিল না। ধানজমিতে মালয়ীদের অধিকার রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছিল—বহু কৃষক কৃষিকাজের ফাঁকে অবসর সময়ে রবার চাষে অংশ নিয়ে আয় বৃদ্ধির সুযোগ পেলেও অধিকাংশ কৃষক ছিল ঋণভারে জর্জরিত। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে কৃষকের নিজস্ব অর্থনৈতিক অবস্থার কোন সম্পর্ক ছিল না বললেই হয়। রবার চাষে বহু ভারতীয় শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। এদের মজুরী ইচ্ছামত হ্রাসবৃদ্ধি করা হত। যখন বেশি কাজের চাপ থাকত একমাত্র সেই সময়েই মজুরী বৃদ্ধি করা হত এবং অনেক সময় বর্ধিত মজুরীর সঙ্গে অন্যান্য ভাতাও দেওয়া হত।

৭০.৩ মালয়ী অর্থনীতিতে রবার চাষের ভূমিকা

যাই হোক, ১৯১০ খ্রিঃ নাগাদ মালয়ে রবার চাষ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে অবশ্য সিঙ্গাপুর 'বোটানিকাল গার্ডেন্স'-এর ডিরেক্টর হেনরী রিডলের অবদান ছিল। তিনি গাছের বেশি ক্ষতি না করে অধিক পরিমাণ রবার উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। গাড়ির টায়ার, জুতো, বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম, আসবাব ইত্যাদির জন্য রবারের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং সেজন্য রবারকেন্দ্রিক রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নতি হয়। এই সময় রবার কোম্পানিগুলি অধিকাংশই ছিল ব্রিটিশ মালিকানাধীন তবে ইউরোপীয়, অষ্ট্রেলিয়ান, আমেরিকান মালিকানাধীন রবার কোম্পানিও ছিল। ১৯১০ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে মালয় প্রায় সারা বিশ্বের চাহিদার ৫৩ শতাংশ রবার যোগান দিত। ১৯২০-এর দশকে রবার চাষ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। মন্দার ফলে রবারের বাজারদরও বেশ হ্রাস পায়। ১৯৩০-

এর দশকে পুনরায় বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার ফলে রবার শিল্প ভীষণ অসুবিধায় পড়ে এবং এর ফল হয় বেশ সুদূরপ্রসারী। তবে ১৯৫০-এর দশকে বিশ্বের মোট উৎপাদিত রবারের $^{১}/_{৩}$ রবার উৎপাদিত হয়েছিল মালয়ের রাজ্যগুলিতে।

৭০.৩.১ মালয়ের অন্যান্য কৃষিজ পণ্য

মালয়ের অন্যান্য পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গোলমরিচ, লবঙ্গ, জায়ফল। এগুলি প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করা হত। এই চাষে ইউরোপীয় ও চৈনিকরা সক্রিয় ছিল। ১৯ শতকের তৃতীয় দশকে পোনাঙ, প্রভিন্সওয়েলসলী ও মালাক্কাতে কয়েকজন ইউরোপীয় বণিক আখের চাষ শুরু করে। জমি পরিষ্কার করা, চারা লাগানো আখ কাটা এসব কাজ করত চীনা শ্রমিক। ১৮৮০-র দশকে ভারতবর্ষে থেকেও প্রচুর তামিল চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক মালয়ে গিয়েছিল। ১৯১০ সালে ফেডারেটেড মালয় স্টেটসে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক প্রথা বাতিল করা হয়। তারপর থেকেই মালয়ে চিনি শিল্পের অবনতি শুরু হয়। ১৯১৩ সালে বহু চিনিকল বন্ধ হয়ে যায়।

মালয়ে কফির চাষও ছিল ইউরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণাধীন। এখানে বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে মালয়ীদের কফি চাষে বিশেষ উৎসাহ ছিল না। তারা মূলত মাছ ধরা ও টিকে থাকার জন্য যেটুকু কৃষিকাজ প্রয়োজন সেটুকুতেই উৎসাহী ছিল। যাইহোক, উনিশ শতকের শেষভাগে ব্রাজিলে কফির উৎপাদন বেড়ে গেলে মালয়ে কফির দাম কমে যায়। তাছাড়া পতঙ্গের আক্রমণে মালয়ে কফি চাষ বিনষ্ট হলে অনেকেই কফি চাষ ছেড়ে ইউরোপে ফিরে যায় বা মালয়ে রবার চাষ শুরু করে দেয়।

মালয়ে বিদেশ থেকে পামতেলের গাছ নিয়ে আসা হয়। এই গাছ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯২০-র দশকে রবার চাষে মন্দা দেখা দিলে পাম গাছের চাষ বেড়ে যায়।

৭০.৪ মালয়ের অর্থনীতিতে সিঙ্গাপুরের গুরুত্ব

মালয়ের অর্থনৈতিক জীবনে সিঙ্গাপুর ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইংলন্ড থেকে এখানে কাটা কাপড় আসত। সিঙ্গাপুর থেকে ইংলন্ডে রপ্তানি করা হত কাঁচা রেশম, কফি, চিনি, কচ্ছপের খোলস, কর্পূর ও গোলমরিচ। তাছাড়া ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আনা হত পশমী পোশাক, সুরা, লোহা, তামা ইত্যাদি। সিঙ্গাপুর থেকে ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকায় রপ্তানি করা হত মূলত চীনে উৎপন্ন পণ্য। মরিশাস ও ভারতের সঙ্গেও সিঙ্গাপুরের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য চলত।

১৮৩৩ সালে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার বিলুপ্ত হলে সিঙ্গাপুর তার সমৃদ্ধি হারায়। চীন থেকে আগত বা চীনগামী মালবাহী জাহাজগুলি আর সিঙ্গাপুরকে বন্দর হিসাবে ব্যবহার

করতে বাধ্য ছিল না। ১৮৪০-এর দশকে হংকং এবং লাবুআন-এর উত্থান ঘটে। পশ্চিমী শক্তিগুলির সঙ্গে চুক্তির ফলে চীনের যে সব বন্দর উন্মুক্ত করা হয়েছিল। ইংলন্ডের সঙ্গে সেগুলির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

৭০.৫ উপনিবেশ শাসনকালে মালয়ী সমাজ

মালয়ের সামাজিক চিত্র উল্লেখ করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় এখানের সমাজ বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত ছিল। মালয়ীদের সঙ্গে সহাবস্থান করত চীনা, ভারতীয়, ইউরোপীয়রা, ইউরেশিয়ান ও কিছুসংখ্যক আরব। প্রথমে মালীয়দের কথা বলা যেতে পারে। সাধারণ গ্রামবাসী মালয়ীরা ছিল মূলত কৃষিজীবী ও মৎসজীবী। ঔপনিবেশিক যুগের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে এদের কোন যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। উচ্চবিত্ত মালয়ীরা কেউ কেউ পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিল। মালয়ের বহুজাতিক সমাজের অন্যতম সদস্য ছিল চীনা ও ভারতীয়রা। ১৯৩০ খ্রিঃ পর্যন্ত মালয়ে বিদেশীদের অভিবাসনের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ১৯৪৭ খ্রিঃ মালয়ের মোট জনসংখ্যার ৩৫% ছিল চীনা এবং ১০% ছিল ভারতীয়।

মূলত দক্ষিণ চীন থেকে চীনারা মালয়ে এসেছিল। এরা দোকানদার, ছুতোর, রাজমিস্ত্রী, কামার, বণিক ইত্যাদি হিসাবে কাজ করত। অল্পসংখ্যক চীনা বড় ক্ষেতের মালিক ছিল। মাছের ব্যবসার পুরোটাই প্রায় ছিল চীনা নিয়ন্ত্রণে। মাছ ধরা থেকে বাজারে নিয়ে যাওয়া এমন কি দালালি সবই ছিল তাদের হাতে। ১৮৩৩ খ্রিঃ নাগাদ সিঙ্গাপুরের চৈনিকরা বিদেশীদের মধ্যে ছিল সর্বাধিক সংখ্যক। সিঙ্গাপুরের অভ্যন্তরে টিন খনি অঞ্চলে তারা সক্রিয় ছিল। সিঙ্গাপুরের বণিকদের মধ্যেও বহুসংখ্যাক চৈনিক ছিল। এই চৈনিকদের সঙ্গে মালয়ীদের সামাজিক ও বৈবাহিক সম্পর্ক প্রায় ছিল না বললেই চলে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মালয়ীরাও তীব্রভাবে চীনা বিরোধী ছিল। মালয়ের কৃষকরা অবশ্য ঋণের জন্য বা কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় গরু, মোষের জন্যও চীনা মহাজনদের উপর নির্ভরশীল ছিল। মালয়ের জেলেরাও নৌকা, জাল ইত্যাদি কেনার জন্য চীনা মহাজনদের উপর নির্ভরশীল ছিল। পরিবর্তে অবশ্য ধরে আনা মাছ তারা চীনা মহাজনকে, মহাজন নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য থাকত।

ভারতীয়রা বিভিন্ন কারণে মালয়ে এসেছিল। রেল, বাণিজ্য সংস্থা, সরকারি চাকরি, কৃষিক্ষেত্রে মজুরে কাজ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ও স্তরের কাজের জন্য ভারতীয়রা মালয়ে এসেছিল। তাছাড়া ইউরোপীয়, আরব, ইউরেশিয়রা বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য ও জীবিকাসূত্রে এখানে এসেছিল। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধসূত্রে এরা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। তবে সাধারণ মালয়ীদের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্কই ছিল না বলা যেতে পারে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চীনারা ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী, তারপর ভারতীয়রাও শেষে ছিল মালয়ীরা।

৭০.৬ বর্মার অর্থনৈতিক অবস্থা

উনবিংশ শতকে ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত হলে অবশ্যম্ভাবীভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত এই পরিবর্তনে ব্রহ্মদেশের সাধারণ মানুষের কোন উপকার হয় নি। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের অর্থনৈতিক কার্যাবলী, নীতি নির্ধারণ করেছিল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য।

সূতি কাপড়ের বাজার হিসাবে ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল। ১৮২৬ খ্রিঃ আরাকান, টেনাসেরিম, ব্রিটিশদের অধীনস্ত হল। ব্রিটিশদের রাজ্যবিস্তার তাদের ব্যবসা বিস্তারে সহায়ক হল। ব্রহ্মদেশের বিশাল জনসংখ্যা বাজার হিসাবে খুব আকর্ষণীয় ছিল। ইরাবতী নদীতে ব্রিটিশ বাণিজ্য জাহাজ চলাচলের অনুমতি দেওয়া হল। ভামোতে একজন ব্রিটিশ বাণিজ্য প্রতিনিধি রাখার অনুমতি দেওয়া হল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ব্রহ্মদেশের মাধ্যমে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহী ছিল।

৭০.৬.১ বর্মার অর্থব্যবস্থার পরিবর্তন

১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল উন্মুক্ত হওয়ার পর ব্রহ্মদেশের কৃষিতে ব্যাপক পরিবর্ত এল। ধান চাষে নিযুক্ত চাষীদের মানসিকতায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। এসময় চালের চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধি পেল। ফলে কৃষক প্রয়োজনভিত্তিক উৎপাদন থেকে অতিরিক্ত উৎপাদনে উৎসাহী হল। উদ্বৃত্ত উৎপাদন বাজারজাত করার প্রয়োজন হল। অতিরিক্ত উৎপাদন, পণ্য বাজারজাত করা ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন ছিল অতিরিক্ত মূলধন। এই সুয়োগ নিল ভারতীয় ফড়ে ও মহাজনরা। ব্রিটিশ প্রশাসনও এর কোন বিরোধিতা করেনি। বরঞ্চ তারা ফড়ে ও মহাজনদের ব্রহ্মদেশে আসতে উৎসাহিত করে। ব্রহ্মদেশে এসময় বহুসংখ্যক দক্ষিণ ভারতীয় চেট্টিয়ার মহাজনরা এল। তবে এরা প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করত কলকাতাস্থিত 'ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক' থেকে। চৈনিক মহাজনদের তুলনায় এদের সুদের হার ছিল অনেক কম। তা সত্ত্বেও বহু কৃষক ঋণভারে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে পড়ল। অবশেষে ঋণ শোধ করতে না পেরে অনেকে জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেল। কৃষকের দুরবস্থা সত্ত্বেও ঊনিশ শতকের শেষার্ধে ব্রহ্মদেশের চালের উৎপাদন ও রপ্তানির পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল।

১৯০৭ খ্রিঃ সারা বিশ্বে চালের মূল্য হ্রাস পায়। বহু কৃষক এসময় জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যায়। মহাজনরা এই সুযোগে সুদের হার বৃদ্ধি করে। এই দুর্দিনে জমির খাজনা কমানোর কোন পদক্ষেপ ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ নেয় নি। উপরন্তু ঔপনিবেশিক ব্রহ্মদেশে জমিদারদের মধ্যে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এদের অনুপস্থিতিতে কর্মচারীরা খাজনা আদায়ের নামে অত্যাচার চালাতে থাকে।

চাল ছাড়া সেগুন কাঠ ছিল ব্রিটিশদের কাছে অপর গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পণ্য। ব্রিটিশরা জঙ্গলগুলি দীর্ঘমেয়াদী ইজারা নিয়ে নেয়। ঊনিশ শতকের শেষের দিকে খনিগুলিতে ব্রিটিশ মূলধন বিনিয়োগ করা হল। সীসা ও রূপার

উৎপাদন বৃদ্ধি পেল। বিংশ শতকের প্রথম দিকে বার্মা অয়েল কোম্পানির উৎপাদন বৃদ্ধি পেল। ১৯০৮ খ্রিঃ তেলকূপগুলি থেকে সিরিয়ামের শোধনাগার পর্যন্ত পাইপ লাইন স্থাপন করা হল।

৭০.৬.২ বর্মায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি

ব্রিটিশরা নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্রহ্মদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। কাঁচামাল সংগ্রহ, সৈন্য চলাচল ইত্যাদি কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির প্রয়োজন হল। ১৮৭৭ খ্রিঃ রেঙ্গুন-প্রোম রেলপথ চালু করা হয়। ১৮৮৯ খ্রিঃ টঙ্গু (Toungu) ও মন্দালয় পর্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হয়। জলপথে স্টিমার চলাচল শুরু হল— স্টিমারে চলাচলের ফলে বহুসংখ্যক বর্মী মাঝি তাদের সাবেকী জীবিকা থেকে বঞ্চিত হল।

৭০.৬.৩ যুদ্ধ পরবর্তীকালীন অর্থনৈতিক চিত্র

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ব্রিটিশ কোম্পানি তেল, সীসা, রূপা, টাংস্টেন, টিন উৎপাদন বৃদ্ধি করে। এসময় সিমেন্ট উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ উদ্যোগে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার উন্নতি হ'ল। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে পেট্রোলিয়াম শিল্প ছাড়া অন্যান্য সমস্ত শিল্পগুলি ছিল বিদেশীদের হাতে এবং শ্রমিকরা মূলত ছিল ভারতীয় ও চৈনিক। ১৯৩০ খ্রিঃ নাগাদ ভারতীয় মহাজনদের হাতে ব্রিটিশ অধিকৃত ব্রহ্মদেশের ধানজমির প্রায় অর্ধেক চলে আসে। ১৮৮০ খ্রিঃ দক্ষিণ ব্রহ্মদেশে কর্ষণযোগ্য দানজমির পরিমাণ ছিল ৩ মিলিয়ন একর—১৯৩০ খ্রিঃ এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল ১০ মিলিয়ন একর।

১৮৭০ খ্রিঃ তুলনায় ব্রহ্মদেশের রপ্তানি ১৯০০ খ্রিঃ চারগুণ বৃদ্ধি পায়, ১৯১৪ খ্রিঃ তা বৃদ্ধি পেয়ে দশগুণ হ'ল। ১৯২৬-২৭ খ্রিঃ রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় পনের গুণ। অধিকাংশ সময় ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশের আমদানির তুলনায় রপ্তানি ছিল বেশি।

৭০.৬.৪ কৃষক সমাজের অবস্থা

তবে এই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সাধারণ বর্মী কৃষক বা শ্রমিক কোনভাবেই লাভবান হয়নি। ঋণে নিমজ্জিত বর্মী চাষী দুরবস্থার চরম সীমায় পৌঁছাল। ভারতীয় চাষীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৮৮০-র দশকে ব্রিটিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কৃষকদের ঋণদানের ব্যবস্থা করা হল—বিংশ শতকের শুরুতে সমবায় ঋণদান প্রকল্প চালু হল। কৃষকদের হাত থেকে যাতে জমি বেরিয়ে না যায় সেদিকে যথেষ্ট চেষ্টা করা হল। আয়ারল্যান্ডের ভূমি সংস্কারের অভিজ্ঞতা কার্যকরী করার চেষ্টা করা হয়—কিন্তু কোনভাবেই কৃষকের দুরবস্থা দূর হয়নি।

৭০.৬.৫ বর্মায় উপনিবেশ অর্থনীতির ফলাফল

এই ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে ভারতীয় ও চীনা বণিক, খুচরো ব্যবসায়ী, কৃষি ও শিল্প শ্রমিকরা খুব সক্রিয় ছিল। তবে এই শ্রমিকরা অধিকাংশ ছিল মরশুমী আগন্তুক। রেলপথ ও ডক নির্মাণে অসংখ্য ভারতীয় শ্রমিক

নিযুক্ত ছিল। ভারতীয় ও চীনা ব্যবসায়ীরা কৃষির নানা স্তরে অর্থ বিনিয়োগ করত। ভারতীয়দের পরেই ছিল চীনদেশীয় শ্রমিকদের সংখ্যাধিক্য। ১৯৪১ খ্রিঃ ব্রহ্মদেশে ২৫০,০০০ জন চৈনিক ছিল আর ভারতীয়দের সংখ্যা ছিল এক মিলিয়ন। চীনারা ধান, কাঠ ইত্যাদির ব্যবসা পরিচালনা করত। বহু দোকানের মালিকানা ছিল তাদের হাতে। খনি ও শিল্প শ্রমিক হিসাবে বহু চীনা নিযুক্ত ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় ব্রহ্মদেশে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে চৈনিকদের সম্পর্ক ছিল অনেক স্বচ্ছন্দ।

৭০.৭ বর্মার সামাজিক পরিস্থিতি

ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশ শাসনের ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান ঘটে। তবে তাদের সংখ্যা ছিল কম। পেশাগত দক্ষতা এদের মধ্যে সেভাবে তৈরি হয়নি। এই অভাব পূরণ করেছিল ভারতীয় মধ্যবিত্তরা। বহুসংখ্যক ভারতীয় করণিক, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ব্রহ্মদেশে চাকরীসূত্রে এসেছিল। তবে এরা কেউই স্থায়ীভাবে বসবাসের পরিকল্পনা নিয়ে আসেননি—অবসরের পর অনেকেই দেশে ফিরে এসেছিলেন।

ঔপনিবেশিক শাসনে ব্রহ্মদেশের গ্রামাঞ্চলেও পরিবর্তন এল। সাবেকী কাঠামো, সম্পর্ক পাল্টে গেল। নতুন পরিস্থিতিতে গ্রামের মোডলের প্রতাপ কমতে থাকে। নৈতিক জীবনেও কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। সামাজিক শুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য এক ঘরে করা বা ধোপা নাপিত বন্ধ করার পুরোনো পদ্ধতি কার্যকারিতা হারাল।

ভারতীয় ও চীনা শ্রমিকদের সংখ্যাধিক্যের ফলে সাধারণ গ্রামবাসীর কাজের সুযোগ কমে গিয়েছিল। কর্মহীন যুবকদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বাড়ল। গ্রামে পুলিশের নতুন উপদ্রব শুরু হল। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার নামে অনেক সময়ই অমানবিক অত্যাচার চালানো হত। এদের ঘুষের টাকা সংগ্রহ করতে বহু যুবক ডাকাতিতে জড়িয়ে পড়েছিল। ফলে বেড়ে ছিল নানারকম অসামাজিক কার্যকলাপ।

৭০.৮ অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পরিস্থিতি

ব্রিটিশ আমলে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব কমতে থাকে। উত্তর ব্রহ্মদেশের তুলনায় দক্ষিণাঞ্চলের বৌদ্ধ সংগঠনগুলি ব্যাপক ক্ষয়িষ্ণুতার শিকার হয়। ব্রিটিশ প্রশাসন অবশ্য সরাসরি বৌদ্ধধর্মীয় কাঠামোয় হস্তক্ষেপ করেনি—কিন্তু এরা যে সমস্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত তা থেকে তারা বঞ্চিত হয়। এদের পরিচালনাধীন শিক্ষাব্যবস্থাও ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে।

ঔপনিবেশিক শাসনে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষয়িষ্ণু ব্রহ্মদেশ ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বলতার হাত থাকে। বাহ্যিক বিকাশের যে ছবি পাওয়া যায় তা প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশদের স্বার্থসিদ্ধি করেছিল।

৭০.৯ সারাংশ

ঔপনিবেশ শাসনে মালয় প্রধানত একটি রপ্তানিকেন্দ্রিক দ্বীপে পরিণত হয়েছিল। এখানকার রবার, টিন প্রভৃতি কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলিকে বাণিজ্যিক কার্যে উৎসাহিত করে। শুধু পশ্চিমী নয় এখানে চীনা, ভারতীয়রাও বাণিজ্যিক কার্যে লিপ্ত ছিল। মালয়ী চীনাদের হাতে ছিল সুনিয়ন্ত্রিত, সংগঠিত খনি ব্যবসায় এবং ভারতীয়দের কাছে রবার ব্যবসায় ছিল আকর্ষণীয়। তবে রবারজাত পণ্যের রপ্তানি মালয়ী অর্থনীতিকে অভূতপূর্বভাবে প্রসারিত করেছে।

ব্রহ্মদেশ বা বর্মায় ব্রিটিশ অর্থনৈতিক শোষণের চিত্রটি এই এককের মাধ্যমে আপনারা চিহ্নিত করতে পেরেছেন। এটাও দেখেছেন বর্মার রাজতন্ত্র এই শোষণ রোধ করতে অপারগ ছিল। সমাজে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হল কৃষকশ্রেণী।

৭০.১০ অনুশীলনী

ক। বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। বহুজাতিক সমাজ কাকে বলে?

২। মালয়ের প্রধান কৃষিজমির নাম কি?

৩। মালয়ের উল্লেখযোগ্য খনিজটির নাম লিখুন?

৪। সিঙ্গাপুর থেকে ইংল্যান্ডে রপ্তানিকৃত দ্রব্যগুলি কি কি?

৫। হেনরী রিডলে কে ছিলেন?

৬। ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল কেন?

৭। বর্মার একটি নদীর নাম করুন।

৮। সুয়েজ খাল কবে উন্মুক্ত হয়?

৯। ভারতবর্ষের কোন অঞ্চল থেকে কারা আসত বর্মায়?

১০। বর্মার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কৃষিপণ্যের নাম লিখুন।

১১। টৌঙ্গু-মান্দালয় রেলপথ কবে স্থাপিত হয়?

খ। সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

১। মালয়ে চৈনিকদের অর্থনৈতিক ভূমিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

২। বহুজাতিভিত্তিক মালয়ী সমাজব্যবস্থায় একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা প্রস্তুত করুন।

৩। ঔপনিবেশিক শাসনে বর্মার কৃষক সমাজের চিত্র দিন।

৪। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন আলোচনা করুন।

৫। সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বৃদ্ধির কারণগুলি কী কী?

৬। ঔপনিবেশিক শাসনে ধর্মীয় সংগঠনগুলির অবস্থা বর্ণনা করুন।

গ। রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

১। মালয়ী অর্থনীতিতে সিঙ্গাপুরের গুরুত্ব কী?

২। ঔপনিবেশিক শাসনে বর্মার সমাজ ও অর্থনীতিতে কী ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়? এই পরিবর্তনে বর্মা কতটা লাভবান হয়েছিল।

৩। ব্রিটিশ শাসনাধীন মালয়ের সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

৪। উপনিবেশিক মালয়ের অর্থনৈতিক চিত্র প্রস্তুত করুন।

৭০.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। জহর সেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস (মালয় ও ইন্দোনেশিয়া), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। (কলকাতা, ১৯৮৫)।

২। J.F. Cady, South-East Asia : Its Historical Development (1964, America).

৩। G.C. Allen and A.G. Donnithorne, Western Enterprise in Indonesia and Malay : A study in Economic Development, George Allen and Unwin, London 1957.

৪। D.G.E. Hall, A History of Southeast Asia, Macmillan, London 1970.

৫। Brian Harrison, South-East Asia, A short History (London, 1963).

৬। K. Bandyopadhyaya, Burma and Indonesia, Comparative Political Economy and Foreign Policy, South Asian Publishers, New Delhi 1973.

একক ৭১ □ ঔপনিবেশিক শাসনকালে ফিলিপিন্স ও থাইল্যান্ডের সমাজ-অর্থনীতি

গঠন

৭১.০ উদ্দেশ্য

৭১.২ প্রস্তাবনা

৭১.৩ ঔপনিবেশিক ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের আর্থ-সামাজিক চিত্র

৭১.৪ শ্যামদেশ বা থাইল্যান্ডের সামাজিক প্রেক্ষাপট

৭১.৫ থাইল্যান্ডের বিদেশী প্রভাবিত অর্থনীতি

৭১.৬ থাই অর্থনীতিতে চীনাদের ভূমিকা

৭১.৭ সারাংশে

৭১.৮ অনুশীলনী

৭১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৭১.০ উদ্দেশ্য

বর্তমান এককটি অধ্যয়ন করার পর আপনারা ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ ও শ্যামদেশ বা থাইল্যান্ডের ঔপনিবেশিক চিত্র থেকে যে পৃথক লক্ষণগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন, তা হ'ল :

- ফিলিপিনে স্পেন ও আমেকিন ঔপনিবেশিক প্রভাব।
- আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন।
- এই পরিবর্তনের ফলে ফিলিপিন জনগণের উন্নতির পরিমাণ।
- থাই সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

৭১.১ প্রস্তাবনা

আলোচ্য পর্যায়টিতে আপনারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জগুলিতে পশ্চিমী শক্তিগুলির আগমনের প্রভাব ও ফলাফল অধ্যয়ন করছেন। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলে এসে বাণিজ্যিক গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য এবং বাণিজ্যের একাধিপত্য বজায় রাখার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ফলে অনিবার্যভাবে দ্বীপপুঞ্জগুলি পশ্চিমী প্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। বিশেষ করে সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনীতিতে এসেছে রূপান্তর। এই এককটিতে ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ ও শ্যাম দেশ তথা থাইল্যান্ডের উপর স্পেন, আমেরিকা এবং ফ্রান্সের প্রভাব আলোচনা করব।

৭১.২ ঔপনিবেশিক ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের আর্থ-সামাজিক চিত্র

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ছিল স্পেনের উপনিবেশ। ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে আমেরিকা ফিলিপাইন দখল করে নেয়। এই দুই শক্তিই ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে ব্যবহার করেছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য। ঔপনিবেশিক শাসনের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ফিলিপাইনের সমাজ ও অর্থনীতিতে পরিবর্তন আসে। তবে এই পরিবর্তনে সাধারণ ফিলিপাইনবাসী উপকৃত হয়নি।

চীন ও স্পেনীয় আমেরিকার মধ্যে যোগাযোগের জন্য স্পেনীয়দের কাছে ম্যানিলা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকা থেকে ফিলিপাইনে এল তামাক, ভুট্টা, মিষ্টি আলু, বাদামের চাষ। এই চাষ আবার ফিলিপাইন থেকে চীনে পৌঁছল। ফিলিপাইনে বাণিজ্যিক ফসল (Commercial Crop) চাষ শুরু হল। তামাক, পাট ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পেল। তবে এই পণ্যগুলি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তেমন গুরুত্ব পায়নি।

স্পেনীয় শাসনে ফিলিপাইনের রীতিনীতি, ধ্যানধারণা, মূল্যবোধ কিছুটা পরিবর্তিত হল। তবে সমাজব্যবস্থায় যে আধুনিকীকরণ হল তা বোধহয় বলা যায় না — বরঞ্চ বলতে পারি সমাজব্যবস্থা ছিল মধ্যযুগীয়। ঊনিশ শতকে ফিলিপাইনে খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টায় খ্রীস্টধর্ম প্রসারলাভ করে।

উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিয়ে তৈরি হল ফিলিপাইনের মধ্যবিত্ত সমাজ। এরা যাজক, স্কুলশিক্ষক ইত্যাদি পদে নিযুক্ত হল। কিছুসংখ্যক লোক অবশ্য মাঝারি মাপের সরকারি কর্মচারীর কাজ পেল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত ফিলিপাইনেও বহুসংখ্যক চীনা অধিবাসী ছিল। এদের সংখ্যাধিক্যের

ফলে স্পেনীয়রা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে। চীনারা ছিল বড় ব্যবসায়ী। বহু চীনা জমির মালিকানাও ছিল। ১৯৪৭ খ্রিঃ বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছিল চৈনিকদের হাতে।

১৮৯৪ খ্রিঃ স্পেন-আমেরিকার যুগে স্পেনীয়রা ম্যানিলা উপসাগরে পরাজিত হল। স্পেন ফিলিপাইন ত্যাগ করতে বাধ্য হল এবং ১৯০২ খ্রিঃ ফিলিপাইনে আমেরিকার শাসনের সূচনা। ফিলিপাইনে আমেরিকার মূলধন, প্রযুক্তি আসার পথ প্রশস্ত হল।

আমেরিকার নিয়ন্ত্রণাধীনে ফিলিপাইনের রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। ১৯১৪ খ্রিঃ পর থেকে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বদ্ধি পেল। পাট, তামাক, চিনের উৎপাদন লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেল।

৭১.৩ ফিলিপিনের গ্রামীণ জীবনের পরিবর্তন

ঔপনিবেশিক শাসনে গ্রামজীবনের সর্বক্ষেত্রেই পরিবর্তন এল। নৈতিক জীবনে এলে ক্ষয়িষ্ণুতা। গ্রামের চাষী ঔপনিবেশিক অর্থনীতির কোন সুফল ভোগ করার সুযোগ পেল না। সাবেকী কৃষিব্যবস্থার উন্নতির কোন চেষ্টা হয়নি। চাষীর ঋণভার বৃদ্ধি পেল। কৃষি ঋণদানের জন্য ব্যাঙ্ক স্থাপিত হলেও চাষীদের এতে খুব একটা সুবিধা হয়নি। সাধারণ ফিলিপাইনবাসীরা ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের মধ্যে কোনভাবে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল।

৭১.৪ শ্যামদেশ বা থাইল্যান্ডের সামাজিক প্রেক্ষাপট

সপ্তদশ শতক থেকেই থাইল্যান্ড বা শ্যামদেশ বহির্বিশ্বের সঙ্গে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহী ছিল। ফরাসি, ওলন্দাজ ও ইংরেজ কোম্পানিগুলিকে তারা থাইল্যান্ডে বাণিজ্য করার আহ্বান জানায়।

সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে ফরাসি মিশনারীরা শ্যামদেশে আসে। তারা অবশ্য ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সামরিক উপদেষ্টার ভূমিকাও নিয়েছিল। ১৬৮১ খ্রিঃ ফ্রান্স ও শ্যামদেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফরাসি কোম্পানি ও শ্যামদেশের রাজকীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ফুকেত দ্বীপের (Puket Island) টিন রপ্তানির উপর তারা একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। আয়ুথিয়াতে (Ayuthia) কোম্পানি তার কর্মচারীদের উপর

তারাই নিয়ন্ত্রণ করত। আবার অনেকে দিনমজুরের কাজও করত। অবশ্য কিছু সংখ্যক চৈনিক রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্বে ছিল।

থাইল্যান্ড নিজের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রাখলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারেনি। ইউরোপীয়রা নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত থাইল্যান্ডকেও ব্যবহার করেছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা এই অর্থনৈতিক শোষণকে প্রতিরোধ করতে পারেনি।

৭১.৭ সারাংশ

এই এককটি অধ্যায়ন করে আমরা একটা বিষয় স্পষ্ট করতে পারি ফিলিপিনের ক্ষেত্রে যে দুটি ইউরোপীয় রাষ্ট্র এখানে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে অথচ সমাজে অর্থনীতিতে কোন পরিবর্তন বা দ্বীপবাসীকে প্রকৃত অগ্রগতি দিতে পারত তা কিন্তু হয়নি। সমাজে অসন্তোষ বেড়ে গেছে যা মাঝে মাঝে বিদ্রোহের আকারও নিয়েছে। শ্যামদেশের ক্ষেত্রে দেখি ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠী নিজ স্বার্থে এখানকার রাজনৈতিক স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখে ভিতরে ভিতরে আর্থ-সামাজিক কাঠামোটিকে অন্তঃসারশূন্য করে দিয়েছে।

৭০.৮ অনুশীলনী

ক। বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। কোন দুই শক্তি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে ব্যবহার করেছিল?

২। ফিলিপাইনের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্রটির নাম লিখুন।

৩। আমেরিকা থেকে নিয়ে আসা কোন কৃষিজ পণ্যের চাষ ফিলিপাইনে শুরু হল?

৪। স্পেন ফিলিপাইন ত্যাগ করে কত সালে?

৫। আমেরিকার শাসনের সূচনা কত সালে হয়?

৬। থাইল্যান্ডে বাণিজ্যকারী বিদেশী কোম্পানিগুলির নাম লিখুন।

৭। থাইল্যান্ডের জনসংখ্যার শতকরা কত ভাগ চীনা বাস করতেন?

খ। সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

১। ঔপনিবেশিক শাসনকালে ফিলিপিন সমাজে কৃষকদের অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করুন।

অতিরাষ্ট্রিক অধিকার অর্জন করল। পরবর্তীকালে ফরাসি প্রাধান্য হ্রাস পায় ও ওলন্দাজরা শ্যামদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বলাভ করে। ১৬৮৮ খ্রিঃ তারা চামড়া ও টিন রপ্তানির উপর একচেটিয়া অধিকার পেল।

৭১.৫ থাইল্যান্ডের বিদেশী প্রভাবিত অর্থনীতি

ঊনবিংশ শতক থেকে শ্যামদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিদেশী প্রাধান্য প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা দরকার যে শ্যামদেশে সে সময় তারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রেখেছিল। যাইহোক, ১৮৭০ খ্রিঃ সুয়েজ খাল উন্মুক্ত হওয়ার পর শ্যামদেশ ইউপোরীয় কোম্পানিগুলির সঙ্গে রপ্তানি বাণিজ্যে অংশ নেয়। ব্রিটিশ ফার্মগুলি টিনের খনি ও কাঠের ব্যবসায়ে অতরন্ত উৎসাহী ছিল। এসময় বহুসংখ্যক ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ১৮৯৬ খ্রিঃ ব্রিটেন ও ফ্রান্স শ্যামদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। কিন্তু অর্থনৈতিক দিকে থাইল্যান্ডকে ব্রিটিশ মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করা হ'ল। বিদেশী বিনিয়োগের সুবিধার জন্য সর্বক্ষেত্রেই পাশ্চাত্যকরণের প্রচেষ্টা শুরু হ'ল। থাইল্যান্ড স্বেচ্ছায় বিদেশী শক্তিগুলির সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক ও বিচার বিভাগে পরিবর্তন আনল। বণিক ও মিশনারীদের অনেক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হ'ল। বসবাসকারী ইউরোপীয়রা শ্যামদেশীয় বিচারব্যবস্থায় আওতার বাইরে থাকল।

১৯০৯ খ্রিঃ শ্যামদেশে রেলপথ বিস্তারের জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ চার মিলিয়ন পাউন্ড ঋণ দিল। ইউরোপীয়রা জাহাজ, টিন, সেগুন কাঠ, পরিবহন, ব্যাঙ্কিং ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবসায় উৎসাহী ছিল। তারা বিভিন্ন ধরনের পণ্য বিনিময়ের ব্যবসাতেও নিযুক্ত ছিল। ১৯৩৮ খ্রিঃ ব্রিটেন থাইল্যান্ডে তেরো মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ করে। ১৯৩১ খ্রিঃ শ্যামদেশের মোট শিল্পের ৯৫% ছিল ইউপোরীয় ও চৈনিকদের হাতে।

৭১.৬ থাই অর্থনীতিতে চীনাদের ভূমিকা

চৈনিকরা ছিল শ্যামদের মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ। এরা এখানকার অর্থনৈতিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। চালের বাজার প্রায় এদের দখলে ছিল এবং চালকলগুলি ছিল এদের মালিকানাধীন। রবার চাষ ও বাজারজাত করা ছিল প্রায় এদের একচেটিয়া। বহু চৈনিক মহাজনী সুদের কারবার করত। টিনের খনিগুলিতেও বহুসংখ্যক চৈনিক কাজ করত। বিদেশ বাণিজ্যেও তারা উৎসাহী ছিল। আফিং চোরাচালান মোটামুটি

২। থাইল্যান্ডের অর্থনীতিতে চীনদের ভূমিকা কীরূপ ছিল?

৩। থাইল্যান্ডে বিদেশী শক্তির সহায়তায় শিল্পোন্নয়নের সংক্ষিপ্ত চিত্র দিন।

গ। রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

১। বিংশ শতাব্দীতে শ্যামদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সেখানের অর্থনীতিকে পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে কি রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল? এ বিষয়ে আপনার মতামত আলোচনা করুন।

২। শ্যামদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন।

৩। ঔপনিবেশিক শাসনকালে ফিলিপিন্স দ্বীপের আর্থ-সামাজিক চিত্র প্রস্তুত করুন।

৭০.১১ গ্রন্থপঞ্জী

1. D.G.E. Hall, A History of Southeast Asia, Macmillian, London 1970
2. J.F. Cady, Southeast Asia : Its Historical Development (1964, America).
3. Brian Harrison, Southeast Asia, A short History (London, 1963).
4. Lea E. William Southeast Asia, A History, Oxford University Press 1976.

একক ৭২ ❑ ঔপনিবেশ শাসনাধীন ইন্দোচীনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপরেখা

গঠন

৭২.০ উদ্দেশ্য
৭২.১ প্রস্তাবনা
৭২.২ ইন্দোচীনের বৈদেশিক শাসন
৭২.৩ ফরাসি নিয়ন্ত্রিত ইন্দোচীনের কৃষি অর্থনীতি
৭২.৪ ইন্দোচীনে সামাজিক অবস্থা
৭২.৫ সারাংশ
৭২.৬ অনুশীলনী
৭২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৭২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনারা ফরাসি ইন্দোচীনের ঔপনিবেশিক শাসনকালের যে বৈশিষ্ট্যগুলিকে পৃথক করতে পারবেন তা হল :

- ইন্দোচীনে ফরাসী বাণিজ্যিক সতর্কতা।
- ইন্দোচীনের নিজস্ব শিল্পায়নের পথে ফরাসী প্রতিবন্ধকতা।
- স্থানীয় শিল্প ও কৃষির বিনাশ।
- সার্বিক উন্নয়নের অপ্রতুলতা।

৭২.১ প্রস্তাবনা

ঔপনিবেশিক শাসনকালে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্র প্রস্তুত করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতিটি পাশ্চাত্য রাষ্ট্র বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্যিক আধিপত্য

প্রতিষ্ঠা করছে এবং প্রয়োজনভিত্তিক কার্যকলাপ চালাচ্ছে ফলশ্রুতিতে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো। উপর থেকে কিছু উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর প্রলেপ লাগানো হলেও প্রকৃতপক্ষে দ্বীপপুঞ্জে কোন প্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। ইন্দোচীনও এইসব ঔপনিবেশিক শাসনকালীন লক্ষণ থেকে মুক্তি ছিল না। এখানেও বিনষ্ট হল গ্রামীন কৃষি, শিল্প ইউরোপীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনের তাগিদে।

৭২.২ ইন্দোচীনের বৈদেশিক শাসন

ফ্রান্সের কাছে ইন্দোচীন ছিল তার নিজস্ব অর্থনীতি বিকাশের ক্ষেত্রমাত্র। ফ্রান্সের শিল্প বিকাশের জন্য ইন্দোচীনের লোকশক্তি, পণ্য, সম্পদ, ব্যবহার করা হয়েছিল। ফরাসি উৎপাদকরা ইন্দোচীনের বাজার দখল করতে উৎসাহী ছিল এবং ইন্দোচীনের মধ্যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী শিল্প-কারখানা বা কৃষির বিকাশের বিরোধী ছিল তারা।

ফরাসিরা অত্যন্ত সতর্ক ছিল তাদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে। ফরাসি মূলধন ছাড়া অন্য কোন মূলধন ইন্দোচীনে অনুপ্রবেশের অনুমতি পেত না। দেশীয় লোকজনের ফরাসি অর্থনৈতিক আগ্রাসন রোধ করার মত ক্ষমতা, উদ্যোগ, অর্থ কিছুই ছিল না। ইন্দোচীনে লোহা, কয়লা ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্য ছিল, সস্তা শ্রমিক ছিল— শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত ইন্দোচীনে যে একেবারে ছিল না তা নয়— কিন্তু ফরাসি অর্থনৈতিক স্বার্থ ছিল এই শিল্পায়নের পথে বিরাট বাধা। ইন্দোচীনের নিজস্ব শিল্পায়ন তো সম্ভব ছিলই না উপরন্তু তার নিজস্ব বেতের কাজ, সুতীসিল্ক বয়ন শিল্প, কাঠের কাজ ধীরে ধীরে নষ্ট হতে থাকল।

৭২.৩ ফরাসি নিয়ন্ত্রিত ইন্দোচীনের কৃষি অর্থনীতি

প্রথম দিকে ফরাসিরা কিছুটা উদারনীতি অনুসরণ করলেও পরবর্তীকালে তাদের নীতি পরিবর্তিত হয়। ইন্দোচীন থেকে রপ্তানি করা পণ্যের উপরেও ফরাসি সরকার চড়া হারে শুল্ক দাবি করে। ১৯১৪-১৮ খ্রিঃ মধ্যে ইন্দোচীনের অর্থনৈতিক বিকাশ অত্যন্ত ধীর গতিসম্পন্ন ছিল। ফরাসিরা ইন্দোচীনে রবার, চাল, চা চাষে উদ্যোগ নেয়। পূর্ব কোচিন চীনে ১৯১২ খ্রিঃ নাগাদ রবার চাষ শুরু হয়। ইন্দোচীনে বসবাসকারী ফরাসিরাই প্রথমদিকে রবার চাষে বিনিয়োগ করত— এবং এক্ষেত্রে উল্লেখ করা দরকার যে রবার চাষের জন্য জমি পাওয়া ফরাসিদের পক্ষেই সহজ ছিল। অন্যরা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল বলা যেতে পারে। এর ফলস্বরূপ চীনা বা অন্যান্য ইউরোপয়ী দেশগুলি রবার চাষে ঢুকতে পারে নি। তবে অল্পসংখ্যক স্থানীয় অধিবাসী রবার চাষের সঙ্গে যুক্ত

ছিল। ১৯২৪ খ্রিঃ পর ইন্দোচীনের বাইরে ফরাসি মূলধন, ইন্দোচীনে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। এই অর্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রবার শিল্পে বিনিয়োগ করা হয়।

রবার চাষ অবশ্য স্বচ্ছন্দে বিকাশলাভ করে নি। রবার চাষে ব্যয় ছিল প্রচুর, উপরন্তু দূর থেকে আসা শ্রমিকরা প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ত। বাড়ির জন্য তাদের পিছুটানও ছিল প্রবল। মন্দার ফলে ইন্দোচীনের রবার শিল্প মার খায়। ১৯২৯ খ্রিঃ রবারের যা দাম ছিল ১৯৩১ খ্রিঃ সেই দাম $^{১}/_{৫}$ এ দাঁড়ায়। পরে অবশ্য ফ্রান্সে রবারের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে ইন্দোচীনে রবার শিল্প পুনর্জীবন লাভ করে। ১৯২৯-১৯৩৮ খ্রিঃ মধ্যে রবার রপ্তানি ছয় গুণ বৃদ্ধি পায়। রবার শিল্পে বিকাশের জন্য ব্যাঙ্ক ও সরকারি সাহায্যেরও ব্যবস্থা করা হয়।

রবার ছাড়া ধান ছিল অপর গুরুত্বপূর্ণ পণ্য। ধান চাষে বেশ ভালো পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছিল। রপ্তানি পণ্য হিসাবে ধান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেকং বদ্বীপে সাধারণত প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়ে থাকে। ধান চাষের উন্নতির জন্য সেচব্যবস্থা, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি করা হ'ল। ১৮৭০-১৯৩০ খ্রিঃ সময়কালের মধ্যে ধানচাষের পরিমাণ চারগুণ বৃদ্ধি পায়। বছরে ১.৫ মিলিয়ন টন চাল উদ্বৃত্ত উৎপাদন হ'ল এবং চাল এসময় মূল রপ্তানী পণ্যে পরিণত হ'ল। ১৯২০ খ্রীঃ পর ধান চাষে বিদেশী মূলধনের অনুপ্রবেশ ঘটে। ১৯৩৭ খ্রিঃ নাগাদ ইন্দোচীন চাল রপ্তানি করত প্রায় দুই মিলিয়ন টন। তবে এই চাল ছিল ব্রহ্মদেশ বা শ্যামদেশের চালের থেকে নিকৃষ্টমানের।

১৯২৯-১৯৩০ খ্রিঃ মধ্যে বিশ্বব্যাপী মন্দার সময়ে ইন্দোচীনের অর্থনৈতিক বিকাশ ব্যাহত হয়। তবে পরবর্তীকালে, ১৯৩৬ খ্রিঃ পর আবার নতুন বিনিয়োগ ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইন্দোচীনের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন শুরু হয়। মন্দার পর ফ্রান্সে ইন্দোচীনের চাল ও মেইজ বা ভুট্টা জাতীয় পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

ঔপনিবেশিক শক্তি ইন্দোচীনের গ্রামাঞ্চলকে মহাজনদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছিল। ১৯১৪ খ্রিঃ 'এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট অর্গানাইজেশন' গঠন করা হয়। এর ফল অবশ্য খুব একটা লাভজনক হয়নি। গ্রামবাসীর মহাজনদের উপর নির্ভরতা কমানো যায় নি। মহাজনদের হাতে যাতে জমির মালিকানা চলে না যায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছিল— তবে এক্ষেত্রে সাফল্য ছিল অত্যন্ত সীমিত।

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ইন্দোচীনে ফরাসি মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। খনিজ শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা, অরণ্য, বাগিচা শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ প্রাধান্য পায়। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাতেও এসময় অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। ঔপনিবেশিক শক্তি আমদানি ব্যবসাতেও নিযুক্ত ছিল। ইন্দোচীনে বসবাসকারী ফরাসিদের চাহিদার উপর নির্ভর করেই মূলত বিভিন্ন পণ্য আমদানি করা হত। মেশিন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, যানবাহন, জ্বালানী তেল, কাগজ ও মদ ইত্যাদির চাহিদা ছিল প্রচুর। আমদানি পণ্যের উপর প্রয়োজন অনুসারে চড়া হারে শুল্ক চাপান হত।

ঔপনিবেশিক শক্তির শাসনাধীন ইন্দোচীনের অর্থনৈতিক অবস্থা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য পরাধীন দেশগুলি থেকে স্বতন্ত্র কিছু ছিল না। বাহ্যত স্থানীয় মানুষদের স্বার্থে যে সকল পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল সেগুলি ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য।

৭২.৪ ইন্দোচীনের সামাজিক অবস্থা

ফরাসি শাসনাধীন ইন্দোচীনে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে চৈনিক ইউরোপীয়রাও বাস করত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে ভারতীয়দের অস্তিত্ব লক্ষ্যণীয় হলেও এখানে তাদের অস্তিত্ব সেভাবে লক্ষ্য করা যায় না।

ইন্দোচীনে ইউরোপীয়দের মধ্যে বিশেষ করে ফরাসিরা যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল। প্রায় ২,২০০ জন ইউরোপীয় বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং, বীমা, পরিবহন ব্যবস্থায় নিযুক্ত ছিল। বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে এখানে প্রায় ৬২৯ জন মিশনারীর সন্ধান পাওয়া যায়। এরা মূলত ধর্মপ্রচারে জন্য এখানে এসেছিল। এখানে বসবাসকারী ইউরোপীয়রা অর্থনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট স্বচ্ছল ছিল। চাকরি ও বাণিজ্য সূত্রে অর্জিত অর্থ অধিকাংশ সময়েই নানাভাবে ও নানাসূত্রে স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হত।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত ইন্দোচীনেও বহুসংখ্যক চীনা বসবাস করত এবং নানা ধরনের অর্থনৈতিক কার্যবিলীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। কোচিন চীনে ৪/৫ চৈনিক বাস করত। এরা খুব সাধারণ জীবনযাপন করত এবং স্থানীয় ভাষায় এরা ছিল খুব স্বচ্ছন্দ দেখা গিয়েছে বসবাসকারী চিনারা মোটামুটি তৃতীয় প্রজন্মে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে প্রায় মিশে যেত। তবে এদের আর্থিক স্বাচ্ছল্য ও প্রতিপত্তি অনেক সময়েই স্থানীয় অধিবাসীদের ঈর্ষার কারণ ছিল। চীনাদের গোপন সমিতিগুলি খুবই সক্রিয় ছিল— এবং প্রায়শই এরা সরকারি রীতি, নিয়ম, আইন মেনে চলার তোয়াক্কা করত না। ১৯৩১ খ্রিঃ ইন্দোচীনে চৈনিকদের সংখ্যা ছিল ৪২০,০০০ মন্দার সময় অবশ্য বহু সংখ্যক চীনা স্বদেশে ফিরে যায়।

কিছু সংখ্যক স্থানীয় অধিবাসী পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ পেলেও এরা সরকারি চাকরি থেকে বঞ্চিত ছিলেন। এজন্য এরা যথেষ্ট ক্ষুব্ধ ছিলেন। পার্বত্য অঞ্চলের মোই উপজাতিরা ফরাসি শাসনে সরাসরি প্রভাবিত হয়েছিল। এরা মুলত রাই চাষ করত—ঔষধি ও বনজ বিলাশ পণ্য বিক্রি করে এরা জীবিকা নির্বাহ করত। ফরাসিরা এই মোই উপজাতি অধ্যুষিত প্রত্যন্ত অঞ্চলেও প্রবেশ করল। এখানে এরা সামরিক ছাউনি তৈরি করে। কাজের জন্য এখানে টংকিং থেকে আগত শ্রমিকদের নিয়ে আসা হ'ল। প্রশাসনিক প্রয়োজনে নিম্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে আসা হ'ল। নতুন অর্থনীতি মোইদের বিভ্রান্ত করে দিল। তাদের পুরোনো ব্যবসা প্রচণ্ডভাবে মার খেয়ে

যায়। তাদের রাই চাষের জমি রোপণ অর্থনীতির জন্য নেওয়া হল। কখনও কখনও ফরাসিরা তাদের বাধ্য করল জঙ্গল পরিষ্কার করে জমি হাসিল করে দিতে।

ঔপনিবেশিক শাসনে স্থানীয় অধিবাসী ও ইউরোপীয়রা বহুকাল একত্রে বসবাস করলেও দুই গোষ্ঠী ছিল দুই মেরুর বাসিন্দা। এদের মধ্যে কোন সামাজিক লেনদেন ও সম্পর্ক প্রায় ছিল না বললেই চলে। ঔপনিবেশিক শক্তি তার শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে অতি সচেতন ছিল বললে বোধ হয় অতিকথন হয় না।

৭২.৫ সারাংশ

উপরিউক্ত এককটি আলোচনা করে যে চিত্রটি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল ইন্দোচীনে ফরাসী শক্তি তাদের বাণিজ্যিক একাধিপত্য বিষয়ে খুবই সচেতন ছিল। এর ফলে অন্য কোন বাণিজ্যিক শক্তি এখানে প্রবেশ করতে পারেনি একই সঙ্গে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল ইন্দোচীনের নিজস্ব শিল্প বেত, দারু, বয়ন প্রভৃতি শিল্পগুলি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল দেশীয় কৃষি।

সম্পূর্ণ পর্যায়টি আলোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি ঔপনিবেশিক শাসন এই উপদ্বীপ অঞ্চলের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। এর ফলে ব্যাহত হয় সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নতি, লঙ্ঘিত হয় মানব অধিকার। অন্যদিকে সৃষ্টি হয় অনেক সামাজিক ব্যাধি ও সমস্যা যা ঔপনিবেশিক শাসনের আবশ্যিক উপজাত যেমন জাতি-উপজাতি অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই ঐতিহাসিক ক্ষত আজও মাঝে মাঝে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দেশগুলির মধ্যে প্রতীয়মান হয়।

৭২.৬ অনুশীলনী

ক। বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। মোই উপজাতি কোথাকার বাসিন্দা ছিল?

২। ইন্দোচীনের নিজস্ব শিল্পগুলি কি?

৩। এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট অরগানাইজেশন কবে গঠিত হয়?

৪। ইন্দোচীনে মিশনারীদের সংখ্যা কত ছিল?

৫। মোই উপজাতির প্রধান কৃষিজ পণ্যটির নাম লিখুন।

খ। সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

১। ইন্দোচীনে বৈদেশিক শাসনের সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রস্তুত করুন।

২। মোই উপজাতির জীবিকা ও ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করুন।

৩। ক্রেডিট এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশনের উদ্দেশ্য কি ছিল?

গ। রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

১। ফরাসি শাসনাধীন ইন্দোচীনের অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

৭২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। D.R. Sardesai, South-East Asia-Past and present, Vikas Publishing House, 1982.

২। D.G.E. Hall, A History of South-east Asia, Macmillan, London, 1970.

৩। Lea E. William, Southeast Asia, A History Oxford University Press 1976.

একক ৭৩ ☐ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উপমহাদেশে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এবং ব্রহ্মদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

গঠন

৭৩.০ উদ্দেশ্য

৭৩.১ প্রস্তাবনা

৭৩.২ জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বীজ বপন

৭৩.২.১ জাতীয়তাবাদের প্রসার

৭৩.২.২ নতুন শক্তিরূপে জাতীয়তাদ

৭৩.২.৩ সামগ্রিক ফলাফল

৭৩.২.৪ জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রভাব

৭৩.২.৫ সাম্রাজ্যবাদী ভাবধারার বিকাশ

৭৩.২.৬ ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা

৭৩.৩ ব্রহ্মদেশে জাতীয়তাবাদের সূচনা

৭৩.৩.১ থুগী ব্যবস্থা

৭৩.৩.২ মিত্ত থুগী ব্যবস্থা

৭৩.৪ অর্থনৈতিক অসন্তোষ

৭৩.৪.১ কৃষিপ্রথায় পরিবর্তন

৭৩.৪.২ বর্মা— চাল রপ্তানির কেন্দ্র

৭৩.৪.৩ শ্রমিক অসন্তোষ

৭৩.৪.৪ শহরকেন্দ্রিক অর্থনীতি

৭৩.৫ বৌদ্ধধর্মের ভূমিকা

৭৩.৫.১ বৌদ্ধ সংঘগুলির ভূমিকা

৭৩.৫.২ সাংস্কৃতিক বিবর্তন

৭৩.৫.৩ বৌদ্ধ সংঘের মর্যাদা হানি

৭৩.৬ ব্রহ্মের জাতীয়তাবাদী সংস্থাগুলি
    ৭৩.৬.১ **Y.M.B.A.**'র দাবী
    ৭৩.৬.২ বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন
৭৩.৭ ১৯৩০ সালের অর্থনৈতিক মন্দা
    ৭৩.৭.১ সায়াসেনের অভ্যুত্থান
৭৩.৮ ব্রহ্মের জাতীয়তাবাদের জাপানী সমর্থন
    ৭৩.৮.১ স্বাধীনতার পথে যাত্রা
    ৭৩.৮.২ ফ্যাসীবাদ বিরোধী গণসংগঠনের ভূমিকা
    ৭৩.৮.৩ অর্থনৈতিক পরিবর্তন
    ৭৩.৮.৪ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও ব্রহ্মের স্বাধীনতা লাভ
৭৩.৯ সারাংশ
৭৩.১০ অনুশীলনী
৭৩.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৭৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি অধ্যয়ন করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উপমহাদেশে জাতীয়তাবাদী জাগরণের পর্যায়গুলি আপনারা জানতে পারবেন। এই এককে যে বিষয়গুলি খুঁজে পাওয়া যাবে তা হ'ল—

- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাতীয়তাবাদী চেতনা উন্মেষের কারণ।
- ব্রহ্মদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং তার বিভিন্ন পর্যায়ে।
- জাতীয়তাবাদের মূলে ধর্মের প্রভাব।
- বৌদ্ধ সংঘের ভূমিকা।

৭৩.১ প্রস্তাবনা

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নামকরণ থেকেই 'জাতীয়তাবাদ' এই শব্দটি এই অঞ্চলের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে চলেছে। একদিনেই অপ্রত্যাশিতভাবে জাতীয়তাবাদের বা জাতীয়তাবোধের জন্ম হয়নি, এর পিছনে রয়েছে বহু বৎসরের সযত্নলালিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবাসীর আশা, আকাঙ্খা, ব্যথা-বেদনা, হতাশা এবং সর্বোপরি বিদেশী বিধর্মী সাম্রাজ্যবাদী অশুভ শক্তির হাত থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবাসী তাদের নিজস্ব শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের ধারা বজায় রাখার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই জাতীয়তাবাদ জন্ম নেয়।

৭৩.২ জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বীজ বপন

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কোন পন্ডিত, ঐতিহাসিক বা কারো পক্ষেই কোন নির্দিষ্ট ধারার মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আরো ও আশ্চর্যের বিষয় হল জাতীয়তাবাদ প্রসূত ভাবধারার প্রথম বীজ বপন হয় অষ্টাদশ শতকের ইউরোপে, উনবিংশ শতকে তা বিকশিত হয় এবং বিংশ শতকে সামগ্রিকভাবে পরিপূর্ণতা পায়।

৭৩.২.১ জাতীয়তাবাদের প্রসার

এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, আমেরিকার বেশ কিছু অংশে মেধাবী ব্যক্তিরা ইওরোপীয় ভাবধারায় শিক্ষিত হয় এবং নিজ নিজ দেশে এই ধরনের শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হয়। এই পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রসূত ভাবধারাই পরবর্তীকালে সাম্যবাদ, আন্তর্জাতিক আন্দোলন এবং ঔপনিবেশিক সংকীর্ণ স্বার্থের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রেরণা যোগায়।

৭৩.২.২ নতুন শক্তিরূপে জাতীয়তাবাদ

এখন প্রশ্ন হলো উদ্ভুত জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উন্মেষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনসাধারণের নিকট কি নতুন শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে? বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইনস, থাইল্যান্ড যেদিকেই তাকাই, সেখানেই অশুভ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হস্তক্ষেপ দেখা যায়। বার্মার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন, ভিয়েতনামের চীনা শাসন, স্পেনের ঔপনিবেশিক ছায়া বিস্তার ফিলিপাইনের ক্ষেত্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত করেছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক সাম্য, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং স্বশাসনের দাবীতে জনগণ সোচ্চার হয়ে ওঠে। উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি অবশ্য প্রাথমিক পর্যায়ের সামন্ততান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। আবার আধুনিক জাতীয়তাবাদী ভাবধারার ক্ষেত্রে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রধান উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

৭৩.২.৩ সামগ্রিক ফলাফল

প্রতিটি ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য রীতিনীতি, ভাবধারা, আইন, শিক্ষা, অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন শুধুমাত্র চিরাচরিত আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ভিত্তিমূলেই কুঠারঘাত করেনি, চিরাচরিত জীবনধারাও স্তব্ধ করেছিল।

৭৩.২.৪ জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রভাব

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতীয়তাবাদের উন্মেষের ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি প্রধান উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে ডাচ স্কলার বলেছেন, As the Dutch Scholar W.F. Wertheim ascrted “Western education had the effect of dynamite upon the colonial status system”. এই পাশ্চাত্য শিক্ষা

এদের জ্ঞানচক্ষু প্রসারিত করে, মনের সংকীর্ণতা দূর করে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের অমলিন বন্ধনে জাতীয়তাবোধের উন্মেষে সাহায্য করে। সর্বোপরি, নিজস্ব ঐতিহ্য ও স্বকীয়তা বজায় রেখে পুরানো বোতলে নতুন মদের আস্বাদ গ্রহণে সাহায্য করে।

৭৩.২.৫ সাম্রাজ্যবাদী ভাবধারার বিকাশ

শুধুমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, প্রশাসনিক ও গুরুত্বপূর্ণ সামরিক শক্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ প্রসৃত ভাবধারা বিশেষভাবে কাজ করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, ১৮৯৯-এ চীনা সাফল্য বক্সার বিদ্রোহের ক্ষেত্রে, ১৯০৫-এ জাপানের রাশিয়া বিজয় আবার ১৯১১-এ চীনে মাঞ্চু রাজবংশের পতন ও চীনা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সর্বোপরি চীনা জনবাদী নেতা সান-ইয়াৎ-সেনের (KMT) বা কুয়োমিন্টাং দলের উত্থান সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবাসীকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

৭৩.২.৬ ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের উত্থান

এদিকে ১৮৮৫-তে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উত্থান ও গান্ধীজীর ভারতীয় রাজনীতিতে অনুপ্রবেশে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দকে এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। বহু জাতীয়তাবাদী নেতা জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেয় এমনকি, অনেকে গান্ধী ও নেহেরুর সঙ্গে পরামর্শ করে সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দেয়। এছাড়াও উড্রো উইলসনের চোদ্দ দফা দাবী, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, হো-চি-মিনের ভিয়েতনামী সাম্যবাদী আন্দোলন সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে নিজস্ব চেতনা ও গণবাদী শক্তির উত্থানে জড়িয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে।

৭৩.৩ ব্রহ্মদেশে জাতীয়তাবাদের সূচনা

জাতীয়তাবাদের উন্মেষ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখ্য ঘটনা। অষ্টাদশ শতকের শেষে ও উনবিংশ শতকের প্রথমে বার্মায় ব্রিটিশ শক্তি আধিপত্য বিস্তার করে। তৎকালীন বার্মার রাজন্যবর্গের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে ব্রিটিশদের সঙ্গে বর্মীদের তিনটি যুদ্ধ হয়। ১৮২৫-এ প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধে বার্মা পরাজিত হয়, আরাকান ও টেনাসেরিম অঞ্চল দুটি হারায়। ১৮৫২-তে দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধে বার্মা পেগু ও বেসিন অঞ্চল দুটি হারায়। অবসেষে ১৮৮৫-তে তৃতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধে বাকি অঞ্চল ইংরেজদের হস্তগত হয়। ব্রিটিশদের হাতে চলে যাওয়ায় বার্মার রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই বিশেষ পরিবর্তন ঘটে।

৭৩.৩.১ থুগী প্রথা

১৮৮৬-তে ভারত থেকে প্রাদেশিকভাবে সংযুক্তির পর বার্মার পুরোনো অবাধ নীতিও ব্রিটিশদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়। সমগ্র বার্মার ওপর কেন্দ্রীয় প্রাধান্য লক্ষ্যে রেঙ্গুন সচিবালয়কে জেলা প্রশাসনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং ভারত সরকারকে প্রাদেশিক শাসনভার অর্পণ করা হয়। কিন্তু বার্মার জনগণ এই আধিপত্য মেনে নিতে অস্বীকার করে। সমগ্র রাজপরিবারে মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা যায় সিংহাসনকে কেন্দ্র করে। বর্মী. সামাজিক কাঠামোয় থুগি ছিল জেলা প্রশাসনের প্রধান। তারাই এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয়। অবশেষে নিম্ন বার্মাতে বিদ্রোহ প্রবল হয়ে ওঠে। প্রায় ৩২০০ সামরিক ও প্রশাসনিক বাহিনী প্রেরণ করা হয়।

৭৩.৩.২ মিওথুগী ব্যবস্থা

তবে ব্রিটিশরা উচ্চবার্মাতে ১৮৮৭-তে Burma Village Regulation Act ও ১৮৮৯-তে সামগ্রিকভাবে Burma Village Act of 1889 প্রবর্তন করে। এই নিয়মানুসারে প্রাক-ব্রিটিশ যুগের মিওথুগী বা থাইকথুগীর ওপর রাজস্ব সংগ্রহ ও আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে পূর্বেকার ক্ষেত্রে এরা যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করত তা কেড়ে নেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে Mr. J.S. Furnirall-এর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রয়োজন। Furnirall-এর দৃষ্টিভঙ্গীকে অনুসরণ করে বলা যায় যে, এই নতুন প্রথা প্রবর্তনের দরুন প্রাক্-ব্রিটিশবর্মী স্বায়ত্তশাসন-ই ব্রিটিশ প্রবর্তিত "Foreign Legal System"-এ রূপান্তরিত হয়েছে। এবং মওথুগী স্থানীয় স্বায়ত্ত প্রশাসক হলেও তার কাজের ওপর মিও-ওক যথেষ্ট খবরাখবর রাখত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ব্রিটিশ প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীকরণ বা কেন্দ্রীভূত শাসনরীতির প্রবণতা বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

৭৩.৪ অর্থনৈতিক অসন্তোষ

ব্রিটিশরা আসার পর বার্মার কৃষি কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্ত ঘটে। তারা অনাবাদী চাষযোগ্য জমিকে উর্বর জমিতে পরিণত করতে উদ্যত হয়। ১৮২০-তে প্রথম কৃষি দপ্তর খোলা হয়। ১৯০৭-এ মান্দালয়ে কৃষি গবেষণাগার খোলা হয়। এই কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে কৃষি ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন ও কিভাবে উচ্চফলনশীল ধান উৎপন্ন করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হত। ব্রিটিশরা রায়তওয়ারী প্রথাও চালু করে। যাতে কৃষকরা নিয়মিত রাজস্ব প্রদান করে সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হয়।

৭৩.৪.১ কৃষিপ্রথার পরিবর্তন

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে বার্মার কৃষি ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই সময়ে বিশেষ করে ইওরোপীয় দেশগুলি ছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বৈদেশিক

বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৮৫০-এর দশকে ভারতের সিপাহী বিদ্রোহের পর, এবং ১৮৬০-এর দশকে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পর এই সমস্ত দেশগুলিতে চাহিদা দেখা যায় চালের। আবার ১৮৬৯-এ সুয়েজ খাল উন্মুক্ত হলে ইংল্যান্ড তথা পশ্চিম ইওরোপীয় বহু দেশ-ই বার্মার সঙ্গে চাল আমদানি-রপ্তানী বাণিজ্যে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

৭৩.৪.২ বর্মা—চাল রপ্তানীর কেন্দ্র

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগে বার্মার চাল রপ্তানীর পাঁচটি বৃহৎ কেন্দ্র ছিল— যথাক্রমে ইউরোপের দেশগুলি ভারত, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি, চীন, জাপান এবং অন্যান্য বহু রাষ্ট্র। প্রধানত ইউরোপীয় কোম্পানীগুলি ছিল চাল ব্যবসার প্রধান অংশীদার। আবার বার্মার চাল ব্যবসায়ীরাও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আফ্রিকাতে চাল রপ্তানী করতে থাকে। যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জামনীর সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলা বার্মার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে জামনী বার্মার চাল বাণিজ্যের প্রধান ক্রেতা হয়ে ওঠে। তবে ভারতীয় ও ইওরোপীয় কোম্পানিগুলি ধান উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, আমদানি-রপ্তানী করণে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কাল পর্যন্ত বর্মী কৃষকরা দক্ষিণ ভারতীয় ঋণদাতা চেতয়ারদের বা চেট্টিয়ার নিকট হতে প্রায় ৫০% শতাংশ হারে ঋণ গ্রহণ করত।

৭৩.৪.৩ শ্রমিক অসন্তোষ

আবার ব্রিটিশ শাসনকালে বার্মার কৃষি কাঠামো সচল রাখতে উপযুক্ত শ্রমিকেরও অভাব হয়নি। অধিকাংশ দক্ষ শ্রমিক ছিল ভারত ও ব্রিটিশ নাগরিক। এই সময় উচ্চ বার্মা থেকে নিম্ন বার্মাতে জনগণ অধিকতর সুযোগ-সুবিধার সন্ধানে অনুপ্রবেশকরে। এবং সেখানে তারা চালকলের কুলি, গৃহভৃত্য হিসাবে কাজ করে থাকে। বার্মাতে ভারতীয় কৃষি কলোনী গড়ে ওঠে। এর দরুন দেখা যায় বার্মার দেশীয় শ্রমিকেরা অর্থনৈতিক অবরোধের শিকারে পরিণত হয়। এমনকি British Indian Steam Navigation Company-এর প্রতিপক্ষ হিসাবে Asiatic Steam Navigation Company গড়ে ওঠে। সুতরাং বার্মার জনগণ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

৭৩.৪.৪ শহরকেন্দ্রিক অর্থনীতি

তথাপি বার্মা স্থবির অর্থনীতি থেকে ধীরে ধীরে শহরভিত্তিক গতিশীল অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৮৭৭-এর মে মাসে সর্বপ্রথম বার্মায় ১৬৩ মাইল রেলপথ স্থাপিত হয়। আবার ১৮৯৪-তে মান্দালয় পর্যন্ত আর একটি রেলপথ চালু করা হয়। যেহেতু ভারতীয়রা আধুনিক বিজ্ঞান, শিল্প, কারিগরী ও প্রযুক্তি বিদ্যার সঙ্গে আগেই পরিচিত ছিল, ফলে বার্মার শিল্পায়নে অংশগ্রহণ করতে এদের কোন অসুবিধাই হয়নি। সুতরাং বার্মার স্থানীয় মানুষের এই কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ কম ছিল। এর ওপর ১৯৩০-এর বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা বার্মার জাতীয়তাবাদ উন্মেষের ক্ষেত্রকে আরো উর্বর করে তোলে।

৭৩.৫ বৌদ্ধধর্মের ভূমিকা

বৌদ্ধধর্ম ব্যতিরেকে বর্মার জাতীয়তাবাদের ইতিহাস আলোচনা করা সম্ভব নয়। ধর্ম বিশেষ করে বৌদ্ধধর্ম বার্মার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বিশেষভাবে ত্বরান্বিত করেছিল। কেননা প্রতিটি মানুষেরই নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রতি টান থেকে যায়। এবং এগুলি জাতীয়তাবাদী মনোভাব সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

বার্মার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সমগ্র বার্মায় রাজশক্তির সমান্তরাল বৌদ্ধধর্ম অবস্থান করত। স্বয়ং রাজাই বৌদ্ধ সংঘের প্রধান বা Thathana bang-এর নির্দেশে পরিচালিত হয়। বর্মী সমাজ ব্যবস্থায় পরিবার এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্য ছাড়া ও বৌদ্ধ সংগঠন ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। স্থানীয় প্যাগোডা নির্মাণ এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সাহায্য প্রদানের ব্যাপারটিকে প্রশংসনীয় কার্যকলাপ হিসাবে গণ্য করা হত।

বার্মার ঐক্যের ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে যদিও বৌদ্ধ সংঘের মধ্যে জাতিগত দ্বন্দ্ব ও ঈর্ষা বর্তমান ছিল তবুও সমগ্র উপজাতি অধ্যুষিত বার্মা বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে একই ছত্রতলে উপনীত হয়। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে বার্মায় সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

৭৩.৫.১ বৌদ্ধ সংঘগুলির ভূমিকা

বিশেষ করে বার্মার শিক্ষাব্যবস্থা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ সংঘের বিশেষ ভূমিকা ছিল। সাত বছর বয়স থেকে পরিপূর্ণ যৌবন পর্যন্ত বার্মায় ছেলেরা মঠে শিক্ষালাভ করত। পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি প্রাচীন ভাষা, সাহিত্য, বুদ্ধের জীবনী আলোচনা করত। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, পশ্চিমী ভাবধারা ও শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত হওয়ার ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় সেখানে ধর্ম দ্বারা পরিচালিত ধর্ম নিরপেক্ষ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ে। অর্থাৎ নয়া শিক্ষাব্যবস্থার চাহিদা বাড়তে থাকে। কিন্তু একে আমরা জাতীয়তাবাদে বিপরীত স্রোত বলতে পারি না। নয়া চিন্তা-ভাবনার আলোকে শিক্ষিত বর্মীরা তাদের সংস্কৃতি এবং সৃষ্টিকে আরো যুগোপযোগী করে তোলে। এমন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয় সেখানে পুরানো শিক্ষার সাথে নতুন ধারণার সমন্বয় ঘটানো হয়। সুতরাং আধুনিকতার সম্প্রসারণ ঘটলেও ধর্মীয় ভিত্তি যথেষ্ট জোরালো ছিল। তাছাড়া একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, বার্মার জনসাধারণ আবহমানকাল ধরে নিজেদেরকে জাতি হিসাবে গণ্য করেছিল— তাদের ঐতিহ্য, ভাষা ও ধর্মের মধ্য দিয়ে। ধর্মের মধ্য দিয়েই বর্মীদের ঐতিহ্য শতাব্দীকালব্যাপী লালিত হয়েছিল। কাজেই ধর্মকে বাদ দিয়ে বর্মীদের জাতি বা জাতীয়তাবাদী চেতনার কথা ভাবাই অর্থহীন।

আসলে রাজা ও বৌদ্ধ সংঘ পরস্পর পরস্পরের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল। সংঘের রাজনৈতিক কার্যকলাপ অপেক্ষা রাজার ধর্মীয় কার্যকলাপ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রাজা একাধারে সংঘের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন অন্যদিকে সংঘ-প্রধানের সামাজিক সমর্থনের ওপর রাজশক্তির স্থায়িত্ব নির্ভর করত। রাজা কর্তৃক সংঘ-

প্রধানরা কূটনৈতিক দূত হিসাবে বহির্দেশে প্রেরিত হতেন। তবে রাজা বা সংঘ কেউ-ই ঐতিহ্যবাদী বার্মার রীতি-নীতিকে অশ্রদ্ধা করতেন না।

৭৩.৫.২ সাংস্কৃতিক বিবর্তন

আবার একাদশ শতক থেকে বার্মার সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ উপাদানরূপে পরিগণিত হয়। বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উল্লেখযোগ্য নির্দশন হলো বৌদ্ধ স্তূপ মন্দির, বেদী। এরা আইন সংহিতা, সূত্র, ব্যাকরণও লিখেছিল। বৌদ্ধ সংঘগুলির নিজস্ব সংবিধান ছিল। রাষ্ট্রের সকল বৌদ্ধ মঠগুলি একটি মৈত্রীসংঘে আবদ্ধ হয়। সংঘ-প্রধানের উদ্যোগে কৃষিকাজ, পশুপালন, গ্রন্থাগার নির্মাণ ও বৌদ্ধ মন্দিরের সংস্কার সাধন করা হয়।

৭৩.৫.৩ বৌদ্ধ সংঘের মর্যাদাহানি

তবে ব্রিটিশ শাসনকালে বৌদ্ধসংঘগুলির মর্যাদাহানি সম্ভাবনা, মিশনারীবাদে অনুপ্রবেশ, সেই সঙ্গে জাতীয় মুল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানের অবক্ষয় ইত্যাদি ব্যাপারগুলি পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ বিদেশী সংস্কৃতির হাত থেকে বৌদ্ধধর্মকে রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য বলে মনে করতে থাকেন। তারা ধর্মের দিক থেকে বিদেশী শাসনের যে বিপদের সম্ভাবনা ছিল তা তুলে ধরেন।

এদিকে ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রতি ব্রিটিশদের মনোভাব পরিবর্তিত হতে থাকে। এরা পরিষ্কারভাবে সংঘ-প্রধানের যাজকীয় সুযোগ-সুবিধা ও বহু অধিকার আইনগতভাবে বাজেয়াপ্ত করতে থাকে। ১৮৯৫-তে উচ্চ বার্মায় সংঘ-প্রধানের মৃত্যুর পর কোন যোগ্য উত্তরাধিকারী নিয়োগ করা হয়নি। অবশ্য ১৯০৫-এ মান্দালয়ে নতুন সংঘ-প্রধান নিয়োগ করা হয় এবং একটি সনদের মাধ্যমে তার অধিকার সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

৭৩.৬ ব্রহ্মের জাতীয়তাবাদী সংস্থাগুলি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বর্মীযুবকেরা বিদেশী বিধর্মী জাতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। বিশেষ করে ১৯১৬-তে ইউ মে কোয়াং ও অন্যান্য সদস্যদের উদ্যোগে বার্মাতে General Council-এর অধিবেশন আহূত হয়। সেখানে শুধুমাত্র শিক্ষাগত প্রসার নয়, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিধির বিস্তার ঘটানো। এরপর দেখা যায় ১৯১৬-১৭-তে ইউ থিয়েন সং-এর নেতৃত্বে আন্দোলন জাতীয়তাবাদী আকার ধারণ করে এবং তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সরকার এই পর্যায়ে প্রতিটি প্যাগোডাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং রেঙ্গুনে এই প্রতীকী বিরোধ ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয়। এই সময় বর্মী যুব

সম্প্রদায় বা Young Men Burmese Association (Y.M.B.A.)-এর কার্যকলাপের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। আবার বর্মী দেশীয় শিক্ষায় শিক্ষিত G.C.B.A. ও Y.M.B.A.-এর সঙ্গে এই জাতীয়বাদী আন্দোলনে অংশ নেয়। এরা Y.M.B.A.-এর পশ্চিমী প্রশিক্ষণ ও নিজেদের স্বদেশীয় দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেশের জনসাধারণের অনেক কাছাকাছি আসে।

৭৩.৬.১ Y.M.B.A.-এর দাবী

১৯১৭-তে Y.M.B.A-এর একটি সদস্য দল মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ডের কাছে কতকগুলি দাবীদাওয়া পেশ করে—

(১) ভারত থেকে বার্মার পৃথকীকরণ দাবী করে,
(২) সম্রাটের অধীনে বার্মাকে একটি স্বাধীন জাতি হিসাবে দাবী করে,
(৩) ব্রিটিশ শাসকের প্রতি বার্মার আনুগত্য দাবী করে।

এরপর ১৯১৯-২০-তে Y.N.B.A., G.C.B.A-তে রূপান্তরিত হয়। এই সময় জাতীয় কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনের প্রভাবে বার্মাতে ২১টি প্রদেশের সদস্যরাও তাদের সম্মেলনে যোগ দেয়।

দুর্ভাগ্যবশত ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী এবং বার্মার জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে ১৯২০-এর বিশ্ববিদ্যালয় আইনকে কেন্দ্র করে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। ১৯২০-তে রেগুনে একটি গণ-অধিবেশনে Y.M.B.A.-এর তত্ত্বাবধানে ৪০০ জন সদস্য ও সঙ্গীদের উপস্থিতিতে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় আইন তৈরি হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় আইন-ই প্রথম বার্মার জাতীয় ছাত্র সংগঠন এবং সরকারের মধ্যে সরাসরি বিরোধিতার ক্ষেত্র রচনা করে। এই আইনে বলা হয়—

(১) উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশের এবং কলেজের প্রবেশিকা পরীক্ষার ওপর জোর দিতে হবে।
(২) যতদূর সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত রাখতে হবে।
(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিল (Council) এবং সিনেটে (Senate)-এ সরকারের কোন প্রভাব থাকবে না।
(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের শুরুতে এক বৎসর পরীক্ষা চলাকীলন বাধ্যতামূলক ছাত্রাবাসে থাকতে হবে।
(৫) সরকারকে উদারনৈতিক বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের দিকে নজর দিতে হবে।

৭৩.৬.২ বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন

যাই হোক ১৯২০-এর ৪ঠা ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় ধর্মঘট শুরু হয়। এতদিন ছাত্র আন্দোলন বিশুদ্ধ শিক্ষাগত আন্দোলন ছিল, কিন্তু এই দাবীর পর ছাত্র আন্দোলন বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। ছাত্ররা সম্পূর্ণভাবে বার্মার জন্য স্বশাসন দাবী করে। এই বিদ্রোহ সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় এবং আমেরিকার ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়েও জড়িয়ে পড়ে। এই বিক্ষোভ শুধুমাত্র বর্মী জাতীয়তাবাদী নেতা, শিক্ষক, সাধারণ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী-ই নয়, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতাদের অনেকেই সমর্থন করেন। এই সময় Y.M.B.A.-তে নাম পরিবর্তন করে G.C.B.A. রাখে।

এই ধর্মঘটের দুটি ধারা ছিল। (১) রাজনৈতিক ও (২) শিক্ষা ও সংস্কৃতি গত। শিক্ষাগত দিক থেকে দেখা যায় ছাত্ররা দেশবাসীর মনে এই ধারণার সৃষ্টি করেছিল যে, বার্মার সবঙ্গীন উন্নতিসাধনের জন্য বিদেশী ইওরোপীয় শিক্ষার অবসান ঘটিয়ে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার সত্যি প্রয়োজন আছে। আর রাজনৈতিক দিক থেকে দেখা যায় ব্রিটিশরা বার্মাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের দাবীর ভিত্তিতে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর সংবিধান প্রদান করতে রাজী হয়।

৭৩.৭ ১৯৩০ সালের অর্থনৈতিক মন্দা

তারপর ১৯৩০-এর বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা বার্মার জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ মন্দা ও অচলাবস্থা দেখা দেয়। বেকারী, বিশৃঙ্খলা, সামাজিক ক্ষেত্রে অপরাধপ্রবণতা বেড়ে যায়। এই সময় ভারতীয় ও ব্রিটিশ ঋণদাতাদের জালে কর্মী ভাড়াটিয়া কৃষকরা জড়িয়ে পড়ে। আবার ১৯৩৫-এ ভারত সরকার আইনের পরিপ্রেক্ষিতে মায়ানমার বা বার্মাকে ভারত থেকে পৃথক করে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়, তবে চূড়ান্ত ক্ষমতা ব্রিটিশ রাজ্যপালের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে।

৭৩.৭.১ সায়াসেনের (Sayasn) অভ্যুত্থান

আবার এই সময় G.C.B.A-এর প্রাক্তন কৃষক নেতা সায়াসেন নিজেকে রাজা হিসাবে দাবী করে এবং বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তিনি প্রতীকী বৌদ্ধ রীতিনীতি বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। সমগ্র কৃষক সমাজ তথা বার্মার নিকট তিনি ছিলেন একাধারে বুদ্ধের অবতার, সাম্যবাদী জনক ও বার্মার ত্রাতা, ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। তাঁর নির্দেশে তাঁর সংগঠিত কৃষকবাহিনী বহু ভারতীয় ও ব্রিটিশদের হত্যা করে। অবশেষে ১৯৩৭-এর সায়াসেনের বিচারে ফাঁসির হুকুম হয়। আসলে সায়া সেন প্রবর্তিত বিদ্রোহ-ই ছিল বার্মার আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার উত্থানের বিপরীতে ঐতিহ্যের ও নিজস্ব সংস্কৃতির রক্ষাকবচ।

৭৩.৮ ব্রহ্মের জাতীয়তাবাদের জাপানী সমর্থন

১৯৩০-এর দশকে বার্মার বহু জাতীয়তাবাদী দল গড়ে ওঠে। এর মধ্যে Thakin (Master) দল বিশেষ উল্লেখ্য। এই টাকিন পার্টি ছিল আসলে বর্মী-ব্রিটিশ সংস্কৃতির বা বর্মী real cultural revitalization এর জনক। এই সংগঠনটি ছিল মায়ানমারে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণদের দ্বারা বিশেষভাবে সংগঠিত। এরা ছিল সাম্যবাদে বিশ্বাসী। তবে কমিউনিজম প্রসূত সাম্যবাদে নয়, বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও মানবতাবাদ দ্বারা রচিত অতি আধ্যাত্মিক মানবচেতনাসম্পন্ন মনুষ্যত্ববোধের দ্বারা। এরা মায়ানমারে অবস্থিত ভারতীয় সম্প্রদায়কে ঘৃণার চোখে দেখলেও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও তাদের জাতীয়তাবাদী নেতাদের অপরিসীম শ্রদ্ধার চোখে দেখত। আবার ১৯৩৯-এ Thakin-রা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগ দেয়।

৭৩.৮.১ স্বাধীনতার পথে যাত্রা

এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে Thakin party তিনভাগে ভাগ হয়ে যায়। থাকিন সাম্যবাদী শাখার নেতৃত্ব দেন অংশান। এরপর অংশান জাপানী সাহায্য নিয়ে বর্মা থেকে ব্রিটিশ বিতাড়নের পরিকল্পনা করেন। এরপর ১৯৩৪-এর August থেকে ১৯৪৩-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বার্মা জাপানী শাসনের মধ্যে আসে।

৭৩.৮.২ ফ্যাসীবাদ বিরোধী সংগঠনের ভূমিকা

১৯৪৫-এর মে মাসে বার্মা প্রসঙ্গে ব্রিটিশ নীতি ঘোষিত হয় একটি শ্বেতপত্রের মাধ্যমে। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে Aung Sun প্রস্তাবিত সরকারকে স্বীকৃতি দিতে ব্রিটিশ সরকার অস্বীকার করে। তবে ঐ শ্বেতপত্রে ব্রিটিশ সরকার B.N.A. (Burmese National Army)-র একটি নির্দিষ্ট মত গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে ১৯৪৪-এ বার্মার সকল রাজনৈতিক দলগুলি একটি রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় এসে A.F.P.F.L বা (All Anti-Fascist people's Freedom League) গঠন করে। ম্যান্টান হলেন এর প্রধান সচিব আর অংশান ছিলেন সম্পাদক।

A.F.P.F.L.-এর ইস্তাহারে তারা প্রকাশ করে "People's Government" অর্থাৎ জনগণের সরকার যার সুনির্দিষ্ট সংবিধান থাকবে, এবং সেই সংবিধান সমগ্র বার্মাবাসীদের দ্বারা স্বীকৃতি পাবে। সেই সংবিধানে এদের নিজস্ব চিন্তা, ভাষণ, কর্মপন্থা, রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতির সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট রীতিনীতির উল্লেখ থাকবে। তবে এদের প্রাথমিক কর্তব্য হবে কি করে গেরিলা পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে জাপানীদের বিতাড়িত করা যায়? এরপর ১৯৪৫ এর ২৭শে মার্চ A.F.P.F.L.-এর নেতৃত্বে বার্মার বিদ্রোহ শুরু হয়। অবসেষে ১৯৪৫-এর ৭ই মে A.F.P.F.L. সমগ্র বার্মার ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে।

৭৩.৮.৩ অর্থনৈতিক পরিবর্তন

যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধপরবর্তী পরিস্থিতিতে দেখা যায় সমগ্র বার্মার অর্থনীতি পরিবহন কাঠামো ও সামাজিক রীতিনীতি ভেঙে পড়েছে। ১৯৩৮-এর ভারতবিরোধী আন্দোলনের প্রাক্কালে ও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বহু ভারতীয় বুদ্ধিজীবী বার্মা পরিত্যাগ করে। এই অবস্থায় A.F.P.F.L. ও বার্মাবাসী অংশানের নেতৃত্ব সমগ্র বার্মাকে একই ছত্রতলে আনতে বদ্ধপরিকর হয় ও তৎক্ষণাৎ ব্রিটিশদের বার্মা পরিত্যাগের দাবী জানায়।

৭৩.৮.৪ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও ব্রহ্মের স্বাধীনতা লাভ

এই পরিস্থিতিতে ব্রিটেনে Labour Party ক্ষমতা দখল করে। তারা Aung Sun কে ১৯৪৬-এর মন্ত্রী-পরিষদ গঠনের আহ্বান জানায়। ১৯৪৭-এর জানুয়ারীতে ব্রিটেন বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা করে। এপ্রিলে A.F.P.F.L নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফিরে আসে। কিন্তু গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের শিকারে অংশানকে হত্যা

করা হয়। অবশেষে ১৯৪৮-এর ৪ঠা জানুয়ারী বার্মার জেনারেল উনু'র নেতৃত্ব পূর্ণ স্বাধীনতা পায় এবং ব্রিটিশ কমনওয়েলথ্-এর সদস্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

৭৩.৯ সারাংশ

আলোচিত এককটিতে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উপমহাদেশ জাতীয়তাবাদী চেতনা উন্মেষের মূলে সাধারণ কারণগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিভিন্ন কারণের সমন্বয়ে এই উপমহাদেশে জাতীয়তাবাদী তরঙ্গ প্রবাহিত হতে থাকে। স্থানীয় বিদ্রোহ, ব্যাপক আন্দোলন প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে এই অঞ্চলে জাতীয়তাবাদ আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। জাতীয়তাবাদী সংস্থাগুলির আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ব্রহ্মদেশে আসে সামগ্রিক রূপান্তর। উপনিবেশিক অবস্থা থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন ব্রহ্ম তথা ময়ানমারের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

৭৩.১০ অনুশীলনী

ক। বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। থুগী কে ছিলেন?
২। মিও থুগীর কাজ কি ছিল?
৩। বর্মার কৃষিদপ্তর কবে খোলা হয়?
৪। কৃষি গবেষণাগার কবে ও কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?
৫। এই গবেষণাগারের কার্যাবলী কি ছিল?
৬। বর্মার প্রধান রপ্তানী পণ্যটির নাম লিখুন।
৭। এই পণ্য কোথায় রপ্তানী হতো?
৮। সায়াসেন কে ছিলেন?
৯। থাকিন সাম্যবাদী শাখার নেতার নাম লিখুন?
১০। বর্মা কবে স্বাধীনতা লাভ করে?
১১। অংশান কে ছিলেন?
১২। পংগী কাকে বলে?

খ। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। ঔপনিবেশিক শাসনকালে বর্মার কৃষিপ্রথায় কী পরিবর্তন হয়?
২। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে বর্মার সাদৃশ্য কোথায়?

৩। সায়াসেনের অভ্যুত্থানের কারণ কী?

৪। বর্মার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা কী ছিল?

গ। দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

১। বর্মার জাতীয়তাবাদের প্রধান ভিত্তিগুলি আলোচনা করুন।

২। ধর্ম কীভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে দুটি কারণ উল্লেখ করুন?

৩। বৌদ্ধ সংঘের মর্যাদাহানির কারণ কী ছিল?

৪। A.F.P.F.L.-এর নেতৃত্বে বর্মার স্বাধীনতা লাভের একটি চিত্র প্রস্তুত করুন।

৭৩.১১ গ্রন্থপঞ্জী

1. J.F. Cady : South-East Asia—Its historical development. Megraw Hill, 1979.
2. D.G.E. Hall : History of Modern Burma.
3. J.F. Cady : Making of Modern Burma.
4. Khoo kay Kinm (ed) : The History of South-East Asia—essasys and developments O.U.P. 1977.
5. M.B. Hooker : A concise legal history of Southeast Asia.

একক ৭৪ □ ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন

গঠন

- ৭৪.০ উদ্দেশ্য
- ৭৪.১ প্রস্তাবনা
- ৭৪.২ প্রেয়ারী ও সান্ত্রী বিক্ষোভ
  - ৭৪.২.১ মুক্তি আন্দোলনে বিদ্যালয়ের ভূমিকা
  - ৭৪.২.২ স্থানীয় বাণিজ্যের ভূমিকা
- ৭৪.৩ জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলি
  - ৭৪.৩.১ বুদি উতোমো
  - ৭৪.৩.২ জাতীয়তাবাদী দল
- ৭৪.৪ সারেকাৎ.ইসলাম
  - ৭৪.৪.১ দ্বি-ধারার প্রবর্তন
  - ৭৪.৪.২ ইসলামী চেতনা ও সংস্কারের প্রভাব
  - ৭৪.৪.৩ অর্থনৈতিক কারণের জন্য সাফল্য
  - ৭৪.৪.৪ যবদ্বীপীয় চেতনার ভূমিকা
  - ৭৪.৪.৫ সারেকাৎ আন্দোলনের রূপান্তর
  - ৭৪.৪.৬ মহম্মদীয়া দল
- ৭৪.৫ ইন্দোনেশিয় সংঘ
  - ৭৪.৫.১ প্রথম সাম্যবাদী সংঘ
  - ৭৪.৫.২ রুশ সাম্যবাদের প্রভাব
  - ৭৪.৫.৩ কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন
  - ৭৪.৫.৪ সাম্যবাদী আন্দোলন
  - ৭৪.৫.৫ সাম্যবাদী আন্দোলনের ব্যর্থতা

    ৭৪.৫.৬ নাদাতুল উলেমা
    ৭৪.৫.৭ হল্যান্ডে ইন্দোনেশিয়ার সাম্যবাদী দল
  ৭৪.৬ সুকর্ণ ও ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী দল
    ৭৪.৬.১ দলীয় গঠন ও উদ্দেশ্য
    ৭৪.৬.২ ইন্দোনেশিয়ার বহুমুখী আন্দোলন
৭৪.৭ ইন্দোনেশিয়ার জাপানী অধিগ্রহণ ফলাফল
৭৪.৮ ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা লাভ
৭৪.৯ সারাংশ
৭৪.১০ অনুশীলনী
৭৪.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৭৪.০ উদ্দেশ্য

ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এক বিশেষ অধ্যায় রূপে বিবেচিত হয়েছে। এই এককটি পাঠ করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আপনারা জানতে পারবেন—

- স্থানীয় নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদের সূচনা।
- ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদের ত্রিমুখী প্রসার : ইসলামীয়, জাতীয়তাবাদী ও সাম্যবাদী।
- এখানকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বিদ্যালয়, জাতীয়তাবাদী দল ও বাণিজ্যের ভূমিকা।
- ইন্দোনেশিয়াতে ইসলামের শক্তিশালী ভূমিকা ও সাফল্য।
- সাম্যবাদীদের ব্যর্থতা।
- জাপানের ইন্দোনেশিয়া অধিগ্রহণ।
- ইন্দোনেশিয়াতে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

৭৪.১ প্রস্তাবনা

বর্মার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মতো ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়মুক্তি আন্দোলন বিশেষ অধ্যায় রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই আন্দোলন ত্রিধারা বিভক্ত। ধারাগুলি যথাক্রমে ইসলাম, জাতীয়তাবাদ ও মার্কসবাদ।

তবে ঊনবিংশ শতকের সুচনায় এখানে জাতীয়তাবাদী স্পন্দন অনুভূত হতে থাকে। ডাচ উপনিবেশিক শাসনকালে বৈষম্যের বিরুদ্ধে স্থানীয় স্তরে প্রেয়ারী ও সান্ত্র বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। ডাচ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ এখানে বৈষম্যের সূচনা করলে জনগণের আশা-আকাঙ্খা বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন সময়কালে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছিল। এখানে ইসলামধর্মের ভূমিকা ছিল খুবই শক্তিশালী। মুসলিম সংগঠনগুলি এখানকার জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছিল এবং নানাবিধ কারণের সমন্বয়ে সাফল্য লাভও করেছিল।

৭৪.২ প্রিয়ায়ী ও সান্ত্রী বিক্ষোভ

ঊনবিংশ শতকের প্রথম থেকেই এই আন্দোলন শুরু হয়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় (১৮২৫-৩০) জাভা যুদ্ধ, (১৮২০ ও ১৮৩০-এর দশকে) সুমাত্রার পার্দেরি যুদ্ধ, সুমাত্রার আচে যুদ্ধ (১৮৭২-১৯০৮) ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। উপরিউক্ত যুদ্ধগুলির মধ্য দিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ নেতৃত্বের বিস্তার ঘটেছিল।

তবে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে প্রধান নেতৃত্ব দিয়েছিল ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রধান দুইশ্রেণী প্রিয়ারী (Priyayi) ও সান্ত্রী (Santri) শ্রেণী। প্রিয়ায়ী সম্প্রদায় ছিল প্রধানত উচ্চবর্গের জমিদারশ্রেণী, এরা জাভার অন্তর্ভাগে অবস্থান করত। এরা বংশানুক্রমে ডাচ্ ঔপনিবেশিক শাসনের পূর্ব থেকেই জেলা প্রধান বা মহকুমা প্রধানের ভূমিকা পালন করত।

এই Santri ছিল উপকূলবর্তী বণিক সম্প্রদায়। এরা বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ্ উপনিবেশিক শাসকরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তিনটি নীতি—(১) কালচার বা কৃষিব্যবস্থা Cultural System, (২) নৈতিকতা বা Ethical policy ও (৩) উদারনৈতিকতা বা Liberal Policy প্রবর্তন করে। এরই ফলস্বরূপ ইন্দোনেশীয় রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পট পরিবর্তন ঘটে ও পরিবর্তনের ধারার মধ্যেই ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বীজ নিহিত আছে।

৭৪.২.১ ইন্দোনেশিয় মুক্তি আন্দোলনে বিদ্যালয়ের ভূমিকা

উপরিউক্ত ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় ১৮৯৩-এ দু ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলে। প্রথমটি প্রথম শ্রেণীর নেটিভ 'প্রিয়ায়ী'দের জন্য। দ্বিতীয়টি দেশীয় নেটিভদের জন্য। ১৯০৩-এর উচ্চমাধ্যমিক স্তরে কৃষি বিদ্যালয় চালু হয়। আবার ১৯০৭-এ পশু চিকিৎসালয়, ১৯০৮-এ আইন বিদ্যালয় চালু হয়। স্থির করা হয় যারা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরে পঠন পাঠন শেষে দেশে ফিরবে তাদের চাকুরী দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রেও বৈষম্য লক্ষ্যণীয়। দেশীয় নেটিভদের অপেক্ষা ডাচ্ বা ইওরোপীওদের বেতন অধিক দেওয়া হয়। প্রথম দিকে প্রিয়ায়ী

শ্রেণী মনে করেছিল উচ্চশিক্ষা মানেই চাকুরী, কিন্তু অতি সত্বর তারা উপলব্ধি করে আমলাতন্ত্রের উচ্চপদে বা শিক্ষাগত পর্যায়ে তাদের চাকুরীর সুযোগ সীমিত।

৭৪.২.২ স্থানীয় বাণিজ্যের ভূমিকা

এই সময় Santri-রাও হতাশায় ভুগতে থাকে। তারা মনে করেছিল ১৯০০-এর উদার অর্থনৈতিক নীতি তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল চীনা ব্যবসায়ীগণ ইন্দোনেশিয়াতে বাণিজ্যিক দিক থেকে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। চীনারা প্রধানতঃ বাটিক শিল্পে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে। সুতরাং দেশীয় বণিকদের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে ওঠে।

৭৪.৩ জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলি

ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ইন্দোনেশিয় জনগণের আশা, আকাঙ্খা, কামনা, বাসনা, হৃদয়ের আর্তি, অভিলাষ সবই এই সংগঠনগুলির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

৭৪.৩.১ বুদি উতোমো

এরকমই একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠন বুদি উতোমো (Budio utomo) ১৯০৮ সালে বাটাভিয়াতে জাভার কয়েকজন তরুণ ডাক্তারের উদ্যোগে গঠিত হয়। জাভার নিজস্ব সংস্কৃতির উন্মেষ ও বিকাশ ছিল এই দলের আদর্শ। সমাজের উপরের তলার সুশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এর আবেদন সীমাবদ্ধ ছিল।

৭৪.৩.২ জাতীয়তাদী দল

আবার জাতীয় আন্দোলনের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে ১৯১২-তে জন্ম হয়েছিল National Indies Partyর Douwes Dekker এই দলের প্রতিষ্ঠাতা। এদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচী ছিল অল্পবিস্তর চরমপন্থী। তবে এই দলের জাতীয়তাবাদী আদর্শ সাধারণ মানুষের মনে বিশেষ উদ্দীপনা সৃষ্টি করেনি।

৭৪.৪ সারেকাৎ ইসলাম

ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদ ও ইসলামের ইতিহাসে সারেকাৎ ইসলামের ভূমিকা জটিল ও অর্থবহ। আদর্শের বিচারে স্বাধীন রাষ্ট্রের কল্পনা যে, জাতীয়তাবাদের মূল সূত্র তার পূর্বসূরী হিসাবে কাজ করে সারেকাৎ আন্দোলন। ধর্মীয় বিচারে ইসলাম ধর্মীয় ও সামাজিক এবং রাজনৈতিক মূল্যবোধ যে সংস্কার আন্দোলনের কার্যসূচীতে প্রকট,

সেই সংস্কার আন্দোলনের প্রাথমিক স্তর হচ্ছে সারেকাৎ ইসলাম দল। আসলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির বিরুদ্ধে কৃষক সমাজের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ রূপ পেয়েছে এই আন্দোলনে ইসলাম ধর্মের কাঠামোর মধ্য দিয়ে। এজন্যই গ্রামীণ মানুষের কাছে সারেকাৎ ইসলাম এত জনপ্রিয় ছিল।

প্রথম কয়েক বছরে সারেকাৎ ইসলাম মুসলিম সমাজের আঞ্চলিক অসন্তোষকে শহরকেন্দ্রিক নেতৃত্বের পরিচালনায় ব্যাপক গণআন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল। ১৯২০-র দশকের প্রথম দিকে কিছুটা অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ও কিছুটা ডাচ্ সরকারের দৃঢ়তার জন্য সারেকাৎ ইসলামের ভূমিকা শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

আবার ১৯০৯ এ সুরকর্তায় Sarekat Dagong Islam (সারেকাৎ ডগং ইসলাম) নামে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়। এটির মূল উদ্দেশ্য ছিল মধ্য জাভায় বাটিক শিল্পে চীনা প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ করা।

তবে ১৯২২-তে নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে মধ্য জাভা অঞ্চলে Sarekat Islam দলের আবির্ভাব ঘটে। এদের কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক ও চীনা বিরোধী। এদের আবেদন ছিল ব্যাপক ও সমাজের সর্বস্তরে। দলের দুই নেতা তোজোক্রোমিন্টো (Tjokrominoto) ও সেলিম (Salim) ছিলেন পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ইন্দোনেশিয়ার পরম্পরাগত উচ্চবর্গীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত। প্রধানত Santri ও নিম্নবর্গীয় প্রিয়ায়ী শ্রেণীর মধ্য থেকে এদের সদস্য নির্বাচন করা হত। সেলিম ছিলেন ইসলামের সংস্কার আন্দোলনের প্রাণধারায় প্রভাবিত এবং শহরের মধ্যবিত্ত ও বৃত্তিভোগী শ্রেণীর সমর্থন পুষ্ট। এই দল মূলত গ্রামাঞ্চলে কাজী ও উলেমাদের পরম্পরাগত নেতৃত্বের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তোজোক্রোমিন্টোর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে ও গ্রামের মানুষ অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ক্রমেই তা নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হয়ে যায়। ১৯২৪-এর নেতাদের সঙ্গে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের নেতাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ১৯২৬-এ পশ্চিম জাভা ও পশ্চিম সুমাত্রার গ্রামীণ অসন্তোষ কমউনিস্ট আন্দোলন রূপে বিদ্রোহের রূপ নেয়। এই বিদ্রোহ নির্মমভাবে দমন করা হলে ব্যর্থতার মাধ্যমে গণ-আন্দোলনের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

৭৪.৪.১ দ্বি—ধারার প্রর্বতন

সুতরাং দেখা যায় ইন্দোনেশিয়ায় একদিকে আধুনিক ইসলামী সভ্যতা বিকাশের অনুকুল ব্যাকরণ উপস্থিত হয়েছে, অন্যদিকে নাগরকেন্দ্রিক পশ্চিমী ধাঁচে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটেছে। যে জাতীয়তাবোধের শিকড় অংশত প্রিয়ায়ী-ই শ্রেণীর গভীরে প্রোথিত।

১৯১৩ সালের একটি হিসাবে ইন্দোনেশিয়ার বহুমুখী বৈচিত্র্যের স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তিন হাজার মাইল সমুদ্রের তীরে ব্যাপ্ত প্রায় তিন হাজার বাসযোগ্য দ্বীপপুঞ্জের সমষ্ঠি আছে ইন্দোনেশিয়ায়। এখানে ৪০ মিলিয়ন স্থানীয় অধিবাসী, ৯ লক্ষ চীনা আর ১ লক্ষ ইউরোপীয় মানুষের বসবাস। এখানে ৮০টি জাতিগোষ্ঠীর লোক বাস করে। তারা ২০টি ভাষায় এবং ২০০টি ডায়ালেক্টে কথা বলে। ইন্দোনেশিয়ার মোট ভূখণ্ডের শতকরা ৭ ভাগ হলো জাভা।

এখানে ভূমিনির্ভর সংগঠিত সামন্ত শ্রেণী নেই, শিক্ষিত সজাগ, সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণী নেই। এখানে শিল্পের বিকাশ ঘটেনি। এইসব বিচ্ছিন্ন শক্তির মধ্যে ঐক্যের উপাদান জুগিয়েছে মালাই ভাষা, ইসলাম ধর্ম ও ডাচ শাসন।

৭৪.৪.২ ইসলামী চেতনা ও সংস্কারের প্রভাব

ইসলাম সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ বেড়েছিল ঠিক তেমনি ইসলামকে নানা সংস্কারের মধ্য দিয়ে যুগোপযোগী ও গতিশীল করে তোলার চেষ্টাও চলছিল। কারণ, ইসলাম ধর্মকে তারা মনে করেছিল। সংহতি ও নিরাপত্তার রক্ষাকবচ। সংস্কারবাদ ও ওয়াহাবী আন্দোলন ছিল বিশ্বব্যাপী ইসলামী জাগরণের দুটি স্পষ্ট স্বতন্ত্র ধারা। এ দুটি আন্দোলন-ই উলেমা প্রভাবিত ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ছিল। কিন্তু ধর্মীয় অপলাপের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলদের চেয়ে সংস্কারপন্থীদের আক্রমণ ছিল সবচেয়ে বেশি তীক্ষ। সংস্কারপন্থী ভারতীয় নেতারা মুসলিমদের মধ্যে পশ্চিমী প্রভাব সম্পর্কে যেমন উৎকণ্ঠিত ছিলেন, তেমনি আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাধারার আলোকে ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি তারা পুননির্ধারণ করতে চেয়েছিল। তাদের বক্তব্য ছিল হজরত মহম্মদ প্রবর্তিত খাঁটি ইসলাম ধর্ম অনুশীলন করতে হবে। মধ্যযুগীয় গোঁড়ামি, অন্ধত্ব কুসংস্কারের হাত থেকে ইসলাম ধর্মকে মুক্ত করতে হবে।

৭৪.৪.৩ আর্থিক কারণের জন্য সাফল্য

সারেকাৎ ইসলামের সাফল্যের জন্য আর্থিক কারণকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। ইন্দোনেশীয় জনগণের মধ্যে বাণিজ্যিক স্পৃহা জাগানো এবং চীনাদের বিরুদ্ধে সমবায় সংস্থা গড়ে তোলা ছিল এই দলের মূল লক্ষ্য। মনে রাখা দরকার সারেকাৎ ইসলামের শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোথাও ধর্মীয় কারণে কোথাও অর্থনৈতিক কারণে, আবার কোথাও উভয় কারণে।

৭৪.৪.৪ যবদ্বীপীয় চেতনার ভূমিকা

সারেকাৎ ইসলামের গড়ে ওঠার পিছনে একটি যবদ্বীপীয় চেতনাও কাজ করেছিল। এবং জাভার ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে আত্মভরিতাও দেখা গিয়েছিল। S.I.-এর নেতারা এই যবদ্বীপীয় চেতনাকে প্রচার মাধ্যম রূপে কাজে লাগায়। সেজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরা বিশ্বাস করত যে, ইসলাম ধর্মকে ভিত্তি করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটানো উচিৎ। তারা আরোও বিশ্বাস করত যে, পদানত ও আহত মানুষের অভাব-অভিযোগ প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম হলো সারেকাৎ ইসলাম। মুষ্টিমেয় পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিতেরা ধর্মনিরপেক্ষ জীবন দর্শনে বিশ্বাসী হলেও তারা এ ধারণা পোষণ করতেন যে, ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনে মানুষকে সংগঠিত করতে ইসলাম ধর্ম অপরিহার্য।

সুবিচারে প্রত্যাশাতেও মানুষ সারেকাৎ ইসলামের শরণাপন্ন হয়েছে। বিভিন্ন অন্যায় আইন, জাতি বৈষম্যমূলক ব্যবস্তা, সহানুভূতিহীন বিদেশী শাসক ও ক্ষমতাহীন প্রিয়ায়ী শ্রেণী সবকিছুর বিরুদ্ধে দেশের লোকের মনে

অভিযোগ জমাট বেঁধেছিল। তারা মনে করেছিল সারেকাৎ ইসলামে যোগদান করলে এ সবের বিরুদ্ধে দেশের লোকের মনে সুবিচারের আশা মিলবে। অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের সময় মানুষ ভেবেছে সারেকাৎ ইসলামে যোগ দিলে ত্রাণসামগ্রী মিলবে।

৭৪.৪.৫ সারেকাৎ আন্দোলনের রূপান্তর

ইসলামের সংহতি সারেকাৎ ইসলামকে সাংগঠনিক প্রসারতা দিয়েছে, কিন্তু স্মরণীয় এই যে, ইসলাম সারেকাৎ ইসলামের অর্থবাহী নয়। সারেকাৎ নেতা জোক্রোমিনাটো ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। অগণিত গ্রামবাসীর কাছে তিনি ছিলেন 'রাতু আদিল' যার আবির্ভাব হয়েছে দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য, সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, ধর্মরাজ্য স্থানের জন্য।

ধীরে ধীরে এই দলটি বণিক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এবং শ্রমিক কৃষক আন্দোলনে পরিণত হয়।

৭৪.৪.৬ মহম্মদীয়া দল

১৯১২-তে মহম্মদীয়া দল ইসলাম ধর্মকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে তোলে। এবং সংস্কার আন্দোলনের প্রেরণায় এদল ধর্মীয় ও শিক্ষামূলককাজে আত্মনিয়োগ করে। যদিও এটি ছিল অরাজনৈতিক দল তথাপি জাভার বাইরে এই দল রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে।

৭৪.৫ ইন্দোনেশিয়া সংঘ

আবার ১৯১২-তে partai Indonesia দল গঠিত হয়। এরাই সর্বপ্রথম বলে যে, ডাচদের হাত থেকে ইন্দোনেশিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা চাই।

৭৪.৫.১ প্রথম সাম্যবাদী সংঘ

১৯১৪-তে ইন্দোনেশিয়ায় Social Democratic Association গঠিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে এটিই প্রথম মার্কসবাদী সংগঠন। এটি ইন্দোনেশিয়ার দ্বারা তৈরী হয়নি। ডাচ চরমপন্থী সমাজবাদী জাভাতে এলে তার উদ্যোগে এই দল গঠিত হয়।

১৯১৬-তে Volksraad নামে একটি গণসভা সৃষ্টি হল। এই গণসভা ছিল ডাচ সরকারের উপদেষ্টা সমিতি। এই সভা প্রকৃত অর্থে প্রতিনিধিমূলক ছিল না। এই সভার আইন প্রণয়ন ও ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক মতামত ও অভাব-অভিযোগ প্রকাশ করা হত এই সভাতে। এই প্রতিষ্ঠান চালু হওয়ার পর Periyayi শ্রেণীর

ক্ষমতা ও প্রভাব আর কিছুই থাকল না। আধুনিক রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলেছিল এই জনসভা।

৭৪.৫.২ রুশ সাম্যবাদের প্রভাব

এদিকে সাম্যবাদী দলের নেতৃত্ব রাশিয়াতে বিপ্লব সফল হওয়ার পর তারা মনে করল যে, সমাজতন্ত্র একটি দেশে আবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়ুক। এজন্য ১৯১৯-এর কমিনটার্নের প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশনে লেনিন বিশ্ব বিপ্লবের কথা বলেন। ইন্দোনেশিয়ার Social Democratic Association এই আহ্বানে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯২০-এর ২৩শে মে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। ১৯২০-র কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে Sneerliet ইন্দোনেশীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিত্ব করেন। এই দল সারেকাৎ ইসলামের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নয়, সংস্কারের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের কথা বলেছিল। এই দলের সংগ্রাম ছিল বিদেশী ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে, ইন্দোনেশীয় ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়। তাদের কাছে মার্কসবাদের আকর্ষণ জাতীয় সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে, সমাজ বিপ্লবের আদর্শ হিসাবে নয়।

৭৪.৫.৩ কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন

ধীরে ধীরে শহরে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ও গ্রামীণ কৃষকদের মধ্যে এদের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। সরকারি নিপীড়ন তাদেরকে আরো সংহত ও সুসংগথিত করে তোলে। পশ্চিম জাভায় ও পশ্চিম সুমাত্রায় এদের নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়। ডাচ সরকার খুব সহজেই এই বিদ্রোহ দমন করে।

৭৪.৫.৪ সাম্যবাদী আন্দোলন

Sneerliet-এর নেতৃত্ব ইন্দোনেশিয়ায় কমিউনিস্ট আন্দোলন ক্রমশই শক্তিশালী হতে থাকে এবং স্বাধীনতার আকাঙ্খা আরো তীব্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯২৭-এ ISDR প্রকাশ্যে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা দাবী করে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ১৯২০-এর দশকে (PKI) সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং ইন্দোনেশীয়দের অতিরিক্ত করের বোঝা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আন্দোলন করে। আবার (PKI)-এর প্রচেষ্টায় ঔপনিবেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থার পাশাপাশি ইন্দোনেশীয় সমাজে শিক্ষার হার বাড়তে থাকে। ১৯২৩-এ (PKI) জাভাতে রেলরোকো আন্দোলন সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করে। এই Trade union-গুলি অতি অল্প সময়ের মধ্যে (PKI) এর বিপ্লববাদী ভাবধারার বিস্তারে বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠে। ১৯২৩-২৬-এর মধ্যে অসংখ্য বন্ধ লক-আউট, হরতাল ও পথ প্রচার, মিছিল, মিটিং সংঘটিত হয়। পরবর্তীতে ডাচ সরকার (PKI)-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং এদের ১৩ হাজার সদস্যকে বহিষ্কার করে ও বিনা বিচারে বহু সদস্যকে আটক রাখে।

৭৪.৫.৫ সাম্যবাদী আন্দোলনের ব্যর্থতা

এখন প্রশ্ন হলো যে, (PKI) ব্যর্থ হলো কেন? (১) PKI বড় বেশী বিপ্লবাত্মক নীতি অধিগ্রহণ করে। (২) কৃষকদের এদের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ করতে পারেনি। কিন্তু এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও এই বিপ্লব ডাচ ও ইন্দোনেশীয়দের রাজনৈতিক মানসিকতার ওপর গভীর বিস্তার করে। কমিউনিস্টরা বুঝতে পারে তাদের পিছনে গণ-সমর্থন নেই। ডাচ শাসকরা বুঝতে পারে তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ বিক্ষুদ্ধ। তবে ১৯৬১ সালে (PKI) নেতৃবৃন্দ বলেছিলেন যে, ১৯২৬ সালের আন্দোলনকেই ডাচ শাসনের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ মানুষের প্রথম সশস্ত্র সংগ্রাম বলে বর্ণনা করলে ইতিহাসকে বিকৃত করা হবে।

৭৪.৫.৬ নাদাতুল উলেমা

১৯১৬-এ আবার 'নাদাতুল উলেমা' নামে একটি রক্ষণশীল দলের জন্ম হয়। জাভায় গ্রামীণ Santri সমাজ ছিল এই দলের সমর্থক।

৭৪.৫.৭ হল্যান্ডে ইন্দোনেশিয়ার সাম্যবাদী দল

১৯২৬-১৯২৭ সালের কমিউনিস্ট অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলে বহু ইন্দোনেশীয় কম্যুনিস্ট কর্মীকে হল্যান্ডে নির্বাসিত করা হয়। এই সময়ে হল্যান্ডে অনেক তরুণ জাতীয়তাবাদী ইন্দোনেশীয় ছাত্র পড়াশুনা করত। পেরিমপুনাম ইন্দোনেশিয়া নামে সেখানে তাদের একটি নিজস্ব সংগঠন ছিল। এরাও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

৭৪.৬ সুকর্ণ ও ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী দল

১৯১৭-এ বান্দুং স্টাডি ক্লাবের সভাপতি সুকর্ণ (nationalist Party of Indonesia) PNI গড়ে তোলেন। এদের বক্তব্য ছিল সমস্ত ইন্দোনেশিয়ায় একটি ভাষা চালু করতে হবে। এজন্য তারা একটি ভাষা তৈরি করে যায় নাম ভাষা ইন্দোনেশিয়া। এর উদ্দেশ্য ছিল ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশের মুক্তি অর্জন। পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দাবীতে Partai National Indonesia ঘোষণা করে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দাবী।

৭৪.৬.১ দলীয় গঠন ও উদ্দেশ্য

১৯২৭-এ এই দল প্রতিষ্ঠার দুবছরের মধ্যে এই দলের সদস্য সংখ্যা ১০,০০০ অতিক্রম করে। এই সময় সুকর্ণ ছিলেন (PNI) দলের অন্যতম নেতা। তিনি বলেন, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ ডাচ সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ নয়। PIN কমিউনিস্ট দল নয়, এবং (PKI) দলের উত্তরসূরী নয়। ১৯৩০-এ ডাচ সরকার (PNI)-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। আবার ১৯৩২-এ বহু হল্যান্ড প্রবাসী আন্দোলনকারীগণ দেশে ফিরে আসে। এরা অনেকেই ১৯৪২-এর জাপানী আগ্রাসনের সময় পর্যন্তও কারাবরণ করে।

৭৪.৬.২ ইন্দোনেশিয়ার বহুমুখী আন্দোলন

আবার ১৯৩৫-এ জাভার বাইরে যে বিস্তৃত অঞ্চল ছিল সেখানে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠলে Parinda বা বৃহত্তম ইন্দোনেশীয় দল আত্মপ্রকাশ করে। তবে জাভার জাতীয়তাবাদী দলগুলি শুধুমাত্র জাভার কথাই ভাবত।

আবার ১৯৩৭-এ বামপন্থীরা Gerinde বা ইন্দোনেশিয়গণ আন্দোলন গড়ে তোলে। এদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদের প্রসার। আবার ১৩৩৯-এ G.A.P.I. নামে একটি ইন্দোনেশীয় রাজনৈতিক জমায়েত গঠন করে। এই সমাবেশে রক্ষণশীল ও উগ্রপন্থী নেতারা সমবেতভাবে একটি ইন্দোনেশীয় পার্লামেন্টের দাবী জানিয়েছিল।

৭৪.৭ ইন্দোনেশিয়ার জাপানী অধিগ্রহণ ও ফলাফল

১৯৪২-১৯৪৫-এ সমগ্র দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়া জাপানের অধীনস্থ হয়। এতদিন ধরে ডাচ রাজশক্তি ইন্দোনেশিয়ার সনাতন সমাজব্যবস্থা বাঁচিয়ে রেখেছিল। কিন্তু জাপানী শাসনের দরুন সেখানকার সমাজ ও অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে জাপান ইন্দোনেশিয়ায় putera বা গণশক্তি কেন্দ্র গড়ে তোলে। একই বছরে তারা Masjumi বা ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম সংগঠনগুলির সমিতি গড়ে তোলে। ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ সরকারের পতনের পর অনেক জাতীয়তাবাদী নেতা জেল থেকে মুক্ত পায় এবং অনেকে নির্বাসিন থেকে ফিরে আসে। এরাই Putera-র নেতৃত্ব পায়। তাদের মধ্যে প্রধান হলেন সুকর্ণ। এই সময় (DNI) বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। কমিউনিস্টরা চেষ্টা করে যাতে সরকারের বা মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্যকে অপহরণ করে সরকারের পতন ঘটাবে। এই ধরনের একটি নাটকীয় প্রচেষ্টা ১৯৪৬-এ দেখা যায়।

৭৪.৮ ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা লাভ

১৯৪৫-এ ব্রিটিশরা জাভা দমন করে ও বহু ডাচকে মুক্তি দেয়। সুকর্ণকে ইন্দোনেশিয়ার প্রধান নেতা চিহ্নিত করা হয়। যদিও দেখা যায় ১৯৪৫-এর ১৭ই আগস্ট জাপানী দাক্ষিণ্যে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হয়। তথাপি ঐ বছরেই ২৯শে সেপ্টেম্বর ডাচ স্বার্থরক্ষার্থে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ইন্দোনেশিয়ায় প্রবেশ করে। মুক্তিকামী ইন্দোনেশীয় এবং সাম্রাজ্যবাদী ডাচদের মধ্যে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। পরবর্তী এক বছর ধরে ইন্দোনেশিয়ায় ভয়াবহ অরাজকতা চলে।

১৯৪৭-এর ২৫শে মার্চ ইন্দোনেশীয়রা Linggadjati চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির ধারামতে জাভা ও সুমাত্রার ওপর ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের প্রভুত্ব স্বীকৃত হয়। বাইরে দ্বীপপুঞ্জের জন্য স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থা স্থির করা

হয়। একথা বলা হয় যে, কালক্রমে এসব নিয়ে গঠিত হবে "United States of Indonesia" এবং এই ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ডাচ কমনওয়েলেথের অন্তর্ভুক্ত হবে। অবশেষে ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে উভয়পক্ষে গোলটেবিল বৈঠক হয়। আবার ১৯৫০ সালে জুন মাসে ইন্দোনেশিয়া সম্মিলিত জাতীয়পুঞ্জের সদস্যপদ লাভ করে। ঐ বছরই আগস্ট মাসে ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র প্রজাতন্ত্র ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রে (Republic of Indonesia) রূপান্তরিত হয়।

৭৪.৯ সারাংশ

ডাচ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, বৈষম্যের ফলে ইন্দোনেশিয়াতে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত হলে তা কিছু সংগঠনের দ্বারা ব্যাপ্তি ও প্রসার লাভ করে। বামপন্থী, জাতীয়তাবাদী ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা আন্দোলন পরিচালিত হলেও তা কৃষকশ্রেমিক আন্দোলন দ্বারা পুষ্টি লাভ করেছিল। এই অঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়ানগুলির ভূমিকাও উল্লেখ্য। অতিদ্রুত বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রসারে এই সংগঠনের অবদানও কম ছিল না। গণসমর্থনের অভাবে সাম্যবাদী দলগুলি এখানে সাফল্য লাভ করতে পারেনি। এসত্ত্বেও এখানকার ব্যাপক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে সফলতা পেয়েছিল।

৭৪.১০ অনুশীলনী

ক। বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। কি কি যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে ইন্দোনেশিয়াতে ডাচ কর্তৃত্বের বিস্তার হয়?

২। প্রেয়ারী কাদের বলা হতো?

৩। ইন্দোনেশিয়ার পশু চিকিৎসালয় কবে স্থাপিত হয়?

৪। আইন বিদ্যালয় কত সালে চালু হয়?

৫। সারেকাৎ ইসলামের প্রধান কে?

৬। "সারেকাৎ ডগং ইসলাম" কারা কেন তৈরি করে?

৭। Partai Indonesia কথার অর্থ কি?

৮। সারেকাৎ আন্দোলন কোন আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়?

৯। প্রথম সাম্যবাদী দলটির কত সালে প্রতিষ্ঠা হয়?

১০। ডাচ উপদেষ্টা সমিতির নাম লিখুন?

১১। PNI কে গড়ে তোলেন?

১২। কবে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করে?

খ। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। বুদি উতোমো দলের ভূমিকা আলোচনা করুন।

২। সারেকাৎ ইসলামের বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

৩। জাতীয়তাবাদী জাগরণে যবদ্বীপীয় চেতনা ভূমিকা কি ছিল?

৪। এখানে রুশ সাম্যবাদের প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

গ। দীর্ঘ উত্তরে প্রশ্ন :

১। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ত্রি-ধারাগুলি কী কী? আলোচনা করুন?

২। গণতান্ত্রিকতার সঙ্গে ইন্দোনেশিয় জাতীয়তাবাদের কী কী পার্থক্য ছিল?

৭৪.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। জহর সেন : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস ১৯৮৫, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

২। M.N. Venkatar Ramanappa : Modern Asia Vikas Publishing, 1979.

৩। Lee, E, William : South-East Asia - A History, O.U.P.

৪। G.F. Cady : South-East Asia—Its historical Developments, Megraw Hill, 1979.

৫। B.N. Pandy : South and South-East Asia, 1945-1979 : Problems and Policies, 1980.

একক ৭৫ ❐ ফিলিপাইনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

গঠন

৭৫.০ উদ্দেশ্য
৭৫.১ প্রস্তাবনা
৭৫.২ স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে প্রাথমিক বিদ্রোহ
  ৭৫.২.১ বেহেলি বিদ্রোহ
  ৭৫.২.২ ইলোকোস ও পাংগাসিনান বিদ্রোহ
  ৭৫.২.৩ স্পেনীয় নীতির পরিবর্তন
৭৫.৩ সামাজিক পরিবর্তন
  ৭৫.৩.১ জোসে রিজালের নেতৃত্বে মুক্তি আন্দোলন
  ৭৫.৩.২ রিজালের আদর্শ
  ৭৫.৩.৩ রিজালের ভূমিকা ও কার্যকলাপ
  ৭৫.৩.৪ কাটিপুনান দলের ভূমিকা
৭৫.৪ ফিলিপিন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আমেরিকার হস্তক্ষেপ
  ৭৫.৪.১ এই হস্তক্ষেপের সাম্রাজ্যবাদী কারণ
  ৭৫.৪.২ অর্থনৈতিক কারণ
  ৭৫.৪.৩ ফিলিপিন বাসীর প্রতিবাদ
৭৫.৫ ফিলিপিনের স্বাধীনতা যুদ্ধ
  ৭৫.৫.১ ফিলিপিনের বিপ্লববাদী সরকার গঠন
  ৭৫.৫.২ সাংবিধানিক উদারনীতিকরণ
  ৭৫.৫.৩ স্বাধীনতা দাবী
৭৫.৬ জাপান ও ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ
৭৫.৭ ফিলিপিনে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রভাব
  ৭৫.৭.১ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ফলাফল
৭৫.৮ সারাংশ
৭৫.৯ অনুশীলনী
৭৫.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৭৫.০ উদ্দেশ্য

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উপমহাদেশে ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এই এককটি অধ্যায় করে আপনারা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগত জানতে পারবেন—

- ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক চেতনার অভাব।
- নিষ্ঠুর স্পেনীয় শাসন।
- স্থানীয় বিদ্রোহ।
- ধীর গতি সামাজিক পরিবর্তন ও আত্মচেতনতা বৃদ্ধি।
- অর্থনৈতিক পরিবর্তন।
- আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী নীতি।
- ফিলিপিনের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও স্বাধীনতা লাভ।

৭৫.১ প্রস্তাবনা

সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে ফিলিপিন্‌সের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। খ্রিস্টীয় শতকের প্রথমে এই দেশটি ইন্দোনেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কতকগুলি ছোট বড় বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এদের কোন নিজস্ব সাধারণ ভাষা, বা আত্মসংহতি বোধ বা ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক চেতনা গড়ে ওঠেনি যখন স্পেনীয় শাসনের বেড়াজালে এরা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তবে পরবর্তীকালে যাজকীয় অনুশাসন এবং স্পেনীয় ও আমেরিকার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী নীতির পরিপ্রেক্ষিতে এদের মধ্যে আত্মসচেতনতা বোধ জন্মায় এবং পশ্চিমী শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের শিক্ষিত করে এক ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলন জন্ম দিতে এরা সক্ষম হয়।

৭৫.২ স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে প্রাথমিক বিদ্রোহ

স্পেনীয় ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম তিন দশক ধরে ফিলিপাইনের যে ইতিহাস তা হলো অমানুষিক অত্যাচার, সামাজিক বৈষম, জাতিগত দ্বারা ও যাজকীয় অত্যাচারে কাহিনী। এই ধরনের অকথ্য অত্যাচারে ফলস্বরূপ ১৭৪৪-এ বোহল বিদ্রোহ এবং ১৭৬০-এ পাঙ্গাসিনান ও ইলকোস বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। উপরিউক্ত তিনটি বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই ফিলিপাইনবাসীর অতৃপ্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা ও জাতীয়তাবোধ প্রকাশিত হয়।

৭৫.২.১ বেহোল বিদ্রোহ

বোহল বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় এক নাটকীয় পরিস্থিতিতে। স্থানীয় এক প্রশাসকের ভ্রাতার মৃত্যুর পর তাঁকে সমাধিস্থ করতে যাজকদের আপত্তি দেখা দেওয়ায় Francisco Dagahoy (ফ্রানিস্‌সকো দাগাহয়) অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ভ্রাতা এবং স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি যাজকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, যাজকদের হত্যা করে এবং তাদের সম্পত্তি বিনষ্ট করে। কিন্তু তার মৃত্যুর পর ও তার অসংখ্য অনুগামীরা এই বিদ্রোহ চালিয়ে যায় ১৮২৯ পর্যন্ত।

৭৫.২.২ ইলকোস ও পাঙ্গাসিনান বিদ্রোহ

অপর দুটি বিদ্রোহ পাঙ্গাসিনান ও ইলকোসের নেতৃত্ব দেন যথাক্রমে জুয়ান ডেলা ক্রুজ পোলারিশ এবং দিয়াগো সিলং। উপরিউক্ত উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ দুটি-ই প্রথম আত্মসচেতন মূলক স্বাধীনতা বিদ্রোহ। বিশেষ করে ১৭৬২ তে যখন ব্রিটিশরা ম্যানিলা আক্রমণ করে তখন থেকে এই বিদ্রোহ আরো ও জোরদার হয়ে ওঠে। এরা প্রাদেশিক ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দাবী করে আবার উচ্চ সামরিকপদে স্থানীয় ব্যক্তির পদমর্যাদা দাবী করে। সিলং ও পোলারিশ উভয়েই স্থানীয় স্বাধীন সরকার গঠন করেন, তথাপি দুর্ভাগ্যবশতঃ কারাবরণ করেন ও মৃত্যুমুখে পতিত হন। তবুও সিলং এ বিধবা অসম সাহসী পত্নী গ্রাব্রিয়েলা তার মৃত্যুর কয়েকমাস পর ও এই বিদ্রোহ চালিয়ে যান। যদিও উপরিউক্ত তিনটি আন্দোলন-ই ছিল কঠোরভাবে আঞ্চলিকতা বাদে পরিপূর্ণ তথাপি ঊনবিংশ শতকের শেষে এই তিনটি বিদ্রোহ-ই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

৭৫.২.৩ স্পেনীয় নীতির পরিবর্তন

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে দেখা যায় স্পেনীয় ঔপনিবেশিক নীতির পট পরিবর্তন ঘটে। বাণিজ্যিক চাষাবাদ ও কোলিয়ারী বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা হয়। তবে বাণিজ্যিক অর্থকরী ফসল যেমন—তামাক, নীল, চিনি, উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া হয়। ম্যানিলাকে বিদেশী জাহাজ আগমনের নিমিত্ত উন্মুক্ত করা হয়। এই পরিবর্তনের ফলস্বরূপ দেখা যায় একদল বাণিজ্যিক, কৃষিভিত্তিক সন্ত্রাস শ্রেণী ইন্দোনেশিয়াতে গড়ে ওঠে। এরাই ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফিলিপাইন মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব দেয়।

আবার ১৮৩৪-এর মুক্ত বাণিজ্য নীতির পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নাবিক ও বণিকেরা এখানে আসতে থাকে। আবার ১৮৬৯-এ সুয়েজ খাল উন্মুক্ত হওয়ার দরুণ ফিলিপাইনের সঙ্গে ইওরোপের বাণিজ্যিক দরজা উন্মুক্ত হয়। সুতরাং স্পেনীয় ঔপনিবেশিক শাসকরা এর ফলে বন্দর ও পরিবহন পরিকাঠামোর উন্নয়নে বাধ্য হয়ে সচেষ্ট হয়। সুতরাং জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে বিদেশী পুঁথি, বিদেশী দ্রব্য, এবং সর্বোপরী বিদেশী চিন্তা-ভাবনা বিনিময়ে আরোও সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। সুতরাং প্রত্যেক জমিদার ও সম্পন্ন ব্যবসায়ীরা তাদের পরিবারের অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক সদস্যদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠাতে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

৭৫.৩ সামাজিক পরিবর্তন

এরই ফলস্বরূপ ১৮৫৫ থেকে ১৮৭২-এর মধ্যে ফিলিপাইনের সামাজিক পরিকাঠামোয় যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যায়। ১৮৩৬-এর শিক্ষা সংক্রান্ত আইনে বলা হয়— প্রত্যেক পাবলোতে বাধ্যতামূলকভাবে একটি করে বিদ্যালয় থাকবে, যেখানে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হবে। আবার স্পেনীয় ভাষা ও সাহিত্য বাধ্যতামূলক ভাবে পড়তে হবে। এছাড়া কৃষি মহাবিদ্যালয় গঠন করা হয়। এমতাবস্থায় বহু সমালোচনামূলক পত্রিকা, পাক্ষিক পত্রিকা, গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ফিলিপাইনের যুব সমাজ সচেতন হয়ে ওঠে এবং এরা নিজেদের উচ্চশিক্ষিত করতে স্পেন, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং জার্মানীতে যায়।

৭৫.৩.১ জোসে রিজালের নেতৃত্বে মুক্তি আন্দোলন

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে রিজালকে ব্যাতিরেকে ফিলিপাইনের জাতীয়তাবাদ সম্পন্ন হতে পারে না। রিজাল ফিলিপাইনের (Calamba) ক্যালাম্বা নামক শহরের এক ক্যাথলিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই শহরে ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের বিশেষ প্রভাব বেশী ছিল। এই যাজকরা জনসাধারণের জীবন ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করত। শৈশব থেকে রিজাল ছিল ধর্মভাবাপন্ন। যাজকদের স্পর্শে আসার পর তার জীবন নানাভাবে চালিত হয়। একটু বড় হওয়ার পর তিনি উপলব্ধি করলেন যাজকরা কৃষকদের ওপর প্রচণ্ডভাবে শোষণ ও অত্যাচার করে।

১৮ বৎসর বয়সে তিনি উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য স্পেনে গমন করেন। এবং দেশে ফিরে এসে তার এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর লিখিত "To the philippines youth" এই কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি দেশপ্রেম জাগানোর চেষ্টা করেন, আবার অত্যাচারেরও ইঙ্গিত রাখেন।

স্পেনে থাকাকালীন রিজাল ইউরোপের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেন এবং গভীরভাবে উপলব্ধি করেন যে, স্পেনের উপনিবেশিকতার হাত থেকে ফিলিপাইনকে মুক্তি দিতে হলে (১) এদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে তাদেরকে আত্মসচেতন করে তুলতে হবে। (২) ফিলিপাইনের বিদেশী ধর্মযাজকদের অত্যাচার ও শোষণের কাহিনীকে বিজ্ঞাপিত করতে হবে।

৭৫.৩.২ রিজালের আদর্শ

রিজাল এবং তার সতীর্থরা কেউই বিপ্লববাদী ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন সংস্কারবাদী। সংস্কারের মধ্য দিয়ে দেশকে জাগিয়ে তোলাই তাঁদের একান্ত উদ্দেশ্য ছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, হঠাৎ করে দেশের মাটি থেকে স্পেনীয়দের বিতাড়িত করা যাবে না, আবার স্বাধীনতার জন্য মানসিক প্রস্তুতিও এদের হয়নি। সুতরাং স্পেনীয় শাসন আরোও কিছুদিন অবস্থান করুক। তিনি তৎকালীন প্রকাশিত "La Solidaridad" পত্রিকাতে বলেন, "ফিলিপিন্‌সের অগ্রগতির যারা বাধাদানের চেষ্টা করছে, তিনি তাদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছেন।"

৭৫.৩.৩ রিজালের ভূমিকা এবং কার্যকলাপ

১৮৮৭-তে রিজালের "Tangere" নামে একটি বিখ্যাত নভেল প্রকাশিত হয়। এই নভেলের মধ্য দিয়ে তিনি ঔপনিবেশিক সরকারের কাছে আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে সুবিচার ও নায্য অধিকার লাভের জন্য জোর দেন।

এই সময় গর্ভনর জেনারেল ছিলেন Terrero। তিনি কিছুটা উদারনৈতিক মতবাদী হলেও যাজকদের চাপে রিজালের কীর্তিকলাপকে পরবর্তীতে সমর্থন করেননি। দেখা গেল রিজালের উপন্যাস, পত্রিকা ইত্যাদি পড়ে ফিলিপাইনের জনগণের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা বেড়ে গেল। সুতরাং ধীরে ধীরে ফিলিপাইনের জনগণের মধ্যে নবচেতনার উন্মেষ হলো।

এরপর রিজাল স্বদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করে যাজকদের অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি গোপন রিপোর্ট তৈরি করেন। তা Terrero-র নিকট পাঠান। এই ঘটনার পর ধর্মযাজকরা রিজালের পরিবারের ওপর চরম অত্যাচার আরম্ভ করে।

১৮৮৮-তে রিজাল ও তার সহযোগীরা মিলিতভাবে যাজকীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি পুস্তিকা বের করেন। আবার ১৮৮৯ তে রিজালের দ্বিতীয় উপন্যাস "Le Flibusterismo" প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের নায়ক সিমন সরাসরি বিপ্লব ও সন্ত্রাসের ডাক দেন স্বাধীনতা লাভের জন্য।

রিজাল "Liga Filipina" নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল ফিলিপাইন অন্তরীপের সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং দেশের সর্বাত্মক উন্নতি সাধন করা। কিন্তু এই সংগঠনের পক্ষ থেকে সরাসরি বিপ্লবের ডাক দেওয়া হয়নি, সংগঠন স্থাপিত হওয়ার পর দুদিনের মধ্যেই রিজালকে গ্রেপ্তার করা হয় ও Dapitan নামক স্থানে নিবাসিত করা হয়।

৭৫.৩.৪ কাটিপুনান দলের ভূমিকা

এরপর রিজাল নিবাসিত হওয়ার পর কাটিপুনান নামে একটি নতুন সংগঠন তৈরি করা হয়। যার নেতৃত্ব দেন অ্যান্ড্রেশ বেনিফ্যাসিও। বেনিফ্যাসিওর নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতার জন্য কাটিপুনান পুরোপুরি হিংসাশ্রয়ী বিপ্লবের ডাক দেয়। এই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা অচিরেই ব্যর্থ হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৯৬-এর ৩০শে ডিসেম্বর রিজালকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সুতরাং দেখা যায় রিজালের চরিত্রের বীরগতি ও শৌর্য এবং তার লেখনী ফিলিপাইনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথকে সুগম করে তোলে।

৭৫.৪ ফিলিপিন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আমেরিকার হস্তক্ষেপ

ফিলিপাইনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে আমেরিকার হস্তক্ষেপ এক নতুন মাত্রা যোগ করে। ফিলিপাইনের জাতীয়তাবাদী নেতা আগিনাল্ডো আমেরিকার কনসাল ও কমোডর জর্জ ডিউ-ই এর সঙ্গে এক

মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হতে স্বীকৃত হয়। এই মিত্রতার উদ্দেশ্য ছিল ক্যারাবিয়ান সমুদ্রের ওপর থেকে স্পেনীয়দের আধিপত্য বিনষ্ট করা এবং স্পেনীয় উপনিবেশিক শাসকদের ফিলিপাইন থেকে বিতাড়িত করা। এই মিত্রতার চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকা হংকং-এর মাধ্যমে ম্যানিলা বন্দরে অস্ত্র পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু অচিরেই দেখা যায় আমেরিকা তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। এবং স্পেনের সঙ্গে গোপন বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। ২০ লক্ষ ডলারে বিনিময়ে উভয়ের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আবার যুদ্ধকালীন ক্ষতিপূরণের কথাও বলা হয়। আবার স্পেন ফিলিপাইনের নিকট থেকে অর্থাৎ বকলমে আমেরিকার কাছ থেকে আগামী দশ বছরের জন্য বাণিজ্যিক অধিকার ভোগের সুবিধা লাভ করে।

৭৫.৪.১ এই হস্তক্ষেপের সাম্রাজ্যবাদী কারণ

এখন প্রশ্ন হলো কেন আমেরিকা ফিলিপাইনের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের অধিকার লাভে আগ্রহী হলো? আমেরিকার বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ Richard Hofstadter-এ বিষয়ে বলেছেন যে, "আসলে ১৮৯৯-এ স্পেনের নিকট থেকে ফিলিপাইনের অধিকারের মাধ্যমে আমেরিকা তার জাতির ইতিহাসের মাথায় আর একবার শৌর্যের মুকুট পরিয়ে দিল। এটার দ্বারাই আমেরিকা তার নয়া সাম্রাজ্যবাদী নীতির জয়যাত্রার সূচনা করল।"

অপর দুজন আমেরিকান সমাজবাদী বিশেষজ্ঞ John Fiske ও Alfred Thayer Mahan বলেছেন যে, সামুদ্রিক শক্তির আধিপত্যের ওপরেই কোন জাতির মেরুদণ্ড নির্ভর করে। বিশেষ করে আমেরিকা বুঝেছিল তার ক্রমবর্ধমান কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন, বৃদ্ধি ও তার সরবরাহের ক্ষেত্রে সামুদ্রিক পথের গুরুত্ব অপরিসীম। পার্শ্ববর্তী বাজারে পণ্যের যোগান ও পণ্য আমদানী রপ্তানী করতে গেলে জলপথের বিশেষ প্রয়োজন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আমেরিকার এই নয়া সাম্রাজ্যবাদী নীতির পশ্চাতে গুরুত্বপূর্ণ অর্থে সামাজিক কারণ দায়ী। তবে Darwin, Fiske, ও Mahan-এর এই মতবাদগুলি ১৮৯০-এর দশক থেকে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

৭৫.৪.২ অর্থনৈতিক কারণ

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৮৯৩-এর অর্থনৈতিক মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে এবং ইওরোপীয় দেশগুলির বাণিজ্যিক নীতির দরুণ আমেরিকার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ক্রমেই হ্রাস পেতে শুরু করে। এমনকি এই দশকের শেষে চীনারা ও ইউরোপীয় বাণিজ্যিক মাপকাঠির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে। নিউইয়র্ক চেম্বার অফ্ কর্মাসের বিবৃতি অনুযায়ী দেখা যায় যে, একমাত্র এই অবস্থা থেকে আমেরিকার নিজেকে রক্ষা করতে হলে প্রয়োজন সুদূর প্রাচ্যের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নিজের ফায়দা তুলে আনার। সেক্ষেত্রে ফিলিপাইন ছিল একমাত্র নির্ভরযোগ্য স্থান।

আবার Newyark Commercial নামক পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, এই ব্যবস্থার দ্বারা আমেরিকা প্রায় বার্ষিক হারে ৮৫০ লক্ষ্য ফিলিপাইন বাসীর নিকট খাদ্যশস্য ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় করে। এছাড়াও ফিলিপাইনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চল জুড়ে খামার, শস্য মাড়াই কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। সুতরাং উপরিউক্ত বিবরণ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে বিখ্যাত কবি Rudyard Hipling এই উদ্দেশ্যেই লিখেছেন "The White Man's Burden"

যা পরবর্তীতে আমেরিকা কৌশলগতভাবে স্পেন ও ফিলিপাইনের ওপর Brown's Man Burden-এ রূপান্তরিত করে।

Social Welfre : সামাজিক অভিঘাত অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার পাশাপাশি সামাজিক অভিঘাত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টার দরুণ ১০০০ চিকিৎসালয় ও বহু মুক্ত কেন্দ্র গড়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, ১৯০০-১৯৪০-এর মধ্যে শিশু মৃত্যুর হার রদ করা হয়।

উপরিউক্ত কৃতিত্ব ছাড়া ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার প্রধান কৃতিত্ব হল শিক্ষাগত সংস্কার। এরা প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও নিরপেক্ষ করে তোলে। শিক্ষার ৫০% সরকারী খাতে ব্যয় করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পর্যন্ত জাপানের মতো ফিলিপাইনে জনশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। বর্তমানে ফিলিপাইনের শিক্ষার যে মাধুর্য্য, উৎকর্ষতা সবই বিগত দিনের V.S. শাসনের বাস্তবায়িত রূপ।

৭৫.৪.৩ ফিলিপিন বাসীর প্রতিবাদ

আমেরিকার নয়া সাম্রাজ্যবাদী নীতির নিকট ফিলিপাইন কখনোই মাথা নত করেনি। আগিনাল্ডো ও তার অনুগামীদের স্বাধীনতার যুদ্ধ তথাপি অব্যাহত ছিল। দেশের বিভিন্ন অংশে এরা এদের বিজয় পতাকা উড্ডীন করে। অবশেষে ১৮৯৭-তে অগিনাল্ডো প্রজাতন্ত্রের দাবী করেন। এরা প্রজাতন্ত্রী রাজধানী স্থাপন করে বুলাকন প্রদেশে এবং সাংবিধানিক বিধান পরিষদের হাতে সংবিধান তৈরির খসড়া করতে দেওয়া হয়। ১৮৯৯-এর সংবিধানের প্রকৃত ছিল ত্রিধারায় বিভক্ত— আইনগত, বিচারগত ও মুখ্য কার্যনিবহীগত। এই প্রস্তাবনায় ফিলিপাইনের সঙ্গে আমেরিকার সংযুক্তির প্রতিবাদ করা হয়। অন্যদিকে ফিলিপাইনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সর্বত্র স্বাগত জানানো হয়।

ক্রমে ক্রমে আমেরিকার নয়া সাম্রাজ্যবাদী নীতির চাপে ফিলিপাইন বাসী হতাশাগ্রস্ত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বেকারী, অমানবিক ব্যবহার, বাণিজ্যিক অনধিকার, অর্থনৈতিক অব্যবস্থা এদের মনে জাতীয়তাবাদী গেরিলাদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতির সঞ্চার করে।

৭৫.৫ ফিলিপিনের স্বাধীনতা যুদ্ধ

১৯০২-২ এর মধ্যে এই যুদ্ধ বিশদ আকার ধারণ করে। সমগ্র ফিলিপাইন জুড়ে হত্যা, রক্তলীলা শুরু হয়। নিরীহ, অসহায় ফিলিপিনবাসী বিনা দোষে প্রাণ বিসর্জন দেয়। শুধু তাই নয় চলে সেই সঙ্গে তাদের ঘর-বাড়ি, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ওপর হামলা। এমনকি নিরীহ শিশুরাও এই অত্যাচারে হাত থেকে রেহাই পায়নি। এদিকে আবার কিউবাতে যে স্পেন আমেরিকার যুদ্ধ হচ্ছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকা নির্দেশ দেয়

Marindeque দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের পাঁচটি ক্যাম্পে বিভক্ত করে পাঠাতে। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, এই সময় প্রায় ১০০,০০০ লক্ষ ফিলিপাইনবাসী তাদের জীবন বিসর্জন দেয় আমেরিকার সেনাবাহিনীর হাতে। আবার হাজার হাজার ফিলিবিনাসী তাদের ঘরবাড়ি হারায়।

১৯০১-এর মার্চে আগিনাল্ডো ফ্রেডারিক ফানস্টেনের হাতে বন্দী হন, তথাপি স্বাধীনতা যুদ্ধ চলতেই থাকে। এদিকে ১৯০২-এর এপ্রিলে ফিলিপাইন জেনারেল মিখুরেল মালাবার বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পন করেন। কেননা তাঁর আত্মসমর্পনের ওপর নির্ভর করছিল বিভিন্ন ক্যাম্পগুলিতে অবস্থিত প্রায় ৩ লক্ষ ফিলিপাইনবাসীর মুখের খাদ্যশস্য। অবশেষে সরকারীভাবে ১৯০১-এর যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা হয়। আবার ১৯০৪ এ সকল ফিলিপাইনবাসীর জন্য বিশেষ করে বন্দীদের থেকে পৃথকীকরনের জন্য “Identity Card System” বা পৃথক পরিচয় পত্র প্রদান করা হয়। অবশেষে ১৯০৪-এর পর থেকে বিদ্রোহের তীব্রতা কমে আসতে থাকে। তবে যুদ্ধে কত কার ক্ষয়ক্ষতি হলো তার হিসাব দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। আমেরিকার সেনেটের রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, প্রায় ৬ লক্ষ ফিলিপাইনবাসী যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বা বিভিন্ন ক্যাম্পে থাকার সময় রোগাক্রান্ত অবস্থায় মারা যায়। তবে এই দেশের স্বাধীনতা সম্পন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ৭ লক্ষ মানুষ মারা যায়।

৭৫.৫.১ ফিলিপিনে বিপ্লববাদী সরকার গঠন

এদিকে চূড়ান্তভাবে ১৮৯৭ বিয়াকনাবাটোর সন্ধির মধ্য দিয়ে যুদ্ধের অবসান হলো। স্পেন যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রায় ৪০০,০০০ পেসিটাস অর্থের অঙ্ক এদের কিস্তিতে দেওয়ার অঙ্গীকার করে। তবে এই চুক্তি শীঘ্রই ভঙ্গ হলো। অগিনাল্ডো ও তার অনুগামীরা প্রথম কিস্তির ৪০০,০০০ পেস্তাস, সিঙ্গাপুর ও অস্ত্রশস্ত্র চুক্তি মতো গ্রহণ করল। তবে সংস্কারের বিষয়ে স্পেন বা আমেরিকা উভয়েই কোন উচ্চবাচ্য করল না, কিন্তু এই চুক্তির প্রধান অঙ্গই ছিল সংস্কার। তবে ফেব্রুয়ারীর ১৮৯৮-তে নূতন দিশা দেখা গেল। মধ্য লুজেন প্রদেশে জেনারেল Francisco Makabulos-এর প্রচেষ্টায় বিপ্লববাদী বা জাতীয়তাবাদী সরকার গঠিত হল। ১৮৯৮-এর ১লা মে ফিলিপাইন থেকে বা ম্যানিলা বন্দর থেকে স্পেনের নৌবহর চিরতরে অদৃশ্য হয়ে গেল আমেরিকার রণতরীর প্রাধান্যে।

৭৫.৫.২ সাংবিধানিক উদারনীতিকরণ

১৯১২-তে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সমাজতন্ত্রী দলের জয় ফিলিপাইনের স্বাধীনতা লাভের পথকে সুগম করে। এই নির্বাচনের পরে ১৯১৬-এর Jones Act অনুযায়ী ফিলিপাইনের সংবিধানিক উন্নয়নের কথা বলা হয়। এই আইন অনুসারে ফিলিপাইনকে পুরোপুরি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদানের কথা বলা হয় এবং কয়েকটি বিশেষ অধিকার গর্ভনর জেনারেল ও আমেরিকার রাষ্ট্রপতির হাতে দেওয়ার কথা বলা হয়। সুপ্রীম কোর্টও এই অনুসারে স্থাপন করা হয়। শিক্ষিত ব্যক্তিদের নির্বাচিত করা হয়। ফলে একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় যে, আমেরিকার আমলাদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। ১৯১৩-তে যা ছিল ২৬০০ তা ১৯১১-এ দাঁড়ায় ৬১৪ জন। আবার ফিলিপাইন আমলাতন্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

৭৫.৫.৩ স্বাধীনতার দাবী

এদিকে ১৯১৯-৩৪-এর মধ্যে আবার ফিলিপাইন উত্তাল হয়ে ওঠে স্বাধীনতার দাবীতে। বিশেষ করে আমেরিকার প্রশাসকের সঙ্গে ফিলিপাইন জাতীয়তাবাদীদের বিরোধ চরমে ওঠে। আবার ১৯৩০-এর অর্থনৈতিক মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে নাটকীয়ভাবে অর্থনৈতিক সুবিধাভোগী শ্রেণী, যারা এতদিন স্বাধীনতার বিরোধী ছিল, তারাও যোগ দেয়। তামাক ও চিনি ব্যবসায়ীরা উদার আমদানি রপ্তানী বাণিজ্যের দাবী জানায়। আবার তৈলবীজ ও ডেয়ারী মালিকরা ও তাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সুতরাং এতদ্ অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩০-এর গণতান্ত্রিক দলের জয় এই স্বাধীনতার পথকে আরো ও সুগম করে তোলে। এই অনুসারে কমন্‌ওয়েলথ তৈরী হয় এবং ১৯৪৬-এ ফিলিপাইনের স্বাধীনতা সম্পন্ন হয়।

৭৫.৬ জাপান ও ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই ফিলিপাইন জাপানের নিকট অধিক গুরুত্ব পায়। এখানকার লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ এবং তামা বাণিজ্যের জাপান বেশ কিছু অংশ ক্রয় করে। যখন ১৯৪১-এর জুলাই-তে জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করে, তখন জেনারেল ম্যাক আর্থরিকে আমেরিকা নির্দেশ দেয় ফিলিপাইনে সেনা সমাবেশ করতে। এর পরেই অর্থাৎ ১৯৪২ এর ১৭ই মার্চ জাপান ফিলিপাইন আক্রমণ করে। এবং আমেরিকা পর্যুদস্ত হয়। জাপান এই সুযোগে ফিলিপাইনকে একটি পুতুল সরকার তৈরি করে। আবার ১৯৪৩ এরপর ম্যাকআর্থারের প্রচেষ্টায় ফিলিপাইন ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে মুক্তি পায় ও ১৯৪৬-এ ফিলিপাইন প্রথম এশিয়ার স্বাধীন দেশরূপে পশ্চিমী ঔপনিবেশিকতাবাদে অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়।

ফিলিপাইনকে আমেরিকা স্বাধীনতা দিলেও ফিলিপাইন থেকে আমেরিকার ঘাঁটি তুলে নেয়নি। আবার ইতিমধ্যে ১৯৪০-এর দশকের শেষ থেকে ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়। সমাজতন্ত্রী রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরস্পরের বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে। ব্যাপারটা আরোও ঘোরতর হয় যখন ভিয়েৎনাম থেকে ফরাসীরা উৎখাত হলো। তবে ভিয়েতৎনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ফিলিপাইনের সামরিক ঘাঁটি আগলে রাখা আমেরিকার পক্ষে জরুরী হয়ে পড়েছিল।

সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ফিলিপাইনের মধ্যে কমউনিজম্ বা সাম্যবাদের প্রসারের ভীতি আমেরিকার মনে ছড়িয়ে পড়ে। আমেরিকা উপলব্ধি করে যদি সাম্যবাদের হাত থেকে রক্ষা পেতে হয় তাহলে শক্তিশালী মিত্রশক্তির প্রয়োজন এবং এই কারণেই আমেরিকা তার সামরিক ঘাঁটিগুলি অক্ষুণ্ণ রাখে।

এছাড়া সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ হিসাবে ফিলিপাইনের পক্ষে তার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড সোজা রাখা সম্ভব নয়। সে কারণে ফিলিপিন্স ভেবেছিল আমেরিকাকে সামরিক ঘাঁটি করতে দিলে কিছু অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়া যাবে।

৭৫.৭ ফিলিপিনে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ফলাফল

উপরিউক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ফিলিপাইন ও আমেরিকার মধ্যে কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যেমন — (১) Military Base Agreement (২) Military Assistance Agreement ও (৩) Mutual Defence Treaty স্বাক্ষরিত হয়।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও দেখা যায় এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে যখন কমিউনিজম্‌ দ্রুত প্রসার লাভ করছে তখন সাম্যবাদের ঢেউ Philippines-কে ও আঘাত করে। ১৯৩০ থেকেই সাম্যবাদী আন্দোলন প্রসার লাভ করতে থাকে। এবং মাও-পন্থী ফিলিপিন সাম্যবাদী দলের উত্থান হয়। ১৯৩০-এর নভেম্বর P.K.P. বা ফিলিপাইন কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। ফিলিপাইনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এই দলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯৩০-১৯৭৪ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘকাল ধরে Philippines-এর অর্থ সামাজিক রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ক্ষেত্রে P.K.P. ছায়াসঙ্গী হিসাবে অবস্থান করছে। ১৯৮০ দশকে ও P.K.P. একটি দলীয় সংবিধান প্রবর্তন করে যা ভবিষ্যৎ কমিউনিস্ট আন্দোলনের গতিকে তীব্রতর করতে সাহায্য করে।

৭৫.৮ সারাংশ

আলোচ্য এককটিতে বর্ণিত হয়েছে ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের এক ধারাবাহিক জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস। প্রাক্ ঔপনিবেশিক পর্বে রাজনৈতিক সংহতির অভাবে দ্বীপবাসী স্পেনীয় সাম্রাজ্যবাদী নিষ্ঠুর শাসনের শিকার হয়েছিল। ধীরে ধীরে বিভিন্ন বিদ্রোহ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে দ্বীপবাসীর জাতীয়তাবাদী চেতনা আত্মপ্রকাশ লাভ করে। শিক্ষার প্রসারের ফলে তাদের মধ্যে আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পায়। দেশের সর্বত্র বিদ্যালয়, কৃষি মহাবিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠার ফলে শিক্ষিত গোষ্ঠীর উত্থান হয়। তাঁদের নানাবিধ রচনাবলী জনগণের বৈপ্লবিক চিন্তার উন্মেষ ঘটায়। ইতিমধ্যে আমেরিকার কাছে স্পেনের পরাজয় ঘটে ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে স্পেনীয় শাসনের অবসান হয় এবং স্পেনের পরিবর্তে আমেরিকার নয়া সাম্রাজ্যবাদ শুরু হয়। সুদীর্ঘ কাল ধরে নানা উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের প্রচেষ্টায় ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ স্বাধীনতা লাভ করে।

৭৫.৯ অনুশীলনী

ক। বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। রিজালের একটি বিখ্যাত কবিতার নাম লিখুন।

২। কাটিপুনান কি?

৩। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ কবে স্বাধীন হয়?

৪। ঔপনিবেশিক বিদ্রোহগুলির নাম লিখুন?

৫। সুয়েজ খাল কবে উন্মুক্ত হয়?

৬। রিজাল প্রকাশিত পত্রিকার নাম কি?

৭। ১৮৯৭ সালের সন্ধি কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়? সন্ধিটির নাম কি?

৮। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূচনায় আমেরিকা ফিলিপিনের সঙ্গে কি কি চুক্তি স্বাক্ষর করে?

খ। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। বেহোল বিদ্রোহের পটভূমি লিখুন।

২। বেহোল, পাংগাসিনান ও ইলোকোস বিদ্রোহের মধ্যে সাদৃশ্য বর্ণনা করুন।

৩। ফিলিপিনে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রভাব কী হয়েছিল?

৪। এর ফলাফল বর্ণনা করুন।

গ। দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

১। ফিলিপিনের স্বাধীনতা আন্দোলনের জোস রিজালের ভূমিকা আলোচনা করুন।

২। ফিলিপাইনে স্পেনীয় ঔপনিবেশিকতার পটভূমি কী ছিল?

৭৫.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। Kalilash K. Beri : History and Culture of South East Asia Starling Publisher 1994.

২। Khoo Key Kim (ed) : History of South-East, South and East Asia—Essays and Documents O.U.P. 1977.

৩। G. CEDES ranslated by H.M. Wright : The Making of South-East Asia. rontledge and Kegan paul 1970.

৪। D.R. Sardesai : South-East Asia—Past and Present. Vikas Publishing 1981.

একক ৭৬ ❑ থাইল্যাণ্ডের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

গঠন

- ৭৬.০ উদ্দেশ্য
- ৭৬.১ প্রস্তাবনা
- ৭৬.২ থাই-রাষ্ট্র, সরকার ও জনগণ
  - ৭৬.২.১ ধর্ম : থাইল্যান্ডের স্বাধীনতার পরিচালিকা শক্তি
  - ৭৬.২.২ থাই, রাজতন্ত্র : জাতীয় সংহতির স্তম্ভ
- ৭৬.৩ ১৯৩২-এর সাংবিধানিক বিপ্লবের পশ্চাদ্‌পট বা পটভূমি
  - ৭৬.৩.১ ১৯৩২-এর সাংবিধানিক বিপ্লব
  - ৭৬.৩.২ প্রিদি ও তাঁর পিপল'স পার্টি
  - ৭৬.৩.৩ প্রিদির ক্ষমতাচ্যুতি ও রাজতান্ত্রিক দলের পুনঃ আগমন
- ৭৬.৪ থাই রাজনীতির তিনটি উপাদান
- ৭৬.৫ থাইল্যান্ড ও জাপান মৈত্রী
  - ৭৬.৫.১ থাই-জাপ মৈত্রীর প্রভাব
- ৭৬.৬ ফিবুনের পদত্যাগ ও থাই কম্যুনিস্ট পার্টির বৈধকরণ
  - ৭৬.৬.১ সামরিক সাসনের অর্ধশতকঃ ফিবুনের প্রত্যাবর্তন ১৯৪৮-১৯৫৭
- ৭৬.৭ সারিত থ্যানমের শাসনকাল ১৯৫৭-১৯৭৩
  - ৭৬.৭.১ থ্যানমের শাসনকালে তাই-আমেরিকীয় সম্পর্ক
- ৭৬.৮ থাই-ছাত্র আন্দোলন ও নাগরিক শাসন
  - ৭৬.৮.১ থাই-গণতান্ত্রিক ঐক্যবদ্ধ দলের প্রতিষ্ঠা
  - ৭৬.৮.২ থাই-জনমানস
- ৭৬.৯ সারাংশ
- ৭৬.১০ অনুশীলনী
- ৭৬.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৭৬.০ উদ্দেশ্য

থাইল্যান্ডের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। আলোচ্য এককটিতে এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলি উপস্থিত করা হয়েছে। নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি তাই জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাপালন করেছিল—

- থাইল্যান্ডের শক্তিশালী রাজতন্ত্র
- রাজতন্ত্রের বাস্তবমুখী নীতি
- থাই বৌদ্ধধর্ম
- স্বাধীনতাপ্রিয় থাই জনগণ
- সাংবিধানিক বিপ্লব
- বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা

৭৬.১ প্রস্তাবনা

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে থাইল্যান্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। থাই জাতীয়তাবাদ, ধর্ম এবং রাজতন্ত্র থাইল্যান্ডের ঐক্য, শক্তি এবং স্থায়িত্বের মৌলিক উপাদান। এই তিনটি উপাদান থাইল্যান্ডের দীর্ঘ ইতিহাসে তার স্বাধীনতার এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সহায়ক হয়েছে। উপরিউক্ত তিনটি জাতীয় স্তম্ভ এদেশের ৪ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছে। বিশেষ করে রাজা মঙ্কুট (Mongkut) ও চুলালংকর্ণ'র (Chulaongkorn) যৌথ প্রয়াস থাইল্যান্ডকে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয়ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য অর্জনে সহায়তা প্রদান করেছিল।

৭৬.২ থাইরাষ্ট্র, সরকার ও জনগণ

থাইল্যান্ডের অধিবাসীরা সর্বকালেই স্বাধীনতাপ্রেমী ছিল। থাইল্যান্ডের সরকারী ব্যবস্থায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসাবে পরিগণিত। একটি উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে, সুখোতাই যুগের (১২৩৮-১৩৫০) একটি শিলালেখতে বলা হয়েছে যে, দেশের কোন মানুষ যদি হাতীর ব্যবসা করতে চায়, তাহলে তার সে স্বাধীনতা আছে। কোন কোন ঐতিহাসিক এই লেখকে জনসাধারণের স্বাধীনতার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বৃহৎ পরিবারের কর্তা যেমন পরিবারের সকলের স্বার্থরক্ষায় সচেতন, অনুরূপভাবে সেযুগের সরকার প্রজাসাধারণের কল্যাণে যত্নশীল। পরবর্তী আয়ুথিয়া যুগেও থাইল্যান্ডের অধিবাসীরা স্বাধীনতা ভোগ করত। আবার চক্রী রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পরে ও রাজধানী থনবুরি থেকে ব্যাংককে স্থানান্তরিত হওয়ার পর ও থাই অধিবাসীরা

পুরোপুরি স্বাধীনতা ভোগ করত। গণতন্ত্রের প্রতি থাইবাসীদের এই আকর্ষণের পরিণতিতে ১৯৩২ খ্রিঃ থাইল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় থেকে গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ থাই জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে।

৭৬.২.১ ধর্ম : থাইল্যান্ডের স্বাধীনতার পরিচালিকাশক্তি

থাইল্যান্ডের জাতীয়তাবাদের দ্বিতীয় স্তম্ভটি হলো ধর্ম। থাই জনগণের শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষ হলেন থেরাবদী বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত। এদের ধর্মীয় সহনশীলতার মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়েছে। জাতীয় ধর্ম বৌদ্ধধর্ম হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ ধর্মীয় ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন। এই কারণে থাইল্যান্ডে পাশাপাশি খ্রীষ্টান চার্চ, ইসলামী মসজিদ, টাওইস্ট উপাসনালয় দেখা যায়। আবার থাইল্যান্ডকে এশিয়ার বিভিন্ন ভাষা বা জাতি গোষ্ঠীর 'Melting Spot' হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

৭৬.২.২ থাই রাজতন্ত্র ঃ জাতীয় সংহতির স্তম্ভ

থাইল্যান্ডের জাতীয় সংহতির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো রাজতন্ত্র। থাই রাজতন্ত্র অত্যন্ত প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী। যারা জাতিকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন, তাদের বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ ব্যতীত বর্তমান থাইজাতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতো না। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে থাই রাজারা দেশের স্বাধীনতা, নিরাপত্তা এবং অগ্রগতিতে অবদান যুগিয়েছে। মঙ্কুট ও চক্রী রাজবংশের আধুনিক যুগের রাজা চুলালংকর্ণ (Chulalongkorn) ঔপনিবেশিক শক্তির কবল হতে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছেন। তিনি বিভিন্ন প্রগতিমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাইল্যাণ্ডকে আধুনিক জাতিতে পরিণত করেছিলেন।

একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হিসাবে মঙ্কুট (Mongkut) পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পরিভ্রমণ করেন। তিনি পাশ্চাত্য দেশগুলি বিশেষ করে ফরাসী, ইংরাজ ও আমেরিকান মিশনারীদের সহিত সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ হন,—এদের নিকট থেকে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর অসামান্য দক্ষতায় তিনি একদিকে থাইল্যান্ডের প্রাচীন ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে সক্ষম হন ও অন্যদিকে পাশ্চাত্যবাদী আধুনিকতাকে গ্রহণ করে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ও জাতীয়তাদী চিন্তা চেতনাকে সম্প্রসারিত করেন। চুলালংকর্ণ থাই-জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি ও সুপণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তিনি থাইল্যান্ডের বহু সামাজিক অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের চেষ্টা করেন। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তনি থাইল্যান্ডের বহু সামাজিক অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের চেষ্টা করেন। বিশেষ করে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য কৃতিত অস্বীকার করা যায় না। তিনি বৈদেশিক ক্ষেত্রে ও জাপানের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ১৯৩২-এর সাংবিধানিক বিপ্লবের আগে থেকেই থাইল্যান্ডের জনগণের চিন্তাভাবনা, জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রেমী, মুক্তিগামী ও বিপ্লববাদী ভাবধারণা গড়ে উঠেছিল।

৭৬.৩ ১৯৩২-এর সাংবিধানিক বিপ্লবের পশ্চাদপট বা পটভূমি

১৯৩২-এর সাংবিধানিক বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে এর নেপথ্যের অবস্থান সম্পর্কে আমাদের জানা প্রয়োজন। বিশেষ করে দেখা যায় (১৯১০-৩২) এই বাইশ বৎসরে থাইল্যান্ডের আর্থ-সামাজিক ও রাজতান্ত্রিক পরিবেশ এই বিপ্লবের মূল উৎস হয়ে দাঁড়ায়। রাজা চুলালংকর্ণ প্রবর্তিত থাইল্যান্ডের আধুনিকীকরণ তাঁর মৃত্যুর পরে ও প্রায় এক দশক অব্যাহত ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে ও পরবর্তী রাজতন্ত্রের নীতিগত অবস্থান ও মৌলিক পার্থক্য হেতু তা পরিবর্তিত হতে থাকে।

চুলালঙ্কারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদ্বয় যথাক্রমে মহাব্রজবুদ্ধ বা ষষ্ঠরাম এবং প্রজাদিপক বা সপ্তম রাম (১৯১০-১৯২৫) ও (১৯২৫-৩৫) থাই সিংহাসনে বসেন। উভয়েই ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, দক্ষ, বিচক্ষন শাসক। ষষ্ঠ রামা ১৯১৭-তে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারকল্পে চুলালঙ্কার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি মনে প্রাণে একজন ঐতিহ্যবাহী থাই সংস্কারক হওয়া সত্ত্বেও পাশ্চাত্য চিন্তাভাবনা ও যুক্তিবাদী আলোকে থাই জনগণকে শোধনের চেষ্টা করেন। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই পরবর্তীতে থাই জনগণ বিপ্লবের হোমানলে নিজেদের শুদ্ধ করে।

আবার সপ্তম রামা থাইল্যান্ডের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রসার সাধনে বিশেষ উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। তিনি একদিকে থাইলান্ডে জাতীয় গ্রন্থাগার, সংরক্ষণশালা, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, স্থাপত্য ভাস্কর্য শালা তৈরি করেন, অপরদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ঝরণা ধারায় নিজেদের শুদ্ধস্নাত করেন।

৭৬.৩.১ ১৯৩২-এর সাংবিধানিক বিপ্লব

ক্রমাগত অর্থনৈতিক চাপ, প্রশাসনিক দুর্বলতা, শিক্ষিত বেকার যুবকের হতাশা, সর্বোপরি অধস্তন প্রশাসকদের চাকুরী সংক্রান্ত অসন্তোষ এই বিপ্লবের তৎক্ষণাৎ কারণ। যারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩২-এর ২৪শে জানুয়ারী এই বিপ্লব প্রকাশ্যে জেগে ওঠে। এতদিন যা একটু একটু করে তুষের আগুনের মতো জ্বলছিল উপরিউক্ত পরিবর্তন তাতে অগ্নিসংযোগ করে। ১৯৩২-এর নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের ক্ষমতার অবসানের পর মোট ১৩টি বড় আকারের বিপ্লব সংঘটিত হয়। এর মধ্যে ৪টি সাংবিধানিক পরিবর্তন এছাড়াও প্রায় ত্রিশটি পরিবর্তন প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দেখা যায়। সরকার সাংবিধানিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গবেষণামূলক মনোভাব গ্রহণ করতে থাকেন। এই মনোভাব বজায় ছিল ১৯৭৩ পর্যন্ত। এই আন্দোলন চলাকালীন বার কয়েক নেতৃত্বের বা দেশের শাসক পরিবর্তিত হয়। এদের মধ্যে Pradit Manuthum (প্রদিত মানুথুম) বা বামপন্থী অধ্যাপকের নাম উল্লেখ্য। তবে এখানে উল্লেখের বিষয় হলো যে, (১৯৩২-৩৫) এর মধ্যে ব্রিটিশ ধাঁচে নিয়মতান্ত্রিক সীমাবদ্ধ সাংবিধানিক রাজতন্ত্র গঠন করা হয় মাত্র দশ বৎসরে আনন্দের তত্ত্বাবধানে।

৭৬.৩.২ প্রিদিও তাঁর পিপল'স পার্টি

তবে বিপ্লব পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হন প্রিদি। তাঁর People's party তত্ত্বগত ভাবে ১৯৪৬ পর্যন্ত ক্ষমতা দখল করে। এই বিধান সভার ১৪৬ জন সদস্য ছিল। যার অর্ধেক রাজা কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। তবে রাজাকেও শাসকদলের নির্দেশ মনে চলতে হতো। আর বাকী অর্ধাংশ পরোক্ষভাবে স্থানীয় ও জেলার মাধ্যমে নির্বাচিত হতো। মন্ত্রীসভা বিধান পরিষদের নিকট তাঁর কাজের জন্য দায়বদ্ধ ছিল। তবে ইচ্ছ্ব করলে রাজা বিধানসভা ভেঙে দিয়ে আবার তিন মাসের মধ্যে নতুন নির্বাচন করতে পারতেন। রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল, তার সিদ্ধান্তের ওপর ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা বিধান পরিষদের ছিল। আসলে নতুন সরকার তৃণমূল স্তরে জাতীয়তাবাদী মনোভাবাপন্ন হলেও উচ্চ পর্যায়ে ছিল আভিজাত শ্রেণী। তবে থাইল্যান্ডের সবকটি সংবিধানের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়—(১) ক্ষমতার পৃথকীকরণ, (২) নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, (৩) মন্ত্রীসভা দ্বারা গৃহীত নীতি ও সততা। এগুলি সবই ছিল পাশ্চাত্য বাদী গণতান্ত্রিক আদর্শ।

৭৬.৩.৩ প্রিদির ক্ষমতাচ্যুতি ও রাজতান্ত্রিক দলের পুনঃআগমন

১৯৩৩-এর মধ্যভাগে যখন প্রিদি বামপন্থী মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে সরকারীকরণ করতে উদ্যোগী হলো। এর ফল হলো দুরকম। People's Party ভেঙে গেল। আবার রাজতান্ত্রিক সমান্তরাল শ্রেণী তৈরী হল। সেনাবাহিনীর দ্বারা প্রিদি ক্ষমতাচ্যুত হলেন এবং এরা ১৯৩৮ পর্যন্ত এদের মনোনীত ফ্রায়া পাহনকে ক্ষমতায় বসিয়ে রাখল।

একমাত্র প্রিদির শাসনকাল ছাড়া বিপ্লব পরবর্তী পর্যায়ে সকল অভিজাত শ্রেণী-ই পূর্ববর্তী শাসকদের নীতি মেনে চলেছিল। কখনো কখনো থাইল্যান্ডের ভাগ্যাকাশে কালোমেঘের সঞ্চার হলে আভিজাত শ্রেণী-ই উচ্চপর্যায়ে আমলাতন্ত্রের পদ দখল করে। এরাই পরবর্তীকালে বিপ্লবের জন্ম দেয়। সৌভাগ্যবশতঃ থাইল্যান্ডের ভূমি সংস্কারে ক্ষেত্রে তেমন উলেখ্য কোন পরিবর্তন হয়নি। কৃষকরা জমি বা ক্ষমতা পুর্ণবন্টনে ও প্রাদেশিক রাজধানীতে আভিজাত শ্রেণীর উন্নয়নে তেমন প্রভাবিত হয়নি। তবে একমাত্র সাধারণ মানুষ চীনাদের সঙ্গে তাদের পক্ষপাতিত্বের বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি।

৭৬.৪ থাই রাজনীতির তিনটি উপাদান

তবে ১৯৩০-এর দ্বিতীয়ার্ধে থাই রাজনীতি তিনটি উপাদানের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। প্রথমত, অতি জাতীয়তাবাদ, দ্বিতীয়ত, ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদ ও তৃতীয়ত, সামরিকবাদে। বিশেষ করে ১৯২০-তে চীনা অভিভাসনের

দরুন সমগ্র থাইল্যান্ডে অস্থিরতা দেখা যায় এবং চীনা বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। বিশেষ করে মহিলা অভিভাযনকারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। আবার এই সময়ে চীনা জাতীয়তাবাদী দলের কুয়ো-মিন-তাং বা (KMT) উত্থান সমগ্র বিশ্বব্যাপী চীনা জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হয়ে ওঠে। এরা বিশ্বপর্যায়ে চীনাদের জন্য একটি বিশেষ আর্থ-সামাজিক অবস্থান তৈরি করতে সচেষ্ট হয়। থাই জাতীয়তাবাদীরা ১৯৩২ থেকে এরই পরিপ্রেক্ষিতে থাইল্যান্ডে চীনা ভাষা, বিদ্যালয়, সংবাদপত্র এমনকি চীনা অভিভাযন (Migration) বন্ধের উদ্যোগ নেন। এমনকি অবৈধ বৈদেশিক অনুপ্রবেশকারীদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এতদ্ স্বত্ত্বেও সরকার নিয়ম করে উপজাতীয় থাই অধিবাসীরা যারা বিশেষ বাণিজ্যে অংশ নিত, এদেরও অধিকারের বীমা বেঁধে দেয়। জাতীয়তাবাদীরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়ে ওঠে। বিশেষ করে যেসব ব্রিটিশ কোম্পানিগুলো থাইল্যান্ডে কাঠগোলা স্থাপন করে এদের বিরুদ্ধে এরা সোচ্চার হয়ে ওঠে। এছাড়া থাই জাতীয়বাদীরা খ্রিস্টান মিশনারীদের বিরোধিতা করে এবং দেশের মানুষকে যথাসম্ভব বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করে। ১৯৩৯-এ থাইল্যান্ডের নাম হয় More Nationalistic Thailand। যার অর্থ স্বাধীন বা পবিত্রভূমি।

৭৬.৫ থাইল্যান্ড ও জাপান মৈত্রী

১৯৩৮-এর ডিসেম্বরে সরাসরি সামরিক শাসনের হাত ধরে ফিবুন সংরাম (Phibun Songkhram) প্রধানমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হন। এরপর থেকে থাইল্যান্ডের নীতিতে পরিবর্তন দেখা যায়। একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এবং অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান পশ্চিমী শক্তির সাফল্যে থাইল্যান্ড শঙ্কিত হয়ে জাপানের সঙ্গে মৈত্রীতা সূত্রে আবদ্ধ হয়। ফিবুন সরকার জাপানকে সবরকম প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করে এবং জাপানের প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাবর্দন কালে থাইল্যান্ড জাপানকে অতিরিক্ত অঞ্চল হিসাবে লাওস, উত্তর মালয় এবং বার্মায় শান প্রদেশ প্রদান করে।

৭৬.৫.১ থাই-জাপ মৈত্রীর প্রভাব

এশিয়ার এই দুটি শক্তির মৈত্রী অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় দেশগুলিকেও উৎসাহিত করে এবং থাইল্যান্ড এক্ষেত্রে বৃহৎ আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে। ১৯৪২-এর প্রাক্কালে থাইল্যান্ডের স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনে পশ্চিমী শক্তিগুলোও অনেক সাহায্য করে। ব্রিটিশ '১৩৬' বাহিনী শ্রীলঙ্কা থেকে উনান প্রদেশে একটি গেরিলা গোয়েন্দা বিভাগের কর্তৃত্ব করে। আবার এই আন্দোলন সাধারণ মানুষের ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বিশেষ করে সামাজিক ন্যায়বিচার, আইন, পণ্যদ্রব্যের মূল্য, বিবাহ আইন—এ সবের দাবীতে জাপানীরাও এদের সঙ্গে যোগ দেয়। এছাড়া থাইল্যান্ডে বসবাসকারী চীনা সম্প্রদায়ও এদের নিরাপত্তা ও সম্পত্তি সংরক্ষণের দাবীতে এই আন্দোলনে যোগ দেয়।

৭৬.৬ ফিবুনের পদত্যাগ ও থাই কম্যুনিষ্ট পার্টির বৈধকরণ

১৯৪৪-এর মধ্যভাগে বিভিন্ন দিক থেকে চাপের পরিপ্রেক্ষিতে থাই জাতীয় সভা ফিবুন সংরামকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। এবং তার পরিবর্তে Khuang Aphaiwong-কে সিংহাসনে বসায়। এই নতুন প্রধানমন্ত্রী প্রিদির হাতের পুতুলে পরিণত হয়। এরা প্রিদির নির্দেশে পূর্বতন সরকারের দোষ ত্রুটি পরিহার করে নতুন পথে চলতে থাকে। অবশেষে ফিবুনকে মিত্রশক্তির শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং বন্দী করা হয়। নতুন থাইল্যান্ড চীনা কম্যুনিস্টদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং রাশিয়ার সহায়তায় থাই কম্যুনিস্ট দলকে বৈধকরণ করতে উদ্যোগী হয়।

৭৬.৬.১ সামরিক শাসনের অর্ধশতক : ফিবুনের প্রত্যাবর্তন ১৯৪৮-১৯৫৭

১৯৪৮-১৯৭৩ পর্যন্ত থাইল্যান্ডে সামরিক শাসন অব্যাহত থাকে। ফিবুন সংরাম পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এক সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। তিনি চীনা সম্প্রদায়ের সুয়োগ-সুবিধার প্রতি একদিকে যেমন দৃষ্টি রাখেন অপর দিকে চীনা অভিভাষনকারীদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। এদিকে চীনা প্রজাতন্ত্রী গঠিত হওয়ার পর দেশের জনগণ থাই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে এদের সংযোগের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে পড়ে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে থাই সরকার ১৯৫২-তে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে থাই কম্যুনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ করেন। আবার চীনা ও থাইদের মধ্যে অবাধ সামাজিক বিবাহ চালু করেন। অবশেষে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বৈদেশিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে থাইল্যান্ড সিয়াটোতে যোগ দেয়।

৭৬.৭ সারিত থ্যানমের শাসনকাল ১৯৫৭—১৯৭৩

১৯৫৭-এর নির্বচিনে মধ্য দিয়ে Sarit Thanom ক্ষমতায় আসেন। তিনি ফিবুনকে বাধ্য করেন কাম্বোডিয়া পরিত্যাগ করতে। তাঁর প্রবর্তিত নীতির সঙ্গে পূর্বতন শাসকদের নীতির কোন পার্থক্য ছিল না, কিন্তু তাঁর ক্ষমতায় আসার পর আমেরিকার বৈদেশিক সাহায্য যত দ্বিগুন হয়েছে, তার মনোনীত ব্যক্তিবর্গের স্বার্থ তত চরিতার্থ হয়েছে।

৭৬.৭.১ থ্যানমের শাসনকালে থাই-আমেরিকীয় সম্পর্ক

Thanom-এর সময় থাই আমেরিকান বন্ধন সূত্র আরোও জোরদার হয়েছে। থাইল্যান্ড অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে প্রায় বাৎসরিক ১ লক্ষ বিলিয়ান ডলার সাহায্য পেতে থাকে। আবার ১৯৬২-তে Rusk-

Thanat Assistant Agreement of 1962 স্বাক্ষরিত হয়। এমনকি ভিয়েতনামী মুক্তিযুদ্ধে থাইল্যান্ড আমেরিকাকে তার উপকূলবর্তী অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে সাহায্য করে। ফলে ক্রমেই থাইল্যান্ডের অভ্যন্তরে চীনা ও থাইজনগণ ব্যাংকক সরকারের পতনের দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এই সময় থেকেই উত্তর থাইল্যান্ডে উত্তর ভিয়েৎনামীদের প্রচেষ্টায় থাই-উপজাতী বিরোধী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। অবশেষে ১৯৬৯-এর প্রথম দিকে আমেরিকা থাইল্যান্ড থেকে তার সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করেন। আবার ১৯৭০-এ সোভিয়েত রাশিয়ার (সাবেক U.S.S.R) সঙ্গে থাইল্যান্ডের এবং চীনা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। থাইল্যান্ড 'আশিয়ান' বা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় শান্তি স্বাধীনতা ও মৈত্রী সংঘে যোগদান করে। অবশেষে ১৯৭১-এ আমেরিকার সহায়তায় সম্পূর্ণ নতুনভাবে থ্যানম্ জাতীয় বিধান পরিষদ গঠন করেন, সংবাদপত্রের পরিচলনশীলতার প্রতি দৃষ্টি দেন এবং পুর্বতন দোষক্রটি মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন।

৭৬.৮ থাই-ছাত্র আন্দোলন ও নাগরিক শাসন

১৯৭৩-এর ৬ই অক্টোবর যখন ১২ জন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংবিধানের দাবীতে উত্তাল হয়ে ওঠে, তখনই বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। এদের দাবীকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করা হলে ১৪ই অক্টোবর ব্যাপক আকারে উত্তেজনা দেখা দেয়। অবশেষে ছাত্রদের উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাসের দাবীতে সাংবিধানিক গণতন্ত্র তিন বৎসর টিকে থাকে। তবে এর মধ্যে চারটি সরকার পরিবর্তিত হয়। এই সময় ছাত্রদের উদ্যোগে তৈরি হয় NSCT (National Student Center of Thailand) এর অর্থ বিপ্লব। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বামপন্থী। আবার ১৯৭৫-এর ফেব্রুয়ারীতে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে ৪২টি দল অংশ নেয়, কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলই এখানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। অবশেষে (SAP) নামে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীরা সম্মিলিতভাবে একটি দল গঠন করে এবং এর মাধ্যমে তারা থাইল্যান্ডের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনধারার পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। আবার ১৯৭৬-এর নির্বাচনে দক্ষিণপন্থীদের জয় হয়। এরা জনগণকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, সুখ, শান্তি ও ঐক্যের স্থায়িত্ব প্রদানের নিশ্চয়তা দান করে। আবার ১৯৯১-তে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

আবার ১৯৯২-তে একটি জন বিক্ষোভ হয়। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও ছাত্রসংগঠনগুলি এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এতে অংশ নেয়। দেখা যায় ১৯৮০-৮৮-এর মধ্যে অধিকাংশ দক্ষিণপন্থী সংগঠনগুলি ছিল সামরিক অফিসারদের দখলে।

৭৬.৮.১ থাই-গণতান্ত্রিক ঐক্যবদ্ধ দলের প্রতিষ্ঠা

পরিশেষে সুদীর্ঘ টানা-পোড়নের অবসান ঘটল ১৯৯৫-এর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঐক্যবন্ধনে অবশেষে তৈরী হল গণতান্ত্রিক ঐক্যবদ্ধ দল। ২৩৩টি আসন বিশিষ্ট বিধান পরিষদ। এখানে উল্লেখের

বিষয় হলো যে, থাইল্যান্ডের বর্তমান সংবিধানটি হলো সে দেশের একাদশ সংবিধান। এটি ১৯৭৮-এর ২২শে ডিসেম্বর গৃহীত হয়। এটিতে ১টি অধ্যায়ে মোট ২০৬টি অংশ সহ অতিরিক্ত কিছু অংশ সন্নিহিত আছে। এই সংবিধান অনুসারে থাইরাষ্ট্রকে একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র বা Constitutional Monarchy হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই সংবিধান অনুসারে রাজাই হলেন রাষ্ট্রের প্রধান এবং তার সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের দ্বারা প্রদত্ত।

৭৬.৮.২ থাই-জনমানস

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, থাইল্যান্ডের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস কখনোও একই সমীকরণের আওতাভুক্ত হয়নি, বিভিন্ন সময়ে, পর্যায়ক্রমে জটিল সমীকরণের মধ্য দিয়ে তা সম্পন্ন হয়েছে। দেশের প্রত্যেকটি মানুষ চেয়েছে দেশীয় কৃষি ও ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে, অপরদিকে ইওরোপীয় তথা পাশ্চাত্য শিক্ষাকে নিজেদের ধ্যান ধারণার মধ্য দিয়ে আত্তীকরণ করে নবজাগরণের আদর্শে নিজেদের উদ্বুদ্ধ করতে।

৭৬.৯ সারাংশ

থাইল্যান্ডের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম শুধু থাইল্যান্ডকে নয়, অপরাপর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু দেশকেই সচেতন করে তোলে, যা পরবর্তীকালে বৃহৎ বিশ্বে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার পক্ষে আরোও জনচেতনাকে বৃদ্ধি করে। এছাড়া থাই রাজতন্ত্র, সংবিধান ও বৌদ্ধধর্ম বিশ্বব্যাপী জনগণের জাতীয় আন্দোলন মুখী ভাবধারাকে প্রস্ফুটিত করতে সাহায্য করে, সেদিক থেকে বিচার করলে এই আন্দোলন সর্বতো সিদ্ধ।

৭৬.১০ অনুশীলনী

ক। বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। চুলালংকর্ণ কে ছিলেন?
২। থাইল্যান্ডের সংবিধান কয় ভাগে বিভক্ত?
৩। থাই সংবিধানে রাজার ভূমিকা কি?
৪। থাইল্যান্ডে কোন প্রাণীর ব্যবসার উল্লেখ গিলালেখতে রয়েছে?
৫। চক্রী রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পূর্বে রাজধানী কোথায় প্রতিষ্ঠিত ছিল?
৬। চুলালংকর্ণ-এর দুই পুত্রের নাম লিখুন।
৭। থাই সংবিধানের সাধারণ বৈশিষ্ট্য কি?
৮। থাই-রাজনীতির উপাদান গুলি কি?

খ। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। থাই রাজ মংকুটের রাজত্বের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

২। থাই জাতীয়তাবাদের সংবিধানের ভূমিকা উল্লেখ করুন।

৩। ১৯৩২ সালে সাংবিধানিক বিপ্লবের পটভূমি আলোচনা করুন।

৪। থাই-জাপ মৈত্রীর প্রভাব কি হয়েছিল?

গ। দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

১। থাই জাতীয়তাবাদের ভিত্তিগুলি আলোচনা করুন?

২। থাই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের কী ভূমিকা ছিল?

৭৬.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। Hong Lyza : Thailand in the Nineteenth Century Institute of South Asian Studies 1994.

২। G.F. Cady : South-East–Its historical developments Megraw Hill 1979.

৩। D.R. Sardesai : South-East Asia Past and Present.

একক ৭৭ ☐ ইতিহাসের পাতায় ভিয়েতনাম

গঠন

৭৭.০ উদ্দেশ্য
৭৭.১ প্রস্তাবনা
৭৭.২ ভিয়েতনাম : পরিচিতি
৭৭.৩ ভিয়েতনামের ইতিহাসের আভাস
৭৭.৪ ভিয়েতনামের গৃহযুদ্ধ ও ফরাসি শক্তি
৭৭.৫ ফরাসি ও টনকিন প্রদেশ
৭৭.৬ ফরাসি উপনিবেশিকতার অধীনে ভিয়েতনাম
৭৭.৭ ফরাসি শাসনের বিশিষ্ট্য
৭৭.৮ ফরাসি ঔপনিবেশিকতার ফলাফল : ভিয়েতনামী জাতীয়তাবাদের উত্থান
৭৭.৯ ফরাসি ঔপনিবেশিকতার পুনঃপ্রচেষ্টা ও ফলাফল
৭৭.১০ দিয়েন বিয়েন ফু-রক্তাক্ষয়ী যুদ্ধ
৭৭.১১ ১৯৫৪ সালের জেনিভা চুক্তি
৭৭.১২ চুক্তির পর্যালোচনা
৭৭.১৩ সারাংশ
৭৭.১৪ অনুশীলনী
৭৭.১৫ গ্রন্থপঞ্জী

৭৭.০ উদ্দেশ্য

এই পাঠ্যবস্তুর মূল উদ্দেশ্য হল ভিয়েতনাম সংগ্রামী ইতিহাসকে মূল্যায়ন করা তার প্রায় জন্মলগ্ন থেকে। ভিয়েতনামের স্বাধীনচেতা মনোভাবের সূত্রপাতের ধারা শুরু হয় চীনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। এরপর ফরাসি ঔপনিবেশিকদের প্রবেশ ও তাদের রাজত্ব ভিয়েতনামের মাটিতে অবস্থান করে একশো বছরের বেশি সময় ধরে। ফরাসিদের পর এই ছোট্ট দেশে পদার্পণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যার পাশবিক শাসনব্যবস্থার স্থায়িত্ব ছিল দুই দশকের বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই দশকের রাষ্ট্র পরিচালনার কর্মপদ্ধতি ও ভিয়েতনামবাসীদের তার বিরুদ্ধে মরণাপন সংগ্রাম এবং শেষে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কাছে তার পরাজয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে এই পাঠ্যপুস্তক। এই বিস্তারিত ইতিহাস নতুন প্রজন্মকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামী লড়াইয়ে সংগ্রামকে জানতে সাহায্য করবে।

৭৭.১ প্রস্তাবনা

পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় ভিয়েতনামের লড়াইয়ের ইতিহাস এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। বৈদেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই ছোট্ট দেশের অপ্রতুল, অনমনীয় ও দীর্ঘ সংগ্রাম আজও উজ্জ্বল। তার এই দীর্ঘ সংগ্রাম প্রথমে চীন, পরে শ্যামদেশ ও ফরাসি উপনিবেশিকের বিরুদ্ধে ও শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে লড়াই, দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য, ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে এক অতুলনীয় মনের তেজ ও বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মানসিকতা। একটি ক্ষুদ্র, ভঙ্গুর ও দরিদ্র দেশের অকল্পনীয় লড়াই, অমিত বিদেশী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে, ধীরে ধীরে ও তিলে তিলে তৈরি করে জনগণের মননে এক দৃঢ় তেজ ও মানসিক প্রস্তুতি। আর এই মানসিক প্রস্তুতিই শেষ পর্যন্ত ভিয়েতনাম জনগণের যুদ্ধ জয়ের মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। তাই শত শত বছরে অত্যাচারের পরেও, ভিয়েতনামের গণমুক্তি আন্দোলন আজও এক প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

৭৭.২ ভিয়েতনাম : পরিচিতি

পৃথিবীর ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ভিয়েতনাম একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায়। সারা বিশ্বের কাছে, আজ এই দেশটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতীক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। এই চোট দেশটির হাজার বছরে অস্তিত্বের সংগ্রাম প্রথমে চীনের বিরুদ্ধে, পরে মরণপন লড়াই ফরাসি উপনিবেশবাদ ও জাপানীদের বিরুদ্ধে ও শেষে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সৃষ্টি করেছে এক ক্রমবর্ধমান সংগ্রামের ইতিহাস। অস্ত্র ও গোলাবারুদ, একটি জাতির নৈতিক চরিত্রের কাছে কত ক্ষুদ্র তা প্রমাণ করে এই চেট্টি অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল ভিয়েতনাম। তাই সারা দুনিয়ার কাছে ভিয়েতনাম, যুগ যুগ ধরে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। মার্কস ১৮৫৩ সালে পরাধীন দেশগুলিতে ঔপনিবেশিক হিংস্রতা নিয়ে লিখেছিলেন ঃ "স্বদেশে যা ভদ্ররূপ নেয় এবং উপনিবেশে গেলেই তা নগ্ন হয়ে আত্মপ্রকাশ করে, সেই বুর্জোয়া সভ্যতার প্রগাঢ় কপটতা এবং অঙ্গাঙ্গী বর্বরতা আমাদের সামনে অনাবৃত।" ভারতে ব্রিটিশ শাসনে আমরা দেখেছি বর্বরতা। ভিয়েতনামে, ফ্রান্স, জাপানী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের অকল্পনীয় বর্বরতা, ইতিহাসের সব বর্বরতাকেই যেন অতিক্রম করে যায়। তাই ভিয়েতনামের সংগ্রামের ইতিহাস ভবিষ্যতের সংগ্রামী সৈনিকদের অফুরন্ত প্রেরণা, অনন্ত উদ্দীপনা যোগাবে, মৃত্যুহীন অমরতার আস্বাদ দেবে সংগ্রামী শহিদদের।

মানচিত্রের বুকের ইংরেজী 'এস' বর্ণের মত। ভিয়েতনাম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অতি প্রাচীন দেশ। বাক বো বা উত্তর ভিয়েতনাম, দক্ষিণে মেকং নদীর অববাহিকার নাম বো, মধ্য ভিয়েতনামের সরু লম্বা ফার্লিট্রাং বো যেন বাঁকের মত উত্তর-দক্ষিণকে ধরে রেখেছে। পূর্বদিকে দক্ষিণ চীন সাগর, পশ্চিমে সুদীর্ঘ পর্বতশ্রেণী—থাইল্যান্ড, লাওস আর কাম্বোডিয়া ভিয়েতনামকে বিযুক্ত করে রেখেছে। বহু শতাব্দী আগে দক্ষিণ চীনের অবিশ্রান্ত মানুষের অনুপ্রবেশ এখানকার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। আজ ইন্দোনেশিয়ার পর এই দেশই পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে ঘন বসতিপূর্ণ দেশ। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা মোঙ্গল জাতির শাখা। এরা সাধারণত খর্বকায়। চুলের রঙ কালো, গায়ের রঙ হলুদ বর্ণের। চোখ ক্ষুদ্রকায়, ঈষৎ বক্র।

ভিয়েতনামের গোড়ার ইতিহাস যতেষ্ট পরিষ্কার নয়। আজকের ভৌগোলিক সীমানার সঙ্গেও তার বিস্তর হেরফের। চীন এদেশে হাজার বছর রাজত্ব করেছে। তাই চীনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব অতি পুরাতন ও দীর্ঘকালের। লেখা ভাষায়, কনফুসীয় ধর্মে, সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে, এমনকি গৃহসজ্জাতেও চীনের আশ্চর্যরকম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

৭৭.৩ ভিয়েতনামের ইতিহাসের আভাস

১৯৭৬ সালে জুলাইয়ে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম ঐক্যসাধন করার পূর্বে, ভিয়েতনামের ইতিহাসকে মোটামুটি ছয়টি অধ্যায়ে ভাগ করা যায়। ভিয়েতনামবাসীদের নিজস্ব রাষ্ট্র, হং বাং-এর রাজত্বকাল, চৈনিক অধিকার, মহান জাতীয় বংশ, ফরাসি শাসন ও শেষে মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের অধ্যায়। ইহা সত্য যে, মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভিয়েতনাম অধিবাসীগণ যেভাবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন, তা বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত যতগুলি জটিল প্রতিরোধ পরিচালিত হয়েচে, তাদের মধ্যে অন্যতম। ভিয়েতনামের লোকেদের পক্ষে এ ধরনের আগ্রাসন রোধ করা একটা স্বাভাবিক কাজকর্মের, বলা যায় অভ্যাসের, পর্যায়ে পৌঁছেছে। দশম শতাব্দী থেকেই ভিয়েতনামের অধিবাসীগণ স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। তাই মঙ্গলনায়ক কুবলাই খাঁ, পরবর্তী মিঙ্গস্ (Mings) ও পরে চীনের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তারা প্রাণপণ সংগ্রাম করেছে। আশ্চর্যের কথা এই যে ভিয়েতনাম কোনদিনই চীন বা দক্ষিণ চীনের অংশ ছিল না, এবং তার কারণ হয়ত ভিয়েতনামের স্বাধীনসত্তা এভাবে বজায় রাখাই তার ইতিহাসের ধারাবাহিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দেখা দিয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভিয়েতনামের বিভিন্ন অঞ্চলগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়। মাঝখানে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ এই পরিস্থিতিকে আরো বেশি জটিল করে তোলে। তাই বলা যায় যে, মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে যে কঠিন, নির্মহ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভিয়েতনাম গড়ে তোলে তা শুধু এ শতাব্দীর ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়, তার অন্তরালে রয়েছে হাজার বছরের বেশি সময়কার রাজনৈতিক ঐতিহ্য, যে ঐতিহ্য স্বাধীনতার ঐতিহ্য, যার মধ্যে রয়েছে চীনের বিরুদ্ধে তার হাজার বছরের সংগ্রাম, আশি বছরের বেশি সময়ের ফরাসি উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপানী আক্রমণের প্রতিরোধের সংগ্রাম এবং শেষে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী, দুরন্ত, দুর্বিষহ সংগ্রামের ইতিহাস।

যদিও ভিয়েতনামের ইতিহাসে ভ্যান-ল্যাঙ্গ (Van-Lang) রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় যা ভিয়েতনামের তাম্রযুগ অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের সমসাময়িক, কিন্তু ভিয়েতনামের প্রকৃত ইতিহাসের সূচনা ঘটে খ্রিস্টপূর্ব ২৫৮ সাল থেকে যখন রাজা থাক্ ফান্ (Thuc phan) ভ্যান-ল্যাঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করেন এবং 'ও-লাক' (Au-Lac) এর স্থাপনা করেন যা প্রধানত তিনটি প্রধান গোষ্ঠী—ভিয়েত, মুওঙ্গ (Muong) এবং তে (Tay) দ্বারা গঠিত ছিল। রাজা থাক্ ফান্ নিজেকে অ্যান দুওঙ্গ ভুওঙ্গ (An Duong Vuong) নামে ঘোষণা করেন। অর্ধশতক বাদে 'ও-লাক' রাজ্যকে চীন দেশের চীন (Chin) বংশের রাজা ত্রিউ দা ভাসাল (Triuc Da Vassal) খ্রিস্টপূর্ব ২০৮ সালে দখল করেন ও নিজের রাজ্যের (বর্তমানে কোয়ানট্রুঙ্গ বা Kwantung) মধ্যে যুক্ত করে নেন এবং রাজ্যে দুটির নামকরণ করেন 'নাম ভিয়েত'। খ্রিস্টপূর্ব ১১১ সালে এই রাজ্যটি চীনদেশীয় হান্ (Hon) বংশ জয় করে নেয় এবং চীন সাম্রাজ্যের মধ্যে একত্রিত করে নেওয়া হয় একটি

প্রদেশরূপে এবং তার নামকরণ করা হয় গিয়াও চী (Giao Chi)। বিশেষ শাসনব্যবস্থার সবিধার্থে এই প্রদেশটিকে নয়টি সামরিক জেলায় বিভক্ত করা হয় এবং চীন নথিপত্রে এই 'নাম ভিয়েত' নামটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। এই প্রদেশটিকে চৈনিক সামন্ততান্ত্রিক বংশের নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেওয়া হয়।

ত্রিউ (Trieu) বংশের শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যে শাসকেরা টনকিন (Tonkin) ও উত্তর আন্নাম (Annam) অঞ্চলের অ-চৈনিক মানুষের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন না এবং ভিয়েত অঞ্চলগুলিকে সামন্তপতিদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও স্বায়ত্তশাসনের অনুমতি দিয়েছিলেন। উদির (Wu Ti) রাজত্বকালেও নাম ভিয়েত শাসিত হত প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী ও তাদের স্থানীয় সর্দারের দ্বারা। প্রায় এক হাজার বছর ধরে ভিয়েতনামের মানুষ চৈনিক শাসনের শৃঙ্খলা থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য কঠোর লড়াই করেছে। ভিয়েতনামের ইতিহাসে ত্রুঙ্গ (Trung) ভগিনীদ্বয়ের বিদ্রোহ [Trung Sisters (A.D. 40-43—Lady Trieu (A.B. 248), লি বন (Ly Bon) (A.D. 544-602)]। মাই থাক লোনের (A.D. 722) ও অন্যান্যদের বিদ্রোহ খুবই বিখ্যাত। এই স্বাধীনতার লড়াই-এর সমাপ্তি ঘটে ৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে যখন ভিয়েতনামের মানুষ চৈনিক সাম্রাজ্যের শাসন থেকে মুক্তিলাভ করে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে লি বন বিদ্রোহের (A.D. 603) পর থেকে ৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে সময়কাল পর্যন্ত চৈনিক শাসকগণ নাম ভিয়েত-এ তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মতবাদ ও প্রভাব আরোপ করার বিপুল চেষ্টা করে। তারা নাম ভিয়েতের নাম পরিবর্তন করে রাখেন আন্ নাম (An Nam)। কিন্তু এসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও চৈনিক শাসকগণ ভিয়েতনামবাসীদের বিদ্রোহে আগুন নেভাতে পারেননি তাদের অপ্রতিম মানসিক দৃঢ়তা বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মনোভাবের জন্য এবং এর শেষ পরিণতি হয় হাজার বছরের চৈনিক শাসনের অবসান, স্বাধীন ভিয়েতনামের (Dai Viet) স্থাপনা ও নগো (Ngo) বংশের সূচনা।

নগো বংশের স্থায়িত্ব ছিল প্রায় তিরিশ বছর (৯৩৮-৯৬৭)। এই জাতীয় বংশের মূল প্রবর্তক ছিলেন জেনারেল নেগো কোয়েন (Ngo Quyen)। তিনি তার রাজত্বকালে ভিয়েতনামের স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় করে তুলতে প্রচেষ্ট ছিলেন। নগো কোয়েনর মৃত্যুর পর, তার গঠিত রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং ফলস্বরূপ দেখতে পাই সম্পূর্ণ রাজ্যটির বারোভাগের বিভাজন। এরই মধ্যে ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে দিন্ তিনেয় হোঙ্গ (Dinh Tien Hoang) নামক এক সামন্তপতি দিন্ বংশের সূচনা করেন এবং দেশকে সংযুক্ত করে নামকরণ করেন দাই-কো ভিয়েত (Dai-Co-Viet)। চীনে সুঙ্ (Sung) সম্রাট দিন তিয়েন হোঙ্ককে নামমাত্র আনুগত্যের বিনিময়ে স্বীকৃতি দেন। ১০০৯ খ্রিস্টাব্দে লাই কঙ্ ভান্ (Ly Cong Van) নামক এক ব্যক্তি লু (Lo) বংশকে ক্ষমতাচ্যুত করে লাই (Ly) বংশের স্থাপনা করেন। তিনি দেশের নতুন নামকরণ করেন দাই ভিয়েত (Dai Viet) এবং তার এই লাই বংশ ১২২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ২১৫ বছর শাসন করে। বারংবার বিদেশী আক্রমণে দুর্বল লাই বংশকে ক্ষমতাচ্যুত করে ১২৫৫ খ্রিঃ ত্রান থাই থোয়াঙ্গ (Tran Thai Thoang) সিংহাসনে আসীন হন এবং ত্রাণ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশ ১২২৫ থেকে ১৪০০ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করে এবং এর দীর্ঘ ১৭৫ বছরের শাসনকালে ভিয়েতনামে একটি সুগঠিত শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা দেখা যায়। এই বংশের শাসনব্যবস্থায় সবচেয়ে বড় লক্ষ্যনীয় বিষয় হল ইহার রণ-কৌশল নীতি। এই বিশেষ রণ-কৌশল

নীতির দরুনই, এই বংশের [বিশেষ করে ত্রান হুঙ্গ দাও (ran Hung Dao)] প্রাণপণ সংগ্রাম ও শেষে জয় বাক্ ডাঙ্গ (Back Dang) নদীর পাড়ে মঙ্গলনায়ক কুবলাই খাঁনের বিরুদ্ধে ইতিহাসের পাতায় বিশেষভাবে উল্লেখিত। ১৪১৮ খ্রিঃ চীন শাসনে অতিষ্ট হয়ে নেগুয়ান ত্রাই (Nguyen Trai) এর সাহায্যে লে লয় (Le Loi) নামক ব্যক্তি মিঙ্গ (Ming) শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং ১৪২৭ সালে চীন ফৌজের থেকে হ্যানয় সে পুনর্বার দখল করে নেয় এবং ভিয়েতনামে লে বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের শাসনকাল ১৪২৭ থেকে ১৮০২ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থায়িত্ব ছিল।

৭৭.৪ ভিয়েতনামের গৃহযুদ্ধ ও ফরাসি শক্তি

অষ্টাদশ শতাব্দীতে লে বংশে একটি সঙ্কট দেখা দেয় যখন গোটা দেশে দুটি গোষ্ঠী উত্তরের ও দক্ষিণের গুয়েন (Nguyen)— মধ্যে গৃহযুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। উভয়কেই জমিদার, চৈনিক সরকারি কর্মী (Mandarin) ও স্বৈরতন্ত্রী সম্ভ্রান্ত বংশগুলি সমর্থক প্রকাশ করে। এই উভয় গোষ্ঠী স্বীকৃতির আদায়ের জন্য নিজ নিজ প্রক্রিয়া দ্বারা চৈনিক সম্রাটের সমর্থন প্রাপ্তির চেষ্টা করে এবং উভয় গোষ্ঠীই ক্ষমতাহীন লে বংশের রাজার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। এই গৃহযুদ্ধে ট্রিনহ্ বংশ, ১৭৭৫ সালে গুয়েনদের স্থানচ্যুত করে রাজধানী হিউ (Huc) থেকে। এই গৃহযুদ্ধে ট্রিনহ গোষ্ঠী গুয়েন গোষ্ঠীর সকলকে আটক করে, শুধুমাত্র পনেরো বছরে কিশোর গুয়েন ফাক্ আন্হ (Nguyen Phuc-Anh) ছাড়া, যিন পিনোহ দ্য বেহোন (Pigneau de Behaine) নামক এক ফরাসি মিশনারীর সাহায্যে দেশ ছেড়ে পলায়ন করে এবং আশ্রয় নেয় একটি অজানা দ্বীপে। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই গৃহযুদ্ধের প্রভাব কৃষক সম্প্রদায়ের উপর খুবই প্রভাব ফেলে। বহু স্বৈরতন্ত্রী রাজপরিবার এই দরিদ্র কৃষকের ভূমি আত্মসাৎ করে নেয় এবং এর পরিণতিস্বরূপ সামন্ততন্ত্রী ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে কৃষকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং এরই ফলে ভিয়েতনামের সমাজে ভূমিহারা ও ভূস্বামীদের মধ্যে এক বিশাল বিভেদ সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতি আরও ঘোরালো/সাংঘাতিক হয়ে ওঠে, বিশেষ করে রাজশক্তির অসহায়তা, কনফুসিয়ানবাদের দুর্বলতা ও ট্রিনহ্ এবং গুয়েন গোষ্ঠী অন্তঃকলহের দরুন। এই কৃষক বিদ্রোহের সময়, তে সোন (Tay Son) বংশের তিনজন গুয়েন ভাইরা একটি বিশাল কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয় এবং ১৭৮৭ সালে হ্যানয় জয় করে হিউ (Hue) দখল করে নেয়। তারা দক্ষিণের গুয়েন রাজাদের ক্ষমতাচ্যুত করে এবং উত্তরের ট্রিনহ্ রাজাদের পরাজিত করে এবং দেশকে সংযুক্ত করেতাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত ছিল উত্তরের চীনের সীমান্ত থেকে দক্ষিণের কাম্বোডিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত, এবং এই গুয়েন ভাইরা এতই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে তারা শ্যামদেশীয় সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ ও চীনা সেনাবাহিনীর আক্রমণ (যা ট্রিনহ্ ও পরে লে বংশের সমর্থনে পাঠানো হয়েছিল) অনায়াসে প্রতিরোধ করে যথাক্রমে ১৭৮৭ ও ১৭৮৯ সালে।

এরই মধ্যে তে সোন্ ভাইদের কিন্তু সিংহাসনের অন্য এক দাবিদারের মুখোমুখি হতে হয়, যিনি ছিলেন গুয়েন-ফাক্ আনহ্ (Nguyen Phuc-Anh), যিনি দক্ষিণের একদল সমর্থক নিয়ে দাবি জানান যে তিনিই

সিংহাসনের প্রকৃত দাবিদার। তিনি ফরাসি মিশনারী পিনোহ্ দ্য বেহোনের মাধ্যমে ফরাসীদের কাছ্ থেকে সামরিক সাহায্য লাভ করেন এবং ১৭৮৮ সালে সায়গন ও ১৮০২ সালে হ্যানয় জয় করে তে সোন বিদ্রোহকে চূর্ণ করে দেন। ১৮০২ সালের ১লা জানুয়ারী, তিনি হিউ (Hue)-তে ভিয়েতনামের নব সম্রাটরূপে নিজেকে ঘোষণা করেন ও গুয়েন (Nguyen) বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এবং শেষে তিনি সম্রাট জিয়া লঙ্ (Gia Long) নাম গ্রহণ করেন।

জিয়া লঙ্ ১৮২০ সাল পর্যন্ত শাসন করেন। তিনি চীনা সম্রাটের কাছে স্বীকৃতি চাইলেন, যা তিনি প্রাপ্তি করলেন প্রতি দুবছরের শেষে আনুগত্য ও চার বছরে শেষে আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ কর প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে। তাই গুয়েন আনহ্-ই অনেকাংশে দায়ী ছিলেন ভিয়েতনামের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ফরাসি হস্তক্ষেপের জন্য যা ভবিষ্যতে ভিয়েতনামবাসীদের চূড়ান্ত অপমান ও সঙ্কটের সম্মুখীন করে।

ফরাসি ক্রিশ্চান মিশনারীদের জন্যই ভিয়েতনামে বা ইন্দোচায়নাতে ফরাসি উপনিবেশিকতার ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপিত হয়। প্রথম ইয়োরোপীয় শক্তিদ্বয় যারা ভিয়েতনামের আনাম (Anam) ও কাম্বোডিয়ায় (Cambodia) প্রথমে পদাপর্ণ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এল-প্রথমে পর্তুগীজ ও পরে ডাচ্‌রা। এদের পরে আসে ফরাসি শক্তি। এই ত্রিশক্তি—প্রত্যেকেই ভিয়েতনামের বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় সুবিধা প্রাপ্তির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। ফরাসিরা শেষ পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করে। ফরাসি ক্রিশ্চান মিশনারীরা খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারে বহু বাধাপ্রাপ্ত পান স্থানীয় রাজা ও ম্যান্‌জারিন (mandarin) থেকে কারণ তাদের কাছে খ্রিস্টধর্ম তাদের সমাজে ধর্ম ও সংস্কৃতির বিপরীত শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু এসব বাধা স্বত্বেও ক্রিশ্চান মিশনারীরা প্রাণের ভয় অতিক্রম করে তাদের ধর্ম প্রচারের কাজ চালিয়ে যান এবং এর ফলে ভিয়েতনামে ফরাসি আক্রমণের প্রাক্-মুহূর্তে সেখানকার ক্রিশ্চান মানুষের সংখ্যাই ছিল প্রায় তিন লক্ষ। এই কারণেই প্যারিসে ফরাসি সরকার যখন গুয়েন আনহ্‌কে সামরিক সাহায্য দিতে রাজি হল না, তখন ক্রিশ্চান মিশনারী পিনোহ্ দ্য বেহোন (pigneau de Behaine) পণ্ডিচেরিতে ফরাসি স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে নুয়েন আনহের সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করে তোলে এবং তেসোনদের পরাজিত করতে বিপুলভাবে সাহায্য করে। এর ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই সম্রাট জিয়া লঙ্ ফরাসি বণিক ও ক্রিশ্চান মিশনারীদের প্রতি তার সমস্ত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন এবং ফরাসিরা এই সুযোগে ভিয়েতনামে, কাম্বোডিয়ায় ও লাওসে তাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করে।

সম্রাট জিয়া লঙ-এর পর উত্তরাধিকারী সূত্রে সম্রাট মিন্ ম্যাঙ্গ (Minh Mang) ১৮২০ থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তিনি খুবই বীর এবং পরাক্রমী নৃপতি ছিলেন এবং কনফুসিয়ান মতবাদী ছিলেন এবং যেহেতু খ্রিস্টধর্ম কনফুসিয়ান মতবাদের পরিপন্থী ছিল, তাই ১৮৩৩ সালে তিনি এক রাজকীয় ঘোষণাপত্র জারির মধ্যে দিয়ে খ্রিস্টধর্মকে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য পাপ রূপে ঘোষণা করেন। তিনি ফরাসি মিশনারীদের প্রতি এতটাই বিরূপ ছিলেন যে তিনি তাদের কারাদণ্ড, দেশত্যাগ এবং মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত শাস্তি দিতেন।

সম্রাট মিন্ ম্যাঙ্গ (Minh Mang) এর উত্তরাধিকারী ছিলেন সম্রাট থিউ ত্রি (Thieu Tri) এবং যিনি মাত্র প্রায় সাত বছর (১৮৪১-১৮৪৭) রাজত্ব করেন। তিনি প্রবলভাবে কনফুসিয়ান মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ক্রীশ্চান মিশনারীদের প্রতি ছিল অপরিসীম ঘৃণা। তিনি বিদেশী মিশনারীদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ ও প্রত্যাখান করেছিলেন এবং তার রাজত্বকালে ফরাসি নৌবাহিনীর সেনাধ্যক্ষরা প্রায়শ ভিয়েতনামী বন্দরগুলি ঝটিকা আক্রমণ করতে ক্রিশ্চান মিশনারীদের জীবনরক্ষার স্বার্থে।

সম্রাট মিন্ ম্যাঙ্গের পর, সম্রাট তু ডাক্ (Tu Duc) ক্ষমতায় আসেন এবং তার রাজত্বকালের স্থায়িত্ব ছিল ১৮৪৭ থেকে ১৮৮৩ পর্যন্ত। এই সময়ে ভিয়েতনামের পরিস্থিতি আরও সঙ্কটময় হয়ে ওঠে। সম্রাট তু ডাক্ যে শুধু তাঁর পূর্বসুরীদের ন্যায় খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন তা নয়, এছাড়াও তিনি সমগ্র ভিয়েতনাম থেকে সমস্ত ক্রিশ্চান সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেন। তার এই অমিত্র ও অমানকি আচরণ বন্ধ করার জন্য ফরাসি ও স্প্যানিশ ফৌজ যৌথভাবে আডমিরাল Rigault de Genouilly-র নেতৃত্বে একটি অভিযানে লিপ্ত হয় এবং ১৮৫৮ সালে টুরেন (Tourane) বন্দরে বোমা নিক্ষেপ শুরু করে। এই যৌথ অভিযানের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল একজন স্প্যানিশ মিশনারী পাদ্রীর প্রাণনাশ। এই সংযুক্ত অভিযান রাজধানী হিউ (Huc) পর্যন্ত পৌঁছতে না পেরে, তারা তার গতিপথ পরিবর্তন করে এবং শেষে দক্ষিণের কোচিন চায়না (Cochin-China) অন্তর্গত সায়গন (Gia Dinh) দখল করে নেয়। এই অভিযান মূলত বিঘ্নিতহয় চীনের বিরুদ্ধে ফরাসি ও পশ্চিমী শক্তির যুদ্ধের দরুন। ১৮৬০ সালে চীনের সঙ্গে ফরাসি ও পশ্চিমী শক্তির সমন্বয় পিকিং সন্ধি (Treaty of Pcking) স্বাক্ষর করে এবং তার কিছু দিন পরেই বিজয়ী ফরাসি শক্তি পুনর্বার ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করে। কিন্তু ভিয়েতনামের প্রবল প্রতিরোধ সত্বেও ফরাসি আধুনিক সাজে সজ্জিত সমরাস্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে এই যুদ্ধে -জয়লাভ করে। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে এই পরাজয় ভিয়েতনামবাসীর ফরাসি বিরোধিতার লেশমাত্রও কমায়নি। ঐতিহাসিক Leopold Pallu de la Barriere-এর মতে, ট্রুয়ঙ্গ ডিন্ (Trong Dinh)-এর নেতৃত্বে ফরাসিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চরিত্রই ছিল জনযুদ্ধের এবং এই জনযুদ্ধ প্রায় সমগ্র ভিয়েতনামবাসীরই সমর্থন ছিল।

এই জনশক্তি যখন ফরাসি সৈন্যের বিরুদ্ধে অদম্য শক্তি ও পরাক্রম নিয়ে সংগ্রামরত এবং বিজয়ের সিংহদ্বারে প্রায় আগত, তখনই হিউ (Hue)-এর রাজসভা পরাভবের মনোভাব প্রদর্শন করে আক্রমণকারীদের সাহায্য করে সেই অচলাবস্থা থেকে নির্গত হতে। ১৮৬২ সালের ৫ই জুন, ফরাসি এডমিরাল বোনাড্ (Bonard) সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার দ্বারা ভিয়েতনাম নাম বোর (Nam Bo) তিনটি পূর্বপ্রদেশ, ক্ষতিপূরণ হিসেবে ২০ মিলিয়ন্ ফ্রাঁ (Francs), রোমান ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারের অনুমতি ও ফরাসি বাণিজ্যের জন্য তিনটি বন্দর খুলে দিতে চুক্তিবদ্ধ হয়। ইহা ছাড়া, ভিয়েতনামের জনতাবাহিনীকে অস্ত্র সমর্পণ ও ফরাসিদের প্রদেশগুলি হস্তান্তরিত করার কথা বলা হয় এই চুক্তিতে, কিন্তু অস্ত্র সমর্পণ না করে, ভিয়েতনামী ফৌজ তাদের লড়াই চালাতে থাকে জেনারেল ট্রুয়ঙ্গ ডিন্ (Troung Dinh)-এর নেতৃত্বে। তিনি ফরাসি সেনাধ্যক্ষকে ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসে একটি চিঠি লিখে ফরাসি সৈন্যের নির্বিচারে অত্যাচারের নিন্দা করে এবং হস্তান্তরিত তিনটি প্রদেশ পুনর্বার ফিরিয়ে দিতে বলেন। ভিয়েতনামবাসী ফরাসি সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অবতীর্ণ হয়, কিন্তু হিউ (Huc)-এর রাজ্যসভার তোষণের নীতিতে বিদ্রোহী ভিয়েতনামীদের পশ্চিমে চলে যেতে হয় এবং তাদের সমস্ত সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় তোষণ নীতি ফরাসিদের কোনভাবেই খুশি করতে পারল না এবং ১৮৬৭ সালে কোচিন-চায়নার পশ্চিম প্রদেশগুলি ফরাসিরা দখল করে নেয় এই অজুহাতে যে এই প্রদেশগুলিকেই ভিয়েতনামীর বিদ্রোহী ব্যবহার করেছে ফরাসিদের বিরুদ্ধে। এইভাবেই ফরাসিদের কোচিন-চায়না দখল শেষ হয়।

দৃশ্যতই প্রশ্ন জাগে সে হিউ-এর রাজদরবার ফরাসিদের তোষণ নীতি কেন গ্রহণ করে, যখন অন্যদিকে ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধারা প্রায় বিজয়ের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছিল? Paulin Vidal, যিনি বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং যিনি ফরাসি-ভিয়েতনামী যুদ্ধের সাক্ষী ছিলেন, তিনি তার Les Primieres Anncees de la Coching-China (The First Years of Cochin-China, 1861) নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে যদিও হিউ-এর রাজদরবার বহুবারই ফরাসি শান্তিচুক্তি প্রত্যাখান করেছিলেন, কিন্তু সেবার সম্রাট তড়িঘড়ি করে সেই চুক্তি স্বাক্ষর করেন এডমিরাল বোনাড় (Admiral Bonard)-এর সঙ্গে কারণ তিনি উত্তরের লে বংশের উত্তরাধিকারীদের বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এছাড়াও এই সময়ে ফরাসিরা মেক্সিকান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল এবং ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ান (তৃতীয়)-কে বহু ফৌজ সেখানে পাঠাতে হয়েছিল, এবং কোচিন-চায়নায় ফৌজ পাঠানোর মতো অবস্থা আর তাঁর ছিল না। তাই ফরাসিরা শান্তিচুক্তির জন্য অধীর আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। অন্যদিকে আবার হিউ-এর রাজদরবার ফরাসিদের এই অসুবিধার সংবাদ ও দুর্বলতা সম্বন্ধে একেবারেই অবগত ছিল না এবং তাছাড়া তারা ফরাসিদের আধুনিক অস্ত্র সজ্জায় অবস্থান সম্বন্ধে বেশ ভালোই ভীত ছিল। আবার ফরাসি সৈন্যরা সন্দেহ করল যে মুক্তিযোদ্ধারা সম্রাটের মদতপুষ্ট এবং তাই তারা ১৮৬২-এর চুক্তির দ্বারা পশ্চিমী প্রদেশগুলি হস্তগত করে নেয়। এর থেকে আমরা উপসংহারে এই বলতে পারি যে প্রধানত দুটি নিম্নলিখিত কারণ, যথাক্রমে :

(ক) সম্রাটের পরামর্শদাতা ও বিদ্রোহীদের মধ্যে মতপার্থক্য;

(খ) হিউ-এর রাজদরবার ভিয়েতনামী বিদ্রোহীদের শক্তির প্রকৃত মূল্যায়ন করতে না পারা ও নিজের দেশের দীর্ঘসূত্রী যুদ্ধের জন্য ফরাসি শক্তির বুঝতে না পারা দুর্বলতা।

এই দুটি কারণের জন্যই মূলত হিউ তড়িৎ গতিতে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত করে কোচিন-চায়নার সার্বভৌমত্ব ফরাসিদের হাতে তুলে দেয় এবং নিজেদের অজান্তেই ফরাসিদের ইন্দো-চায়নায় উপনিবেশিকতার ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপনে সাহায্য করে, যার ইতিহাসের বয়স প্রায় ৯৪ বছর।

৭৭.৫ ফরাসি ও টনকিন

ফরাসিদের এই সাফল্যের পর, তাদের দৃষ্টি পড়ে উত্তরের টনকিন (Tonkin) প্রদেশের দিকে। ১৮৭৩ সালে Jean Duphis নামক একজন ফরাসি বণিক উত্তর ভিয়েতনামের রেড্ নদীর অভিযান করেন। যখনই ভিয়েতনামীরা এই অভিযানের বাধা সৃষ্টি করেন, তখনই ফ্রানসিস্ গারনিয়র (Francis Garnier) নামক এক ব্যক্তি, মুষ্টিমেয়

কয়েকজন ব্যক্তি নিয়ে তাদের আক্রমণ করেন এবং হ্যানয় ও রেড নদীর ব-দ্বীপের অনেকখানি অংশ অধিকার করে নেন। ফলে সম্রাট তু ডুক্ (tu Duc), সায়গনের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয় ১৫ মার্চ ১৮৭৪ সালে, যার দ্বারা তিনি কোচিন-চায়নায় ফরাসি অধিকার মেনে নেন, ক্রিশ্চান ধর্মের প্রচারের স্বাধীনতা দেন এবং এর বদেল ফরাসিরা তাঁকে সবরকম সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন ও দস্যুবৃত্তি বন্ধ করতে অস্ত্র ও সৈন্য দেবার আশ্বাস দেন। এর পরিবর্তে ফরাসিরা সম্রাটকে হ্যানয় ফিরিয়ে দেন। কিন্তু সম্রাট তু ডুক্ এই চুক্তি উপেক্ষা করেন, চীনের সম্রাটের কাছে সাহায্যের অনুরোধ করেন এবং চীন ও উত্তর ভিয়েতনামে তার ফৌজ প্রেরণ করেন। কিন্তু ফরাসি ফৌজ পুনরায় হ্যানয় জিতে নেন ও দ্বিতীয়বার সম্রাট তু ডুক হিউ চুক্তি স্বাক্ষর করেন ২৫শে আগষ্ট ১৮৮৩ সালে এং যার দ্বারা টনকিন্ (Tonkin) ও আন্নাম (Annam)-এর উপর ফরাসি অভিভাবকত্ব স্বীকার করে নেন। এরপর ফরাসিদের চীনের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হয় ব্ল্যাক-ফ্ল্যাগ নামক জলদস্যু ও গেরিলা বাহিনীকে ধ্বংস করতে, যারা চীনের মদতপুষ্ট ছিল। শেষে ১৮৮৫ সালের ৯ই জুন তিয়ান সিন্ (Tien Tsin) চুক্তির মাধ্যমে টনকিন্-এর উপর ফরাসি কর্তৃত্ব (Protectorate) স্বীকার করতে বাধ্য হয় চীন।

সম্রাট তু ডুক্ (Tu Duc)-এর মৃত্যুর পরে, তার প্রকৃত উত্তরাধিকারীর ব্যাপারে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তুঙ্গে ওঠে ও রাজশক্তিকে দুর্বল করে তোলে। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ফরাসিরা তাদের অঙ্গুলি হেলন শুরু করে রাজার ওপর। ১৮৮৪ সালের ৬ই জুন ফরাসিরা সম্রাটের সঙ্গে আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষর করে যার দ্বারা আন্নাম (Annam)-এর যে কোন স্থান সামরিকভাবে উপভোগ করার অধিকার পায় ফরাসিরা। কোচিন-চায়না (Cochin-China) পূর্বেই ফরাসিরা অধিকার করে নিয়েছিল এবং টনকিন্ (Tonkin) ও আন্নাম (Annam)-এর ওপর ফরাসি কর্তৃত্ব স্থাপনের ফলে ভিয়েতনামের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয় শেষ পর্যন্ত। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ কিন্তু থামল না এবং ১৮৮৫ থেকে ১৮৯৫ এর মধ্যে বহু বিদ্রোহের কথা শোনা যায় উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে। ফরাসি শাসনের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম চলেছিল ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত যখন দিয়েন বিয়েন ফুর বিখ্যাত যুদ্ধে ফরাসি শক্তি পর্যুদস্ত হয় এবং ১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৭৭.৬ ফরাসি উপনিবেশিকতার অধীনে ভিয়েতনাম

ভিয়েতনামের ওপর অধিকার পাওয়ার পরই, ফরাসিরা তাদের উপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত করেন সেই দেশে এই আশায় যে ভিয়েতনাম তাদের এশিয়া মহাদেশে সক্তি প্রসারের স্থায়ী ঘাঁটি হবে। এই সময়, টনকিন্ (Tonkin)-এর শাসনব্যবস্থা পরোক্ষভাবে একজন ফরাসির হাতে ছিল, কিন্তু তাঁর পাশাপাশি ভিয়েতনামী মান্দারিন অর্থাৎ সিভিল সার্জেন্ট (যাদের প্রধান একটি কাজ ছিল জোর করে কর সংগ্রহ) কর্মীরাও বর্তমান ছিল। অন্যদিকে আন্নাম (Annam) তার সম্রাট ও হিউ-এর রাজসভা করে রাখল, কিন্তু ফরাসিরা আন্নাম (Annam)-এর শাসনব্যবস্থায় মাঝে মাঝেই হস্তক্ষেপ করত। এছাড়া কোচিন-চায়না (Cochin-China) সম্পূর্ণভাবে তখন ফরাসীদের দখলে চলে গেল। ১৮৬৩ সালে কাম্বোডিয়া ফরাসি কর্তৃত্ব মেনে নিল কারণ তারা তাদের

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ভয়ে সর্বদা ভীত ছিল। ১৮৮৭ সালে ফরাসি শাসকেরা টনকিন, আন্নাম এবং কাম্বোডিয়াকে কোচিন-চায়নার সাথে যুক্ত করে তাদের একটি সংযুক্ত শাসনব্যবস্থার অধীনে নিয়ে এল ও এই সম্পূর্ণ অঞ্চলটি এক নতুন নামের মাধ্যমে অর্থাৎ ইন্দোচায়না নামে আত্মপ্রকাশ করল ইতিহাসের পাতায়, ১৮৯৩ সালে লাওস্ (Laos)-কে ইন্দোচায়নার সাথে যুক্ত করা হয় ফরাসি উপনিবেশিকতার সুবিধার্থে।

ইন্দোচায়না শাসন করত একজন রাজ্যপাল এবং তাকে সাহায্যের জন্যে একটি মন্ত্রণা পরিষদ ছিল। একই রাজ্যপাল সরাসরি প্যারিসে স্থিত উপনিবেশ সংক্রান্ত মন্ত্রীর কাছে দায়বদ্ধ ছিল। মন্ত্রণা পরিষদ (Advisory Council) সৃষ্টি হয়েছিল উধর্বতন ফরাসি আধিকারিক ও বিশিষ্ট ইন্দো-চীনের ব্যক্তিবর্গ নিয়ে। ইন্দো-চায়নার আইন প্রণয়ন করত ফরাসি পার্লামেন্ট, ও রাজ্যপালকে প্যারিসের নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা চালাতে হত। একমাত্র Paul Doumer (1897-1902) ছাড়া, অন্যান্য গর্ভণর জেনারেলদের বা রাজ্যপালদের এত তাড়াতাড়ি ভিন্ন জায়গায় বদলি করা হত যে উপনিবেশ শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতা কখনই পূর্ণাঙ্গরূপে আত্মপ্রকাশ হয়নি।

কোচিন-চায়নার শাসনব্যবস্থা সরাসরিভাবে একজন গভর্ণরের শাসনে ছিল এবং তাঁর সহায়তার জন্য দু'টি সভা বা Assembly ছিল, যথা—(ক) The Privac Council of an Advisory Chamber এবং (খ) উপনিবেশ পরিষদ (Colonial Council), যে বাজেটের নির্বাচন করত। এমনিভাবে টনকিন্ (Tonkin) যদি সম্রাটের অধীনে ছিল এবং তিনি তার সরকারি কর্মীদের সাহায্যে শাসন করতেন, কিন্তু বকলমে আসল শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল সেখানে বসবাসকারী ফরাসি আধিকারিকের (French Resident) হাতে। আবার আন্নামের (Annam) ক্ষেত্রে যদিও হিউ-এর রাজসভার সম্রাট সাসন করতেন, কিন্তু তার বিদেশনীতি নির্ধারণের কোন ক্ষমতাই ছিল না এবং রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও ফরাসি আধিকারিকের প্রয়োজন হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা ছিল, তাই দৃশ্যতই ভিয়েতনামের প্রকৃত ক্ষমতা ফরাসিদের হাতেই কেন্দ্রীভূত হয় এবং টনকিন্ ও আন্নামের হাতে ক্ষমতা ভিয়েতনামীদের কাছে থাকে নামমাত্ররূপে।

৭৭.৭ ফরাসি শাসনের বৈশিষ্ট্য

ফরাসি উপনিবেশিক নীতি ইন্দোচায়নায় ও তার অধস্তন কর্মীদের সঙ্গে সময়ের সাথে সাথে বদল হত, যদিও প্রকৃত উদ্দেশ্যে অর্থাৎ অর্থনৈতিক শোষণের নীতি ছিল এদের মূল মন্ত্র। এসব সত্বেও ইহা সত্য যে ফরাসি গভর্ণর-জেনারেল পল ডুমারই (Paul Doummer) ইন্দো-চায়নাকে মাতৃভূমির জন্য লাভজনক আয়ের উৎসসাধন করে তোলার নীতি নির্ধরিণ করেছিলেন এবং এরই সঙ্গে তিনি কিছু শাসনব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেছিলেন। তিনি "initial development" অর্থাৎ প্রাথমিক উন্নতি নামক কিছু সংস্কার প্রণয়ন করেন, ইন্দোচায়নাকে ফ্রান্সের সর্ববৃহৎ ধনী উপনিবেশ করার উদ্দেশ্য। এইসব সংস্কারের প্রধানত তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল :

(ক) খুবই লঘু বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ;

(খ) যন্ত্রাদি ক্রয় ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন;

(গ) ঔপনিবেশিক কৃষি, বাণিজ্য, ও শিল্পের প্রসারতা।

ফরাসি শাসকের এইসব প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই ভিয়েতনামবাসীদের আর্থিক অবনতির চিত্র। কৃষিক্ষেত্রে ফরাসি শাসকদের নব্য ভূমিসংস্কার নীতির দরুন ভিয়েতনামী কৃষকদের আর্থিক উন্নতি একেবারেই প্রায় হয়নি। যদিও এই কৃষকেরা সমগ্র জনসাধারণের ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ ছিল। আবার টনকিন্ ও আন্নাম্-এ বহুভূমির মালিকেরা নিজেরাই চাষ করত, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে তাদের জমির পরিমাণ খুবই ক্ষুদ্রাকারের ছিল। টনকিন্-এ ৬২% কৃষকের ০.৯ একরের কম এবং ৩০% কৃষকের ০.৪ একরের কম জমি ছিল। আবার আন্নামের অবস্থা এর থেকে কিছুটা ভালো ছিল। কিন্তু কোচিন-চায়নায় বহু জমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল এবং এইসব জমিগুলি ছিল প্রায় অনুর্বর। ফরাসি নীতির দরুন কৃষক প্রজার জীবনধারণ নিম্নগামী হয়েছিল এবং এর প্রভাব দেখতে পাই যে, প্রায় জনসংখ্যার ৯৫% মোট ২৯% ধানিজমির মালিক ছিল এবং বাকি ৫ শতাংশ অবশিষ্ট জমির অংশের মালিক ছিল। গ্রামাঞ্চলে যেহেতু ক্ষুদ্র শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া হত না এবং এ দরুণ সাধারণ কৃষক ও গ্রামবাসীর কোন সম্পূরক আয়ের উৎস ছিল না, তাই জীবনধারণের তাগিদে এইসব সাধারণ মানুষ ঋণের জালে জর্জরিত হয়ে শ্রমিক অথবা ভাগচাষীতে পরিণত হত। এইসব ভাগচাষীর অবস্থা ছিল খুবই করুণ। এছাড়া ফরাসি শাসনব্যবস্থায় আমরা দেখতে পাই যে দেশের মধ্যে সভাসমিতি, সংবাদপত্র ও ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার কোন স্বাধীনতা ছিল না। যেহেতু ভিয়েতনাম তিনভাবে বিভক্ত ছিল, তাই ভিয়েতনামবাসীদেরও দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যেতে পাসপোর্টের প্রয়োজন হত।

আবার ফরাসি শাসনের কিছু ভালো দিকও ছিল। ফরাসিরা স্কুল, হাসপাতাল, ৩০০০ কিমি রেলপথ, ৩২০০ কিমি সড়কপথ, ৩০০ কিমি খাল, ১৬০০ কিমি টেলিফোন লাইন তৈরি ছাড়াও কৃষিজমি ও শিল্পের উন্নতির জন্য প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার মূলধন লাগিয়েছিল। কিন্তু ভিয়েতনামের শিক্ষাক্ষেত্রে ফরাসিদের অবদান ছিল খুবই স্বল্প। শুধুমাত্র ২% জনসংখ্যা প্রাথমিক শিক্ষা ও ১% জনসংখ্যা উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেছিল। এই সময় সম্পূর্ণ ভিয়েতনামে মাত্র ১৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একটি বিশ্ববিদ্যালয় (হ্যানয়ে অবস্থিত) স্থাপিত হয়েছিল। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগও এই সময় প্রথমের দিকে যথেষ্ট দুর্বল ছিল। ১৮৬৪ সালে ফরাসী সরকার সায়গানে একটিমাত্র হাসপাতাল স্থাপন করেন। পরে অবশ্য এই অব্যবস্থার খানিকটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ফরাসি শাসকগণ তাদের শাসনের ৫০ বছরে মধ্যে ২৫টি সাধারণ ও ৭টি বিশেষ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু মজার বিষয় হল এই সময় মোট কারাগারের সংখ্যা ছিল ৮৩টি, যা মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও হাসপাতালের সংখ্যার চেয়ে অধিক ছিল। এছাড়া জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই দুর্বল ছিল এবং জনসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশের বাৎসরিক আয় ছিল ১০ ডলারের নীচে। ফলে অনাহার, দুর্ভিক্ষ আর মড়ক-এ ছিল প্রতিদিনের ঘটনা। হাত কেটে ফেলা, মাথা কেটে গাছে ঝুলিয়ে রাখা, অবাধ্য প্রজাদের গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া— এ ছিল ফরাসি শাসকদের ভিয়েতনামে রাজত্ব করার ইতিহাস, দেশের সমস্ত রূপরস, অনুপম ঐশ্বর্য ডাকাতি করে নিয়ে যাবার মর্মন্তুদ কাহিনী। মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জোর করে চাপানো ভাষা, রাজা বাদশা আর বাধ্য বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে তৈরি করা প্রিভিলেজড্ গোষ্ঠী। তাঁরা দিয়ে গেছেন সাদা সাদা জারজ সন্তানের বেওয়ারিশ এক সম্প্রদায়। গলায় মালা ঝুলিয়ে রেখে গেছেন গ্রুপ ফটো। ঝাঁজালো রাজপুরুষের নামাঙ্কিত রাজপথ ও সুন্দর ছাপা-বাঁধাইয়ের বীর শাসকদের মেময়েরস্।

৭৭.৮ ফরাসি ঔপনিবেশিকতার ফলাফল : ভিয়েতনামী জাতীয়তাবাদের উত্থান

ফরাসি ঔপনিবেশিক কুশাসন সমগ্র ভিয়েতনামবাসীর মনে জাগিয়ে তোলে এক তীব্র ঘৃণার ইতিহাস, এই ঔপনিবেশিক শাসন জাতীয়তাবাদের আগুনে ঘৃতাহুতি দেয় এবং ভিয়েতনামী বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে কৃষক ও শ্রমিকরা স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফরাসি ঔপনিবেশকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য। এইসব বুদ্ধিজীবীরা চৈনিক অনুদ্রিত ইউরোপীয় পুস্তক পড়ে পশ্চিমী গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও শৈল্পিক এবং বিজ্ঞানিক উন্নতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। চীন ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাবলী দ্বারাও তারা প্রভাবিত হয়েছিল। ১৯০৫ সালের জার (Czar) শাসিত রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের বিজয়, পন্ বাইচৌ (Phan Bio Chou) নামক এক ভিয়েতনামীর নেতৃত্বে কিছু ভিয়েতনামবাসীকে প্রেরণা যোগায় জাপানী সহায়তায় ফরাসি শক্তিকে বিতাড়িত করার।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইন্দোচায়নাকে ফরাসিরা যোগদানে বাধ্য করেছিল। যুদ্ধের সময় তারা ভিয়েতনামের প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদকে শোষণ করল ৫০,০০০ সৈন্য, ৪৯,০০০ শ্রমিক ও ৩৩৪,০০০ টন খাদ্যসামগ্রী ঋণ রূপে নিয়ে। কিন্তু যুদ্ধকালীন দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভিয়েতনামী মানুষকে, ফরাসিরা যুদ্ধের পর অচিরেই ভুলে যায় এবং এর দরুন ভিয়েতনামী মানুষের মনে ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে। এই বঞ্চনা ক্রোধ এবং চৈনিক বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবিত বুদ্ধিজীবীরা ভিয়েতনামে গোপন সংস্থা ও পার্টির সৃষ্টি করে, একটি বিপ্লবের সূচনা জন্য। ১৯২৫ সালে The Dang Thanh Nien Cach Mang Dong Cht Hoi (the Vietnamese Revolutionary Comrades' Party) : ১৯২৬ সালে আন্নামে The Tan Viet Cash mang Dang (the New Vietnam Revolutionary Party) এবং ১৯২৭ সালে টনকিন-এ Vietnam Quoc Dan Dang (the Vietnam Nationalist Party) স্থাপিত হয়। ১৯৩০ সালে গোড়ায় ইন্দোচায়নাতে তিনটি কমিউনিস্ট পার্টি ছিল এবং এগুলো হল ইন্দোচায়না কমিউনিস্ট পার্টি, আন্নাম কমিউনিস্ট পার্টি ও ইন্দোচায়না কমিউনিস্ট লীগ। এই সমস্ত দলগুলি আলাদা আলাদাভাবে ফরাসিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল এবং নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল ভীষণ ক্ষীণ। ফলে ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এই সমস্ত দলগুলির লড়াই একেবারেই দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। এই দলগুলির সংগ্রামের প্রচেষ্টার শেষ ছিল না, কিন্তু অভাব ছিল দল পরিচালনার দূরদৃষ্টি ও সমনয়ের দুর্বলতা। এই সময় ভিয়েতনামের মাটিতে আবির্ভাব হয় এক আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়, কর্তব্য অবিচল, সত্যনিষ্ঠ, অনমনীয়, খর্ব, লীনদেহী, ভীরু স্বভাবের লাজুক এক যুবক কেউ সেদিন যাকে দেখে সন্দেহ করেনি, অতি নিকটের কাছের মানুষও কল্পনা করেনি সেদিন, এই যুবাই ভিয়েতনামের আগামী দিনে ইতিহাস রচনা করবে। দুনিয়ার মুক্তিকামী সংগ্রামী মানুষের পাশে থাকবে, হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিনিদ্র রজনীর কারণ। এই যুবক ফরাসি শাসনের সন্ত্রাসে মাত্র ২১ বছর বয়সে দেশ ত্যাগ করেন এবং বিভিন্ন ছদ্মবেশে বিভিন্ন দেশ ঘুরে ও প্রচুর জীবনসংগ্রামের মধ্যে এটাই শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করেন একমাত্র সোশ্যালিজম-কমিউনিজমই সারা দুনিয়ার নিপীড়িত জাতিগুলিকে ও শ্রমজীবী মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে পারে। তিনি মনে করেন লেনিনবাদ শুধু এ ধরনের একটি অলৌকিক মহাজ্ঞানকোষ-ই নয়, ইহা ভিয়েতনামের বিপ্লবীদের এবং সাধারণ মানুষের দিগদর্শনই নয় শুধু, ইহা এক জ্যোতির্ময় সূর্য। এই তরুণ যুবার নাম হল নগুয়েন সিন্ চুঙ্ (Nguyen Sinh Cung), ওরফে নগুয়েন ট্যাট্ থান্ (Nguyen Tat Thanh), ওরফে বা (Ba), ওরফে নগুয়েন আই কুয়ক্ (Nguyen Ai Quoc),

ওরফে ভুয়ঙ্গ (Vuong), ওরফে চিন্ (Chin), ওরফে লিন্ (Lin), ওরফে ত্রান (Tran) ওরফে হো চি মিন। দেশ ছাড়ার পর হো চি মীনের গতিবিধি ছিল খুবই রহস্যময়। ক্রমাগত নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় তার জীবনগতির কর্মময় তরঙ্গ। কখনও সাংহাই, শ্যামদেশে, কখনও জাভা, ফ্রান্স ও পর্তুগীজ এ্যাঙ্গোলা হয়ে আবার মস্কো এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুক্তিকামী সংগ্রামের পাশে থেকে হো তখন গতি দিয়ে চলেছেন। অবিশ্রান্ত দেশভ্রমণ, বিভিন্ন রাজনৈতিক পটভূমিতে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেললেও মুহূর্তের জন্যেও নিজের দেশের কথা ভুলতে পারেন নি। তাই জন্মভূমি ভিয়েতনামের কথা তাঁর মনে পুজো পেয়েছে এবং এরই ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই ফরাসী অপশাসনের বিরুদ্ধে ১৯২৫ সালে, কমিনটার্ন নিয়ন্ত্রিত কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবিত, চীনের ক্যেন্টন্ (Canton) শহরে হোচিমিনের ভিয়েতনামী বিপ্লবী যুবগোষ্ঠী (Association of Vietnamese Revolutionary Youth) স্থাপনের ইতিহাস। ইহার পর ১৯৩০ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী হংকং-এর কমিউনিস্ট সভায় হো চি মিন ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট দল গঠন করেন এবং দুমাস বাদে এই দলটি বৃহত্তর আকারে ইন্দোচীনের কমিউনিস্ট দল হিসাবে পরিচিত হয়।

১৯৩১ সালে ইন্দো-চায়না কমিউনিস্ট পার্টি বহু ধর্মঘট, সভাসমিতি ও অবস্থান করে, কিন্তু ফরাসি সরকার এইসব প্রচেষ্টা চূর্ণ করেদেয় অতি সহজে। ফলে হো চি মিনের নেতৃত্বে ইন্দো-চায়না কমিউনিস্ট পার্টি তাদের নীতি-কৌশলবদল করে এবং ১৯৪১ সালের মে মাসে দক্ষিণ চীনে, এই দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে ঠিক হয় যে ভিয়েতনামে স্বাধীনতা আনতে গেলে দেশের কৃষিজ নীতিও শ্রেণী বিপ্লব-এর পদ্ধতিগুলিকে কাজে লাগাতে হবে, এবং তা দ্বারাই সম্ভব সকল ভিয়েতনামবাসীদের মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করা। ফলে ধীরে ধীরে ইন্দোচায়না কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ভিয়েতনামে কৃষক ও শ্রমিকদের একটি বৃহৎ অংশ ঐক্যবদ্ধ সংগঠন গড়ে তোলে, ফরাসি-বিরোধী আন্দোলনকে ক্রমশ শক্তিশালী করার জন্য। হো চি মিন এই সমস্ত মানুষকে এবং ছোট ছোট রাজনৈতিক দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি বৃহত্তর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের ডাক দেন এবং জন্ম দেন এক সংগঠনের যার নাম হয় স্বাধীন ভিয়েতনামের গণতান্ত্রিক মোর্চা (Democratic Front for the Independence of Vietnam or The Viet Minh or the Viet Nam Doc Lap Dong Minh Hoi)। হো চি মিন এই নতুন সংগঠনে সভাপতি হন। এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল "দেশের সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এক জায়গায় জড়ো করা। তাদের মধ্যে ধর্মের, জাতের, লিঙ্গের ভেদাভেদ না করে এমন এক সংগ্রামে সামিল করা যা কিনা ভিয়েতনামকে এনে দেবে তার বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।" চু কোয়াক্ (Cuu Quoc) নামক এক উদ্ধারকারী সঙ্ঘ (Salvation Association) তৈরি করা হয়, যার মুল কাজ ছিল দেশের সমস্ত মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা। ভিয়েতমিন (Viet Minh)-এর চালনাকর্তারা ছিলেন কমিউনিস্ট, যারা অনেক বড় জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিকতার বিকাশ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। এই নেতারা দুরকম পদ্ধতির মাধ্যমে স্বাধীনতা আনতে বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং তার প্রথমটি ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সৃষ্টি কার। ভিয়েতনামী কমিউনিস্টদের পক্ষে এটা খুবই সহজ কাজ ছিল যে তারা তাদের পদ্ধতিগুলির দ্বারা জাতীয় স্বার্থ ও গণতান্ত্রিক স্বার্থকেই সবার উপরে রেখে কাজ করে চলা। তারা এটা করতে পেরেছিল কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিমী দেশগুলোর মধ্যে এক সামরিক

ঐক্য স্থাপন হয়েছিল। ভিয়েতনামীরা সাম্রাজ্যবাদী প্রথাকে মনে করেছিলেন একটি সাদা চামড়ার দ্বারা কালো চামড়ার অর্থনীতিকে হস্তগত করার চাল। তাদের কাছে গণতান্ত্রিক প্রথা এক অলীক কল্পনা মাত্র, কারণ তারা যতবার এই দুরুহ কাজে এগোতে চেয়েছিলেন, ঠিক ততবারই ফরাসিদের দ্বারা শোষিত ও বাধ্যপ্রাপ্ত হন। তাই ভিয়েতনামীদের কাছে সাম্রাজ্যবাদ ও ফরাসিদের স্বার্থ একই মুদ্রার দুইপিঠ বলে মনে হয়েছিল। ফলে, এক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যা কেবল ফরাসিদের শাসন খর্ব করতেপারে বিশেষ প্রয়োজন হয় এই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে। তাই ভিয়েত মিন (Viet Minh) দ্বারা সঞ্চালিত কমিউনিস্ট আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত ভিয়েতনামের সাধারণ মানুষ যোগদান করে ফরাসি ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে। ভিয়েত মিন (Viet Minh) আন্দোলনের মূল অস্ত্র ছিল গেরিলা আক্রমণ এবং এই বিশেষ পদ্ধতি ফরাসিদের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজানা। ফলে এই যুদ্ধের রণকৌশলই শেষ পর্যন্ত ফরাসি শাসকদের কাছে ইন্দোচায়না শাসনের প্রধান প্রতিবন্ধকতা রূপে দেখা দেয়। এই বিশেষ রণকৌশলের মূল প্রবক্তা ছিলেন ভো নগুয়েন গিয়াপ, যিনি ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ৩৪ জন লোক নিয়ে প্রথম গেরিলা গোষ্ঠী তৈরি করেন, ও এদের অস্ত্রের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কিন্তু সময় ও সংগ্রামের পরিবর্তনের সাথে সাথে এই একটি গোষ্ঠী পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে ছয়টি গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়। তাই সেনাপতি গিয়াপ এজনাই কোন এক সময় মন্তব্য করেন যে ভিয়েতনামের জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম মামুলী চিরাচরিত পথে এগোয়নি, তার পথ ছিল মেকং নদীর আনাচে-কানাচে, গভীর শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলের অনিশ্চিত ভূমিতে, বিপজ্জনক গুহার অন্ধকার খাদে, সাধারণ হাটে-বাজারের, ভীড়ের মধ্যে অতর্কিত আক্রমণ।

সময় অতিবাহিত হয়, জাপান কোরিয়া থেকে মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত তার বাহু বিস্তার করেছে। পার্ল হারবারে বোমাবর্ষণ শুরু হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপান তার অধিকার বিস্তার করে থাইল্যান্ড পর্যন্ত তেড়ে আসে। ভিসি সরকার কাম্বোডিয়ার খানিকটা ও মেকং ভ্যালীর পাশে লাওস-এর কিছুটা দিয়ে জাপানের সঙ্গে রফাতে আসতে চেষ্টা করে। জাপ-ফরাসি মিলিত শাসনের বিরুদ্ধে উত্তর ভিয়েতনামের লাং সন প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। জনসাধারণের অবস্থা অবর্ণনীয়। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাহায্যে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীরা এই বিদ্রোহ দেখা দেয়। জনসাধারণের অবস্থা অবর্ণনীয়। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাহায্যে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীরা এই বিদ্রোহ দমন করতে পারে না। ভিয়েতনামের সমস্ত মানুষকে একত্রিত করার জন্যে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এক ব্যাপক কর্মসূচীর ভিত্তিতে কমিউনিস্টরা হো চি মিনের নেতৃত্বে, জাপানী ফ্যাসিস্ট ও ফরাসি সাম্রাজ্যাদীদের শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করে স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপনে প্রচেষ্টার, এক বিপ্লবের ডাক দেয়।

ইতিমধ্যে জাপান ফরাসিদের হাত থেকে সমগ্র ইন্দোচীন কেড়ে নেয় এবং জাপানের বিশেষ নজর ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ওপর যেখানে ছিল প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষত পেট্রোলিয়াম, যা জাপানের ছিল না এবং যার প্রয়োজন জাপানের বিশেষভাবেই ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে। হো চি মিনের বিপ্লবের ডাকে গোটা ভিয়েতনামে তখন এক অভূতপূর্ব গণ-জাগরণ দেখা দেয়। দিকে দিকে পরিলক্ষিত হয় ভয়াবহ গণ-অভ্যুত্থান ও মুক্তিবাহিনীর একটার পর একটা শহর দখল। এরই মধ্যে জাপানীরা গণমতের আস্থাভাজন হবার চেষ্টায় বাও দাইকে (Bau Dai) সামনে রেখে একটা স্বাধীন সরকার স্থাপন করে। কিন্তু মেকী স্বাধীনতার

প্রতি ভিয়েতনামবাসীদের একটুকু ভরসা ছিল না। ফলে ১৯৪৫ সালে আগস্ট মাসে ভিয়েতনামের মানুষ সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করে ও ক্ষমতাহীন জাতীয় সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে। ১৯ আগস্ট হ্যানয়কে মুক্ত করে এবং শেষে সমগ্র দেশকে। এই ঘটনার পর ২৫শে আগষ্ট ভিয়েত মিন্ (Viet Minh) ফ্রন্ট ভিয়েতনামে সরকারের ঘোষণা করে এবং এই সরকারের রাষ্ট্রপতি হন হো চি মিন। সম্রাট বাও দাই এই নতুন সরকারের মন্ত্রণাদাত হয়ে থাকেন মাত্র। ১৯৪৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি হো চি মিন সমগ্র বিশ্বের সমক্ষে স্বাধীন ভিয়েতনাম রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের অন্তর্বর্তী সরকারে (Provisional Government of Democratic Republic of Vietnam) প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন ও আশি বছরের ফরাসি শাসনের সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই ঘোষণাপত্রে ছিল :

"ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীরা স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ কলুষিত করে আমাদের পিতৃভূমিকে অপমানিত ও আমাদের দেশবাসীকে পীড়িত করেছে। তারা মানবিকতা ও ন্যায়ের আদর্শের বিপরীতে কাজ করেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা আমাদের প্রতিটি গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছে।

তারা দেশকে তিনটি রাজনৈতিক ভাগে বিভক্ত করেছে, উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম, যাতে আমাদের দেশের ঐক্য খণ্ডিত হয় ও আমাদের দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে..."

এই ঘোষণাপত্রে ছিল সমস্ত ভিয়েতনামবাসী তাদের সমস্ত দৈহিক ও মানসিক শক্তি দিয়ে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবে। এই প্রতিজ্ঞা অন্তঃসারশূণ্য ছিল না। যখনই তার স্বাধীনতা ফরাসি বা মার্কিন আগ্রাসনে বিপন্ন হয়েছে, তখনই তারা পরাক্রম ও সাহস দিয়ে, হাজার হাজার মানুষের প্রাণ বিপন্ন করেও অসীম ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করেও দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করেছে।

আগষ্ট বিপ্লব বিশ্ব-ইতিহাসে অনন্য স্থান লাভ করেছে, কারণ এই প্রথমবার উপনিবেশের মানুষ একটি পশ্চিমী শক্তির বিরুদ্ধে রক্তাক্ষয়ী সংগ্রাম করে শেষে যুদ্ধে জয়লাভ করে। এটা এইজন্যও অনন্য যে কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্বে কৃষক ও শ্রমিকদের যৌথ সংগ্রামের কাছে শেষ পর্যন্ত ফরাসি ঔপনিবেশিক শক্তি পরাস্ত হয়েছিল।

৭৭.৯ ফারিস ঔপনিবেশিকতার পুনঃপ্রচেষ্টা ও ফলাফল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে ভিয়েতনাম কিভাবে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের হাতে চলে যায়, সে সম্পর্কে একটা ধারণা রাখা দরকার। পৃতিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তির মতলব ধরতে হবে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইয়োরোপ ও এশিয়া থেকে যুদ্ধ গুটিয়ে নেবার শর্ত ও অদৃশ্য বোঝাপড়া অনুধাবনের প্রয়োজন। যুদ্ধশেষে দেখা যায় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে সোভিয়েট রাশিয়া প্রতিষ্ঠিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিমান ও নৌশক্তিতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিঃ। ব্রিটেন দুর্বল, ক্লীবরূপী বৃহন্নলা। তেহেরান ও ইয়াল্টা।

বৈঠকে রুজভেল্ট ও মার্সাল স্ট্যালিনই প্রধান। এই বৈঠক থেকেই দুনিয়াকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হয় সোস্যাল ডেমক্রেটিক ক্যাপিটালিস্ট অঞ্চল, কমউনিস্ট রেভুলেশনারী সোসিয়ালিস্ট অঞ্চল, অপরটি হবে আমেরিকা রাশিয়ার পরস্পর রাজনৈতিক দড়ি টানাটানির প্রাঙ্গণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আটলান্টিক সাগরের তীরে নরওয়ে, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল ও প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে জাপান, জাপ দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণে চীন সাগর, শ্যাম, ইন্দোচীন, মালয় নিজেদের কাছে রাখা স্থির হয়, জার্মানিকে নিরস্ত্র করে ভাগ করে নেওয়া স্থির হয়। রুজভেল্ট স্ট্যালিনের দাবি মেনে নেন। পূর্ব ইউরোপ থেকে বাল্টিক-বল্কান দেশগুলির ওপর অধিকার এবং মাঞ্চুরিয়া অন্তঃ ও বহির্মোঙ্গোলিয়া সহ রুশ প্রভাব। কোরিয়াতে থাকবে দুজনের সমান অধিকার। রাশিয়া ফিনল্যান্ডের হ্যাংগোতে বেস্ (Base) রাখতে পারবে। লোহিত সাগর ডাইরেন ও পোর্ট আর্থারে ঘাঁটি রাখতে পারবে। রাশিয়ার হাতে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ—পোর্ট আর্থার থেকে ভ্লাডিভস্টক অক্ষত থাকবে। ভারত, বর্মা, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার দেশগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে ও রাজনৈতিক দড়ি টানাটানির তৃতীয় ক্ষেত্রে তৈরি হবে। এদিকে কায়রো বৈঠকে চিয়াং কাই শেক অনেক চেষ্টার পরে সাফল্য পান যে মাঞ্চুরিয়া, অন্তর্মঙ্গোলিয়া ও তিব্বতে তাঁর আধিপত্য থাকবে ও জাপানের হাত থেকে নিয়ে ফরমোজা তাঁকে দেওয়া হবে। তাছাড়া চিয়াং কাই শেক সরকারের সঙ্গে মিত্রপক্ষের অন্য রাষ্ট্রগুলির একটা বোঝাপড়া হয় যে জাপানীগণ ১৬ ডিগ্রি অক্ষাংশের উত্তরে অবস্থিত অঞ্চলগুলিকে চীনের হাতে প্রর্ত্যাপণ করবে। তদানুসারে ব্রিটিশ সেনাপতি গ্রেসী—ব্রিটিশ, ভারতীয় গুর্খাবাহিনী ও অন্তরীণ জাপানী সেনাদের সাহায্যে ভিয়েতনামকে জাপানের হাত থেকে মুক্ত করেন এবং পুনরায় ফরাসি সরকারের হাতে প্রর্ত্যাপণ করেন। তিনি সেখানে সামরিক আইন ও ভিয়েতনামে সংবাদপত্রগুলির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন এবং আশ্চর্যজনকভাবে সমস্ত পূর্ব শর্ত চুরমার করে, পটাসডম কনফোরেন্সের সমস্ত নির্দেশ ছিন্নভিন্ন করে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। তার এই ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশে অত্যাশ্চর্য ভূমিকা সম্পর্কে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরালাল নেহেরু তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন। এমন কী মার্কিন সেনাপতি ম্যাকার্থারও এই ঘটনাকে ভিয়েতনামের স্বাধীনতার সংগ্রামের ক্ষেত্রে একটি বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্করেখা বলে চিহ্নিত করেন। তাছাড়া পরবর্তীকালের ইন্টারন্যাশনাল কনট্রোল কমিশনের ডেপুটি সেক্রেটারী জেনারেল ডাঃ মূর্তি লিখেছেন:

> "It is surpising to find a Labour Government, at a time when they were already committed to freeing Indian and Burma, singing an agreement with the French on October 9, recognising French civil administration as the only one entitled todirect non-military forces south of the 16th parallel. However, it was the british who reinstalled the discredited French authority south of the 16th Parallel, thereby making themselves responsible for the war which followed in Vietnam."

এই পরিস্থিতিতে হো চি মিন, উত্তরে ভিয়েতনামের অঞ্চলগুলির ওপর তার কর্তৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। উল্লেখযোগ্য যে, ঐ অঞ্চলের চীনা সেনাপতিও হো-এর কর্তৃত্বকে বাস্তব দিক থেকে বৈধ কর্তৃত্ব (defacto authority) বলে মেনে নেন। এই সময় তিনি ফরাসি ও চৈনিক সাহায্য আদায়ের জন্য কৌশলগত ভাবে ভিয়েত মিন (Viet Minh) থেকে কমিউনিস্টদের সরিয়ে একটি জাতীয় ফ্রন্ট তৈরি করার জন্য সচেষ্ট হন, এবং তার ফলস্বরূপ ১৯৪৫ সালের

নভেম্বর মাসে ইন্দোচায়না কমিউনিস্ট পার্টিকে সাময়িকভাবে বিগঠন/দ্রাবণ করে। যদিও ইহা একটি পাঠ্যচর্চা গোষ্ঠী হিসাবে তাদের কার্যাবলী চালিয়ে যেতে পারে। এরপর হো চি মিন ভিয়েতনামের ভবিষ্যৎ অবস্থান সম্পর্কে ফরাসিদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। তিনি ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে উত্তর ভিয়েতনামে প্রথম জাতীয় গণ-পরিষদের নির্বাচন আয়োজন করেন। এই নির্বাচনে ভিয়েত মিন প্রধান রাজনৈতিক দল হিসাবে প্রচুর সাফল্য লাভ করে। মোট ৪৪৪ আসনের মধ্যে তারা প্রায় বেশিরভাগ আসনে জয়ী হন, যদিও প্রাক-নির্বাচন কালে তারা ৭০টি আসন বিরোধী পক্ষকে (i.e, Viet Nam Quoc Dan Dang or Vietnamese Nationalist Party, Dong Minh Hoi) ইত্যাদি ছেড়ে দেন। এই নির্বাচনের পর মার্চ মাসে হো চি মিনের নেতৃত্বে সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে এবং এই অধিবেশনে হো ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের প্রতি সমর্থন জানানো হয় এবং অবশেষে ৮ই নভেম্বর সংসদের অধিবেশনে উত্তর ভিয়েতনামের প্রথম সংবিধান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গৃহীত হয়।

ইতিমধ্যে, ১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে হো চি মিনের সরকার ষোড়শ অক্ষাংশের উত্তরে স্বাধীনভাবে স্বাভাবিক নিয়মে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময় ফ্রান্সের সঙ্গে হো সরকারে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নির্ধারিণের উদ্দেশ্যে এক দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শুরু হয় জেনারেল চিয়াং কাই শেকের নেতৃতে (Chiang Kai-Shek) চৈনিক ফৌজ ইন্দোচীন ছেড়ে যাওয়ার পর। এই চৈনিক ফৌজ ইন্দোচীন ছাড়ার আগে যে বিশেষ সুবিধা ফরাসি সরকারের কাছে নেয় তা হল হাইপঙ্গ (Haiphong) থেকে চীন পর্যন্ত রেলপথ, চীনের বিশেষ স্বীকৃতি ইত্যাদি। মার্চ মাসের ৬ তারিকে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, যার সুবাদে ফরাসি সরকার ভিয়েতনামের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে ফরাসি ইউনিয়ন ও ইন্দোচীন ফেডারেশনের মধ্যে একটি পরিপুর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকার করে নেয়। এই আলোচনায় আরো স্থির হয় যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গণভোটের মাধ্যমে নিধারিত হবে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের ঐক্য সাধনের সম্ভাবনা সম্ভব কিনা। তাছাড়া ফরাসি সরকারের ১৫,০০০ সেনা উত্তর ভিয়েতনামে অবস্থান করবে এবং প্রতি বছর ৩,০০০ ফৌজ অপসারণের মাধরমে ১৯৫১ সালের মধ্যে সমস্ত সৈন্য অপসারণ করতে হবে। অরপর একটি দ্বিতীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় চূড়ান্ত মিমাংসার জন্য, কিন্তু মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত আলোচনার ব্যাখ্যা সম্পর্কে দুই দেশের মধ্যে প্রচণ্ড মতভেদ দেখা দেয়, চুক্তির মর্ম যাই হোক না কেন, ফরাসি জেনারেল লে ক্লার্ক কিন্তু ষোড়শ অক্ষাংশের দক্ষিণে ভিয়েতনাম বাহিনীকে ঢুকতে দিলেন না। বরং উল্টে ফরাসি অনুগত ব্যবসায়ী ও জমিদারদের নিয়ে কোচিন চীনে অর্থাৎ দক্ষিণ ভিয়েতনামে একটি ফ্রি রিপাবলিক দাঁড় করালেন, এবং যার রাজধানী হল সায়গন। ওদিকে চিয়াং কাই শেকের ফৌজ গুটিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসিবাহিনী উত্তর ভিয়েতনামে আবার অভিযান শুরু করে।

শান্তিপুর্ণ সমাধানে জন্যে হো চি মিন ক্রমাগত চেষ্টা করে চললেন। প্রথমে দালাত কনফারেন্স, তারপর ফনতেন ব্লো বৈঠক। কিন্তু এই আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। ফলে শান্তিপুর্ণ সমাধানের কোন পথই খোলা রইল না। ফরাসিরা চুক্তির কথা তুলতেই সরাসরি জানায় যে তারা কোচিন চীনের জন্যে কোনো চুক্তি করেনি। ঐ বছরের অক্টোবর মাসে ফরাসি সরকার একটি যুদ্ধোত্তর সংবিধান গ্রহণ করে, কিন্তু ফরাসি যুক্তরাষ্ট্রের সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে পুরোপুরি স্বাধীনতা প্রদান করেনি। ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে ভিয়েতনামের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র তার সংবিধান অনুমোদন করে, যদিও ফরাসি যুক্তরাষ্ট্রের (French Union) সদস্যপদের কোন উল্লেখ ছিল না।

ফলে উত্তেজনা দেশের মধ্যে বাড়তে থাকে এবং শেষে ভিয়েতনামের উত্তর ও দক্ষিণে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৪৬ সালে এক ফরাসি যুদ্ধজাহাজ থেকে সাফরেন্ (Suffren) নামক এক ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে হাই-ফং (Haiphong)-এর উত্তর বন্দরে বোমাবর্ষণ করে এবং যার দরুন প্রায় ৬,০০০ নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়, ফলে এই ঘটনার পর থেকেই ভিয়েত মিন ও ফ্রান্সের মধ্যে বৈরিতার শুরু হয়। এই বৈরিতাই পরে যুদ্ধের আকার ধারণ করে যার নাম দেওয়া হয় প্রথম ইন্দোচীনের যুদ্ধ (1946-54)। এই যুদ্ধ ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে দেশের সমস্ত মানুষকে একত্রিত করে। এ যুদ্ধের চরিত্রই ছিল ভিন্ন। একটা গোটা জাতির পবিত্র বিরোধ সংগ্রামের বিরুদ্ধে শুধু সামরিক শ্রেষ্ঠত্বই যথেষ্ট নয়। এ যুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সর্বস্তরের মানুষের সংহত শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের লড়াই।

এই গণফৌজের অন্যতম নেতা ছিলেন তো নুয়েন গিয়াপ। তিনি ছিলেন ইতিহাসের ও আইনের ছাত্র। পেশাদারী সৈনিক বৃত্তির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কই ছিল না। হো চি মিন এঁকে ইয়েনানে মাও সে-তুং-এর কাছে হাতে কলমে গেরিলা রণনীতি শেখবার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। ফরাসিদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধে গিয়াপের অবিশ্বাস্য রণকৌশল পশ্চিমী রণবিদদের অবাক করেছিল। খোদ আইজেনহাওয়ার, ম্যাকআর্থার ও ফোর্ট বিসভেনওয়ার্থে শিক্ষাপ্রাপ্ত অতি বড় জেনারেলদেরও তিনি ছিলেন হৃদকম্পের কারণ। শক্তি সংহত করে শত্রুর অপেক্ষাকৃত দুর্বল জায়গায় আক্রমণ করে শত্রুসৈন্য ধ্বংস ও জনপদ মুক্ত করাই ছিল গিয়াপের প্রথম কাজ। দেশের সর্বত্র তাঁর মুক্তিফৌজ ফলে ছড়িয়ে পড়ে।

ফরাসি ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয় নতুন পর্যায়ে। ফরাসি বাহিনী উত্তর ও দক্ষিণের সমস্ত শহরগুলি প্রায় দখল করে নেয়। ভিয়েতমিন গেরিলা তৎপরতা জঙ্গল ও পাহাড় থেকে এবার নীচের দিকে নামতে থাকে। হো চি মিন দেশবাসীকে সম্বোধন করে জানালেন "যার যা আছে, যেটুকু শক্তি আছে, তা নিয়েই এই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ কর ও প্রতিরোধ কর। যার রাইফেল আছে সে রাইফেল নাও, যার তরবারি আছে সে নাও তরবারি। যার তরবারি নেই, সে নাও কাস্তে ও লাঠি। এস, শত্রুকে প্রতিরোধ কর।" ফলে সমাজের সব অংশের মানুষ দলে দলে যোগ দেয় এই মুক্তি সংগ্রামে। শত্রুনিধন হাত থাকে ও গেরিলা বাহিনীর চাপ ফরাসিদের সহ্য করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এক-একটি অঞ্চল আস্তে আস্তে মুক্তি হতে থাকে।

১৯৪৯ সালের ৮ই মার্চ তারিখে ইউনিয়নের মধ্যে ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া ও লাওস্‌কে যুক্ত করা হয় একটি চুক্তির মাধ্যমে যার নাম Elysee চুক্তি, যা সাঙ্গ হয়েছিল ফরাসি রাষ্ট্রপতি ও ভিয়েতনামী মহারাজা বাও দাই (Bau Dai)-এর মধ্যে। যদিও আসল কর্তৃত্ব ফরাসিদের হাতেই ছিল। কিন্তু ভিয়েতনামী গেরিলা বাহিনীর আক্রমণের মুখে ফরাসি শাসকদের সামরিক পরিস্থিতি গুরুতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ফরাসি জেনারেল তার পরিকল্পনা দিয়ে সোজা ওয়াশিংটনে এলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ইন্দোচীন হঠাৎ করে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হয়ে ওঠে। চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে চিয়াং কাই শেকের পলায়ন ও লিবারেশন আর্মির নয়া চীন গঠন, তারপর কমিউনিস্ট চীনের হো চি মিন সরকারে স্বীকৃতি ও দু সপ্তাহ পরে মস্কোর ভিয়েত মিন সরকারের প্রত্যভিজ্ঞা, এই অঞ্চলের গুরুত্ব আরো

বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া ১৯৪৯ সালের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম নীতি যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তা হল যদি ভিয়েতনাম কমিউনিস্টদের কাছে নতি স্বীকার করে, তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তর রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্থ হবে ফলে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য আসতে শুরু করে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের যৌথ পরিকল্পনায় ভিয়েতনামে নতুনভাবে এক নোংরা যুদ্ধের প্রবর্তন হয়, এবং সমস্যাটি একটি আন্তর্জাতিক বিষয় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ফরাসি সামরিক তৎপরতার জন্য মার্কিন অর্থ সাহায্য আসতে থাকে প্রচুর পরিমাণে। ১৯৫০-এ এই সাহায্যের পরিমাণ ছিল বচরে £১৫০,০০০,০০০। ১৯৫৪-তে এই সাহায্য বেড়ে দাঁড়ায় বছরে £১,০০০,০০০,০০০-এ। ১৯৫৪ নাগাদ ভিয়েতনামে ফ্রান্সের সামরিক ব্যয়ের ৮০ শতাংশ দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফ্রান্সের পক্ষে ভিয়েতনাম সমস্যার একটি সামরিক সমাধান করা সম্ভব হয়নি।

ইতিমধ্যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে প্রচুর পরিমাণে সামরিক সাহায্য আসতে শুরু করে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে হো চি মিন সরকারের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের জন্য। ১৯৫১ সালে হো চি মিন জাতীয়তাবাদী শক্তিকে মজবুত করে তোলেন। এই সময় ভিয়েত মিন যুক্তফ্রন্ট মিশে যায় নিউ লীগ ফর দ্যা ন্যাশ্‌নাল ইউনিয়ন অফ্ ভিয়েতনাম (New league for the National Union of Vietnam) ওরফে লিয়েন ভিয়েত (Lien Viet)-এর সঙ্গে, যার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল একটি জাতীয়তাবাদী মঞ্চ তৈরি করা। এরপর হো ভিয়েতনামের ওয়ার্কার্স্‌ পার্টি (Lao Dong) প্রতিষ্ঠা করেন। যা বকলমে ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টিরই একটি অঙ্গ ছিল। এই প্রজাতান্ত্রিক নেতৃত্বে কমিউনিস্ট ধারা পরিস্ফুট হয়, যখন এই প্রজাতন্ত্রের শাসকগোষ্ঠীতে শ্রমিক দলের নেতারা সামিল হন। ফলে অকমিউনিস্ট সমর্থকদের হো চি মিন বা ফরাসীদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ এর মধ্যে ভিয়েতনামী প্রজাতন্ত্রের গেরিলা বাহিনী জেনারেল গিয়াপ অধীনে সমস্ত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে সংগ্রামের সীমারেখা দ্রুতগতিতে বাড়াতে থাকে।

ফরাসি সরকারের রক্তক্ষয়ী লড়াই হো চি মিন সরকারে বিরুদ্ধে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ইন্দোচীন যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯৫৩ সালে কোরিয়াতে যুদ্ধের অবসান হওয়ার পর কমিউনিস্ট দেশগুলির ইন্দোচীনের উপর মনোনিবেশ ও মার্কিন সমরশক্তি ফরাসিদের সাহায্যে ভিয়েতনাম যুদ্ধের ব্যাপকতা শতগুণ বাড়িয়ে দেয়। ফলে বন্যার মত মার্কিন যুদ্ধ সাজ-সরঞ্জাম সায়গানে আসতে থাকে, এবং মার্কিন নৌবহর চীনের উপকূলে টহল দিতে শুরু করে। এই সময় ফরাসি সেনাধ্যক্ষ হেনরি ন্যাঁভারে ইন্দোচীন আসেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন নেপোলিয়নের 'গ্লোয়ার মিলিত্যার'। তিনি তার পরিকল্পনা নিয়ে মার্কিন সামরিক বিশেষজ্ঞদের কাছে ছুটে যান। তার পরিকল্পনা কয়েকটি সামরিক অভিযানের ভিত্তিতে রচিত হয়। উত্তরে হ্যানিয় হাইফং উপকুল ও অববাহিকা এলাকা; কেন্দ্রে হুয়ে; দানাং; দক্ষিণে সায়গন-মেকং এলাকায় ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ ও যুদ্ধাস্ত্র সমাবেশ করা। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে ভিয়েত মিনদের ঘাঁটিতে ব্যাপক আক্রমণ। লুয়াং প্রাবাং থেকে উত্তর লাওসে সৈন্য প্রেরণ এবং তারপর উত্তর ভিয়েতনামে বিপুল সৈন্য সমাবেশ ঘটানো। কমিউনিস্টদের চীনের সীমান্ত রুদ্ধ করে ভিয়েত মিনদের ওপর চরম আঘাত হানা ও তাদের নির্মূল করা।

৭৭.১০ দিয়েন বিয়েন ফু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ

ফরাসি সেনাধ্যক্ষ হেনরি ন্যাঁভারে এই পরিকল্পনা ছাড়াও, প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি, "ইন্দো-চায়নার চিরাচরিত শত্রুপক্ষকে চূর্ণ করবেন।" বহুবছর ধরে ফরাসি সৈন্যরা নিজেদের এই বলে সান্ত্বনা দিত যে বিবর্ণ বস্ত্র পরিহিত "কাপুরুষ" ভিয়েত মিন সফল হত তাদের "আঘাত হেনে পালিয়ে যাওয়া"-র কৌশল এবং ফরাসি সৈন্যরা যে চিরাচরিত যুদ্ধকৌশলে অভ্যস্ত, সেখানে ভিয়েত মিন পরাস্ত হবে। দিয়েন বিয়েন ফুর যুদ্ধটা যত না জেনারেল গিয়াপের মস্তিষ্কপ্রসূত, তার থেকেও বেশি সেনাধ্যক্ষ ন্যাঁভারের। ন্যাঁভারের মুল কৌশল ছিল ভিয়েত মিন ফৌজকে প্রলুব্ধ করে দিয়েন বিয়েন ফুর সুদূর অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া। এই জায়গাটা চীন, লাওস ও ভিয়েতনামের পার্বত্য অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সংগ্রাম ক্ষেত্র। ভিয়েতনামের উত্তর-পশ্চিম পার্বত্য অঞ্চলে ইহা এক মস্ত উপত্যকা, দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৮ কিলোমিটার, ছয় থেকে আট কিলোমিটার চওড়া পর্বত ও ঠাসা জঙ্গলে ঘেরা অতি রমনীয় স্থান। ভিয়েতনাম লাওস পার্বত্য সীমান্তের অনেকগুলো পথ এখানে মিলিত হয়েছে। উপত্যকার ঠিক মাঝখানে মুয়োঙ থান গ্রাম, এবং যাকে ঘিরে দুর্ভেদ্য সামরিক প্রস্তুতি ফরাসিদের। ন্যাঁভারে (Navarre) আশা করেছিলেন ১৯৫৪ সালের গোড়ার দিকে ভিয়েত মিন দিয়েন বিয়েন ফু উপস্থিত হবে লাওসের ওপর দ্বিতীয় আক্রমণের উদ্দেশ্যে। ফরাসি সৈন্যরা আশা করেছিল যে শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্র ও বায়ুশক্তির প্রাধান্য থাকার কারণে তারা অনায়াসেই ভিয়েত মিন ফৌজের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে ও ফৌজের বিশাল ক্ষয়িক্ষতি সাধন করবে। কারণ ভিয়েত মিনের কাছে না ছিল কোন শক্তিশালী যুদ্ধবিমান বা ট্যাঙ্ক, ছিল না পর্বতাঞ্চলে যুদ্ধ করার মত কোন বিশেষ যুদ্ধযান। জেনারেল গিয়াপের পরাজয় ভিয়েত মিন ফৌজ শক্তিকে প্রায় পঙ্গু করে ফেলত। কিন্তু ফরাসি সৈন্যরা ভিয়েত মিনের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সঠিকভাবে যাচাই করতে পারেনি। এটা ফরাসীদের চিন্তাধারার মধ্যে ছিল না যে ভিয়েত মিন ফৌজের সেই শক্তি ও পরাক্রম আছে যে তারা সুবিশাল (৩০৫ মিলিমিটারের দু টনের চেয়ে বেশি ওজনের) কামান মানুষের পিঠে বহন করতে সক্ষম ছিল এবং অতি সাধারণ সাইকেলগুলিকে চতুর্দিকের পাহাড়ে দাঁড় করিয়ে ফরাসি সৈন্যদের ঘিরে ফেলা। তারা আরো কল্পনা করতে পারেননি যে ভিয়েত মিন ফৌজের রাতারাতি রাস্তা করে প্রধান সড়ক এড়িয়ে ক্রমাগত পেছনের সাপ্লাই লাইন ঠিক রাখা, অসংখ্য গেরিলা যোদ্ধা চোরা ট্রেঞ্চ কেটে ফায়ারিং রেঞ্জের মধ্যে থেকেও অক্লেশে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া ও নপামের আগুন যা পাথর পর্যন্ত গালিয়ে দেয়, কিন্তু বাঙ্কারে সুড়ঙ্গ ভিয়েত মিন ফৌজের আক্রমণের তীব্রতা হ্রাস পায় না একেবারেই। বরং দিয়েন বিয়েন ফু অঞ্চলে ফরাসি ফৌজের অবস্থা অনেকটা 'sitting ducks' মতো হয় কারণ তারা ভিয়েত মিন ফৌজের সুদূর নিক্ষিপ্ত কামানের গোলার লক্ষ্যমাত্রার চৌহদ্দির মধ্যে পড়ে যায়। ফলে ফরাসি ফৌজের রসদ প্রাপ্তির একটি রাস্তাই খালি ছিল— আকাশপথ। কিন্তু তাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ভিয়েত মিন ফৌজের বন্দুকের সামনে, কারণ সেগুলি আকাশপথে আসা ফরাসি বিমানের দিকেই তাক্ করা ছিল, ফলে ফরাসি জেনারেল ন্যাঁভারের পরিকল্পনা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়।

এই সময় এপ্রিল ও মে মাসের গোড়ার দিকে আমেরিকার সেক্রেটারী অব স্টেট্স জন ফসটার ডালেস দেখলেন ভিয়েত মিন ফৌজের হাতে বিপর্যস্ত ফরাসি ফৌজের সম্পূর্ণ পরিসমাপ্তির ঘটার থেকে একমাত্র মুক্তির

পথই হল চীন ও উত্তর ভিয়েতনামে আণবিক বোমাবর্ষণ। কিন্তু ডালেসের এই প্রস্তাব ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জেস বিদো ও চার্চিল সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন, কারণ এই পদক্ষেপ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটাতে পারে এবং এই যৌথ যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের উদ্যোগের প্রকৃত জবাব দিত সোভিয়েত ইউনিয়ন। ফলে ম্যানিলা থেকে নির্দেশ পেয়ে এটম বোমা নিয়ে মার্কিন বিমানবাহী জাহাজ টন্‌কিন উপসাগর ছেড়ে যায় এবং ফরাসি প্রধানমন্ত্রী মেঁদে ফ্রান্স কুড়ি দিনের মধ্যে ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসানের নির্দেশ দেন। তাই লক্ষ লক্ষ ডলারের মার্শাল প্ল্যানের সাহায্যে ঝানু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমস্তরকম সামরিক প্রচেষ্টা খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। ফিলিপাইন থেকে মার্কিন বোমারু বিমানের দৃকপাতহীন আক্রমণ যাকে মার্কিন বিশেষজ্ঞরা ঘটা করে নাম দেন "অপারেশন কালচার", শেষ পর্যন্ত একটি ছেলেখেলায় পর্যবসতি হয়। দিয়েন বিয়েন ফু যুদ্ধের শেষদিকে ৫৫ দিন, দিনে-রাতে একটানা দুর্ধর্ষ ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীদের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই চলে। অবশেষে ১৯৫৪ সালের ৭ই মে আমেরিকার মদতপুষ্ট গোটা ফরাসি সেনাবাহিনী আঠারো মাসের পরিকল্পনা পকেটে নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। তাই বলা যায়, ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীদের জেদ যত বৃদ্ধি পায় এই যুদ্ধে, ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রাম ততই অধিকতর কঠোর হয়ে ওঠে। এই যুদ্ধে দুই পক্ষেরই বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। পনেরো হাজার ফরাসি সৈন্যর মধ্যে এক হাজার পাঁচশো সৈন্য নিহত এবং চার হাজারের বেশি সৈন্য আহত হয়। অন্যদিকে ৫১,০০০ ভিয়েত মিন ফৌজের মধ্যে ৮,০০০ নিহত এবং ১০,০০০ আহত হয়। এই লড়াইয়ে ফ্রান্সের ক্ষতি যদি ৫ শতাংশ হয়, তবে মার্কিন ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৯০ শতাংশ। মার্কিন অর্থসাহায্য সত্ত্বেও ভিয়েতনাম যুদ্ধের জন্য ফ্রান্সকে প্রচণ্ড মূল্য দিতে হয়েছে। ১৯৫৪ নাগাদ ৯২০০০ ফরাসি সৈন্য নিহত হয় এই যুদ্ধে আহত হয় ১১৪০০০। এই যুদ্ধ জয় ফরাসী ফৌজ ও জেনেভায় ফরাসি কূটনীতিক ও রাজনীতিকদের সম্পূর্ণ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে দেয়। কিন্তু ইন্দোচীনের যুদ্ধ প্রলম্বিত করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চেষ্টা ব্যর্থ করার অভিযানও ভিয়েতনামের যোদ্ধাদের শুরু করতে হয়, এক নতুন ধারায়।

৭৭.১১ ১৯৫৪ সালের জেনিভা চুক্তি

দিয়েন বিয়েন ফুর পতন যখন আসন্ন, তখন জেনিভাতে ইন্দোচীন অর্থাৎ ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া ও লাওসের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও ঐক্যের ভিত্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মে ১৯৫৪ সালের প্রথম দিকে জেনিভায় শান্তির আলোচনা শুরু হয়। এই আলোচনায় যে সমস্ত দেশের প্রতিনিধিরা যোগদান করেন, সেই দেশগুলো হল—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, চীন, কাম্বোডিয়া, লাওস, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ব্রিটেন, দক্ষিণ ও উত্তর ভিয়েতনাম। কিন্তু সম্মেলনে নানারকম সঙ্কট দেখা যায়। কাম্বোডিয়ার বিভিন্ন দলকে রাগা নরোদম সিহানুকের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয়, সামরিক ও রাজনৈতিক দল রাজকীয় সরকার মনোনীত নির্দলীয় প্রধানমন্ত্রীকে মেনে নেওয়ার লাওস সমস্যারও সমাধান হয়। কিন্তু কোরিয়ার মত ভিয়েতনামকে দুভাগে ভাগ করার প্রস্তাবে ভিয়েতনামের ডেমোক্রাটিক রিপাবলিকের প্রতিনিধি ফাম ভান দঙ এই প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করেন। প্রস্তাব ওঠে ভিয়েতনাম ভাগ হবে কী নিয়মে? ফ্রান্স প্রস্তাব রাখে—কোচিন চীনের পুরনো ঔপনিবেশিক এলাকায় সীমান্ত টানা হোক। ব্রিটেন প্রস্তাব দেয় উত্তর দিকে সরিয়ে নিয়ে ১৬ অক্ষ-সমান্তরাল ধরে ভিয়েতনাম সাময়িকভাবে ভাগ

করা। সায়গনের "স্টেট্ অব ভিয়েতনাম"-এর প্রতিনিধি ত্রাণ ভান দো মার্কিন চাপে দাবি করে যে ২০ অক্ষ সমান্তরাল ধরে ভিয়েতনামকে ভাগ করা। কিন্তু ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের প্রতিনিধি ফাম ভান দঙ (Pham Van Dong) এই সমস্ত প্রস্তাব নাকচ করে বলেন, সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ও দর-কষাকষিতে তিনি রাজি নন এবং ভিয়েতনামকে কোন রকমেই ভাগ করার প্রশ্ন ওঠে না। সম্মেলনের বাইরে থেকে প্যাথেট লাও (Pathet Lao) প্রতিনিধি ও কনফারেন্সের টেবিলে বসে চৌ-এন-লাই দঙকে সমর্থন করেন, এবং এর দরুন জেনিভা সম্মেলন প্রায় ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হয়। এই সময় সম্মেলনের যুগ্ম সভাপতি ব্রিটেনের বিদেশ সচিব এনথনি্ ইডেন (Anthony Eden) ও রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী মলোটভ ও বাইরের থেকে ভারতের কৃষ্ণ মেনন অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন যেন জেনিভার আলোচনা শেষ পর্যন্ত যাতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয়। শেষে ইডেন প্রস্তাব দিলেন ১৭ অক্ষ সমান্তরালে ভিয়েতনামের কটি দেশ যেখানে সবচেয়ে সরু সেখানেই বিভাজনের রেখা টানা হবে, মালোটভের সঙ্গে আলোচনার পরই চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই এই প্রস্তাবে মোটামুটি রাজি হন ও প্রস্তাব দেন ভারত, কানাডা ও পোল্যান্ডকে নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠিত হবে। ফাম ভান দঙ তবুও আপত্তি তোলেন। যুক্তি হিসাবে তিনি নজীর দেখান যে, প্রায় এক লক্ষ ভিয়েত মিন ও গেরিলা ফৌজকে উত্তরে সরিয়ে আনতে হবে অথচ সায়গনের ফরাসি-মার্কিন ঘেঁষা সরকারের সৈন্যের গতিবিধি/মুভমেন্টের কোন ঝামেলাই নেই। এই আপত্তির প্রেক্ষাপটে তখন ইডেন ও মলোটভ ব্যক্তিগতভাবে আশ্বাস দেন—"সাময়িক দেশ বিভাগ এখন মেনে নিন। নির্বাচনের মাধ্যমে একটি মাত্র সরকার গঠিত হবার ব্যাপারটা আমরা দেখব। একটি মাত্র বৈধ সরকারকে ব্রিটেন ও সোভিয়েট রাশিয়া শেষে মেনে নেবে।" ফলে ফাম বান দঙ ইডেন ও মলোটভের এই প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত মেনে নেন। সারারাত্রি ধরে যুদ্ধবিরতি চুক্তি ও সাময়িক দেশ বিভাগের খসড়া তৈরি হয়। এমন সময় মূর্তিমান রাহুর মত ডালেস রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন। ফ্রান্সের প্রস্তাব তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বলেন "আপনাদের নির্বাচিত সায়গনের প্রতিনিধি বুলক্-কে আমরা চাই না। সায়গনের প্রধানমন্ত্রীর পদে আমরা অদ্বিতীয় এক মানুষকে খুঁজে পেয়েছি। আমরা নগো দিন দিয়েমকে সমর্থন করব।"

অবশেষে, একটানা ৭৫ দিন ধরে, শান্তি আলোচনার নামে কূটনৈতিক লড়াই-এর শেষে ভিয়েতনাম যুদ্ধ-বর্জন সংক্রান্ত চুক্তির ঐতিহাসিক জেনিভা সম্মেলনে শেষ হয় ২০শে জুলাই, ১৯৫৪ সালে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি, তবে ইন্দোচীন সম্পর্কে জেনিভা চুক্তিকে সম্মান জানানোর শপথ ঘোষণা করে পৃথক বিবৃতি দেয়। এই সম্মেলনে গৃহীত প্রধান প্রধান শর্তগুলি হল নিম্নরূপ :

৭৭.১২ চুক্তির পর্যালোচনা

প্রথম অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ১ : অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি রেখার দুদিকে পাঁচ কিলোমিটার স্থান সৈন্যমুক্ত রেখে প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের সৈন্যবাহিনী ঐ রেখার উত্তরে ও ফরাসী সৈন্যবাহিনী দক্ষিণে সরে যাবে।

অনুচ্ছেদ ২ : চুক্তি বলবৎ হবার ৩০০ দিনের মধ্যে অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি রেখার দুপাশে দুপক্ষের সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নেবার কাজ শেষ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৩ : যদি ঐ অস্থায়ী রেখা কোন জলপথের ওপর পড়ে, তবে ঐ জলপথ উভয় পক্ষের অসামরিক নৌ-চলাচলের জন্য খোলা থাকবে। ঐ জলপথের দুই তীর দুই দলের কর্তৃত্বাধীন থাকবে। যুক্ত কমিশন ঐ জলপথে নৌ-চলাচলের নিয়মকানুন ঠিক করবেন।

অনুচ্ছেদ ৫ : বর্তমান চুক্তি বলবৎ হবার ২৫ দিনের মধ্যে সৈন্যমুক্তএলাকা থেকে সামরিকবাহিনী, সরবরাহ ও অস্ত্রশস্ত্র তুলে নিতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৬ : যুগ্ম কমিশনের নির্দিষ্ট অনুমোদন ছাড়া সামরিক, অসামরিক কোন ব্যক্তি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ ৮ : সামরিক যুদ্ধবিরতি রেখার দুপাশে দু-দিকের সেনানায়কেরা অসামরিক শাসন ও সাহায্য ব্যবস্থার জন্যে দায়ী থাকবে। কাজের খাতিরে সামরিক ও অসামরিক কিছু সংখ্যক লোক নিয়োগ করা গেলেও ঐ সংখ্যা কোন কারণেই ট্রাং-গিয়া সামরিক কমিশন ও যুগ্ম কমিশনের নির্দিষ্ট সংখ্যা অতিক্রম করবে না। অসামরিক পুলিশের সংখ্যা ও বহনযোগ্য অস্ত্রের প্রকৃতি যুগ্ম কমিশন ঠিক করবেন। যুগ্ম কমিশনের নির্দিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া কারো অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বর্তমান চুক্তি বলবৎ করবার নিয়ম ও পদ্ধতি

অনুচ্ছেদ ১০ : উভয় পক্ষের সেনানায়কগণ তাঁদের সমস্ত রকমের যুদ্ধকার্য বন্ধ করবেন।

অনুচ্ছেদ ১১ : সমগ্র ইন্দোচীনে অস্ত্রসংবরণ নীতি অনুযায়ী ভিয়েতনামের সমস্ত রণাঙ্গনে উভয় দলীয় সৈন্যদের যাবতীয় যুদ্ধকার্য একই সঙ্গে বন্ধ হবে... উত্তর ভিয়েতনামে যুদ্ধবিরতি বলবৎ হবার সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষের কোন সৈন্য বা ঐ অঞ্চলের কোন বিমান ইন্দোচীনের অন্য কোথাও কোনপ্রকার যুদ্ধকার্যে লিপ্ত হতে পারবে না।

চুক্তি বলবৎ হবার ২৫ দিনের মধ্যে উভয় পক্ষ পরস্পরকে তাঁদের গতিবিধির সংবাদ জানাতে বাধ্য থাকবেন।

অনুচ্ছেদ ১২ : চুক্তি বলবৎ হবার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ট্রাং-গিয়া সামরিক কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত মাইন, ববি ট্রাপ, বিস্ফোরক পদার্থ ও অন্যান্য বিপজ্জনক পদার্থ অপসারণ ও বিনষ্টিকরণের দায়িত্ব দুপক্ষকে নিতে হবে। যদি কোন জায়গায় ঐসব বিপজ্জনক পদার্থ অপসারণ বিনষ্টিকরণ সম্ভব না হয় তবে সংশ্লিষ্ট দল ঐ স্থানে বিপদজ্ঞাপক চিহ্ন দিয়ে সতর্ক করবার দায়িত্ব নেবেন।

অনুচ্ছেদ ১৪ : (গ) যুদ্ধের সময় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের জন্যে কোনরকম প্রতিশোধমূলক আচরণ ও অত্যাচার করা চলবে না। কোন কারণেই গণতান্ত্রিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

(ঘ) যদি এক অঞ্চলের নাগরিক অন্য অঞ্চলে যেতে চান তবে জেলা কর্তৃপক্ষ তার অনুমতি দেবেন এবং সর্বপ্রকার সাহায্য করবেন।

অনুচ্ছেদ ১৫ : (১) সামরিক বাহিনী ও সমরাস্ত্রে পরিবর্তন ও প্রত্যাহারের নিয়মাবলী :

(ক) উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদের পরিবর্তন ও প্রত্যাহার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের ধারা অনুযায়ী ৩০০ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে।

(গ) বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী উভয় পক্ষেই তাদের সৈন্যবাহিনী এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সরিয়ে দেবে।

(ঙ) যুগ্ম কমিশন ও আন্তর্জাতিক কমিশন এই প্রত্যাহার ও পরিবর্তনের দায়িত্ব নেবে।

(২) সৈন্য প্রত্যাহার ও বদলীর স্থান ও চূড়ান্ত সময় :

ফরাসী সৈন্যবাহিনী

হ্যানয় পরিসীমা—৮০ দিন
হাইডং পরিসীমা—১০০ দিন
হাইফং পরিসীমা—৩০০ দিন

প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের সৈন্যবাহিনী

হ্যাম-তান ও খুয়েনমক্ অস্থায়ী সম্মিলন স্থান থেকে—৮০ দিন
মধ্য ভিয়েতনাম অস্থায়ী সম্মিলন স্থান থেকে (প্রথম দফা)—৮০ দিন
লাঁ দে জোন অস্থায়ী সম্মিলন স্থান থেকে—১০০ দিন
মধ্য ভিয়েতনাম অস্থায়ী সম্মিলন স্থান থেকে (দ্বিতীয় দফা)—১০০ দিন
পোয়তি কামো অস্থায়ী সম্মিলন স্থান থেকে—২০০ দিন
মধ্য ভিয়েতনাম অস্থায়ী সম্মিলন স্থান থেকে (শেষ দফা)—৩০০ দিন

তৃতীয় অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ১৬ : বর্তমান চুক্তি বলবৎ হবার পর সমগ্র ভিয়েতনামে নতুন সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ নিষিদ্ধ।

অনুচ্ছেদ ১৮ : বর্তমানে চুক্তি বলবৎ হবার পর বৈদেশিক কোন রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সামরিক ঘাঁটি কোন পক্ষেই স্থাপন করা যাবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

চুক্তি বলবৎ হবার পর উভয়পক্ষের আটক যুদ্ধবন্দী ও অন্তরীণ নাগরিকের মুক্তি ও পুনর্বাসন শর্ত।

অনুচ্ছেদ ২১ : (ক) সমস্ত যুদ্ধবন্দী ও অন্তরীণ নাগরিকদের ৩০ দিনের মধ্যে মুক্তি দিতে হবে।

(খ) 'অন্তরীণ নাগরিক' বলতে উভয়পক্ষের রাজনৈতিক ও যুদ্ধের কারণে ধৃত ব্যক্তিদের বোঝাবে।

(গ) সমস্ত যুদ্ধবন্দী ও অন্তরীণ নাগরিকদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের হাতে ফেরৎ দিতে হবে। ঐ কর্তৃপক্ষ তাদের বাসস্থান বা জন্মস্থান বা তাদের পছন্দমত অঞ্চলে পাঠানোর ব্যাপারে সহায়তা করবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

বিবিধ

অনুচ্ছেদ ২২ : উভয়পক্ষের সেনানায়কেরা বর্তমান চুক্তিতে উল্লেখিত শর্তভঙ্গকারী স্বপক্ষের সৈন্য বা সৈন্যবাহিনীকে শাস্তিদান করবেন।

অনুচ্ছেদ ২৫ : উভয়পক্ষের সেনানায়কগণ আন্তর্জাতিক কমিশন বা তার তদন্তকারী দল এবং যুগ্ম কমিশন অথবা তার দলকে পূর্ণ সহায়তা ও সর্বপ্রকার রক্ষণ ব্যবস্থার দায়িত্ব নেবেন।

অনুচ্ছেদ ২৬ : যুগ্ম কমিশন বা তার দল এবং আন্তর্জাতিক কমিশন বা তার তদন্তকারী দলের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার উভয়পক্ষ সমভাবে বহন করবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভিয়েতনামে তদারকী ও নিয়ন্ত্রণের জন্যে গঠিত যুগ্ম কমিশন ও আন্তর্জাতিক কমিশন

অনুচ্ছেদ ২৮ : যুদ্ধ বর্জন চুক্তি সম্পাদনা করার জন্যে সংশ্লিষ্টদল দায়ী থাকবেন।

অনুচ্ছেদ ২৯ : একটা আন্তর্জাতিক কমিশন চুক্তি নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীর ভার নেবেন।

অনুচ্ছেদ ৩০ : কাজের সুবিধার জন্য একটা যুগ্ম কমশন গঠন করা হবে।

অনুচ্ছেদ ৩১ : যুগ্ম কমিশন উভয়পক্ষের প্রধানদের সমসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হবে।

অনুচ্ছেদ ৩২ : যুগ্ম কমিশনে প্রেরিত প্রতিনিধিবর্গের সভাপতিগণ 'জেনারেল'-এর মর্যাদা পাবেন।

অনুচ্ছেদ ৩৪ : যুদ্ধবিরতি চুক্তির শর্তগুলির প্রয়োগ সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীর জন্যে একটা আন্তর্জাতিক কমিশন গঠিত হবে। কানাডা, ভারতবর্ষ ও পোলান্ডের প্রতিনিধি নিয়ে এই কমিশন গঠিত হবে। ভারতীয় প্রতিনিধি এই আন্তর্জাতিক কমিশনের সভাপতির কাজ করবেন।

উপরোক্ত শর্তগুলি মাধ্যমে জেনিভা সম্মেলন ভিয়েতনামকে দুই ভাগে ভাগ করে ১৭ অক্ষ সমান্তরালে।

মুক্ত হয় ভিয়েতনামের উত্তরাংশ। কারণ, বিপ্লবী শক্তি গোটা দেশকে মুক্ত করার মতো শক্তিশালী ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দখল করে রাখে দক্ষিণ ভিয়েতনাম। অতএব জেনিভা সম্মেলন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ফরাসি ঔপনবেশিকতার মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে দেয়, যদিও একক রাষ্ট্ররূপে ভিয়েতনামের স্বাধীনতার আশ্বাস এবং যুদ্ধ-বিধবস্ত একটি রাষ্ট্রে সুদীর্ঘ শান্তির আশ্বাস ছাড়াই।

৭৭.১৩ সারাংশ

পৃথিবীর ইতিহাসে ভিয়েতনাম একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। হাজার হাজার বছর ধরে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে এই দেশ বিভিন্ন সময় চীন, জাপান, ফরাসি এবং শেষ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজের সার্বভৌমত্ব বজায় রেখেছে। ১৯৭৬ সালে জুলাই মাসে উত্তর ও দক্ষিণ-ভিয়েতনামের ঐক্যসাধন হওয়ার পূর্বে ভিয়েতনামের ইতিহাসকে মোটামুটি ছয়টি অধ্যায়ে ভাগ করা যায়— ভিয়েতনামবাসীদের নিজস্ব, রাষ্ট্র, হংবাং-এর রাজত্বকাল, চৈনিক অধিকার, মহান জাতীয় বংশ, ফরাসি শাসন ও সর্বশেষে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। ফরাসিদের ভিয়েতনামের উপর অধিকার স্থাপনের মূল কারণটা ছিল এশিয়া মহাদেশে শক্তি প্রসারের স্থায়ী ঘাঁটি গড়া।

ভিয়েতনামের প্রকৃত ইতিহাসের সূচনা ঘটে খ্রিস্টপূর্ব ২৫৮ সাল থেকে যখন রাজা থাক্ ফান্ (Thuc Phan), ভ্যান ল্যাঙ্গ (Van Lang) রাজ্য আক্রমণ করেন। এরপর বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য রাজবংশের মধ্যে ত্রিউ (Trieu) বংশ বিশেষভাবে উল্লেখিত ভিয়েতনামের ইতিহাসের পাতায়। এই বংশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যে শাসকেরা টনকিন (Tonkin) ও উত্তর আন্নাম (Ananm) অঞ্চলের অ-চৈনিক মানুষের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন না এবং ভিয়েত অঞ্চলগুকি সামন্তপতিদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও স্বায়ত্বশাসনের অনুমতি দিয়েছিলেন। এরপর উতির (Wuti) রাজত্বকালের সঙ্গে সঙ্গে ত্রুঙ্গ (Trung) ভগিনীদের [Trung Sisters A.D. 40-43—Lady Trien (A.D. 248), লি বন (A.D. 544-602)] মাই থাকলোনের (A.D. 722) ও অন্যান্যদের বিদ্রোহ খুবই বিখ্যাত। এই স্বাধীনতার লড়াই-এর সমাপ্তি ঘটে ৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে যখন ভিয়েতনামের মানুষ চৈনিক সাম্রাজ্যের শাসন থেকে মুক্তিলাভ করে।

গগো বংশের স্থায়িত্ব ছিল প্রায় ৩০ বৎসর (৯৩৬-৯৬৯)। এই জাতীয় বংশের মূল প্রবর্তক ছিলেন জেনারেল নেগো কোয়েন (Ngo Quyen)। এই রাজার মৃত্যুর পরে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। বিভিন্ন রাজবংশের রাজত্বে ভিয়েতনামবাসীদের রাজনৈতিক চেতনা ও স্বদেশী মানসিকতা আরো প্রাগাঢ় করে। অবশেষে ১৪১৮ খ্রিঃ চীন শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে নেগুয়ান ত্রাই (Nguyen Trai)-এর সাহায্যে লে লয় (Le Lai) নামে এক ব্যক্তি মিঙ্গ (Ming) শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং ১৪২৭ সালে চীন ফৌজের থেকে হ্যানয় পুনর্বারি দখল করে নেয়। এইভাবে ভিয়েতনাম লে বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের শাসন ১৪২৭ সালে চীন ফৌজের থেকে হ্যানয় পুনর্বারি দখল করে নেয়। এইভাবে ভিয়েতনামে লে বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের শাসন ১৪২৭ থেকে ১৮০২ খ্রিঃ পর্যন্ত ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে লে বংশে একটি সঙ্কট দেখা দেয় যখন গোটা দেশে দুটি গোষ্ঠীর উত্তরের ট্রিনহ (Triah) ও দক্ষিণের গুয়েন (Nguyen) মধ্য গৃহযুদ্ধের আগুনের স্ফুলিঙ্গ সমগ্র ভিয়েতনামে ছড়িয়ে পড়ে।

ফরাসি ক্রিশ্চান মিসনারীদের জন্যেই ভিয়েতনাম ও ইন্দোচায়নাতে ফরাসি উপনিবেশিকতার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ফরাসি উপনিবেশিক নীতি ইন্দোচায়নার সব সময় সমানভাবে প্রতিফলিত হয়নি এবং প্রতিটি গভর্নর জেনারেল ও তার অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে সময়ের সাথে সাথে বদল হত, যদিও প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্থাৎ অর্থনৈতিক শোষণের নীতি ছিল এই ফরাসি শাসকদের।

পল ডুমার (Paul Doummer)-এর ইন্দো-চায়নার জন্যে “initial development” অর্থাৎ প্রাথমিক উন্নতির নামে কিছু সংস্কার প্রণয়ন করে যেগুলি নিম্নলিখিত :

(ক) খুবই লঘু বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ;

(খ) যন্ত্রাদি ক্রয় ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন;

(গ) উপনিবেশিক কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসারতা।

এই সংস্কার পদ্ধতির প্রচেষ্টা কেবল ভিয়েতনামীদের দিয়েছিল আর্থিক অবনতি। ফরাসি শাসনের ভালো দিকগুলোর মধ্যে অন্যতম, ফরাসিরা স্কুল, হাসপাতাল, রেলপথ, সড়ক, কৃষি ও শিল্প ইত্যাদি জন্য প্রায় দুই বিলিয়ন ডলার মূলধন লাগিয়েছিল। কিন্তু এই ফরাসি উপনিবেশিকতার মূল ফসল হল ভিয়েতনামী জাতীয়তাবাদের উত্থান। যে সব তরুণ-প্রাণ দেশের কাজে সমর্পিত হয়েছিল তাদের মধ্যে হো চি মিনের নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য, যিনি স্থাপন করেন ভিয়েতনামী বিপ্লবী যুবগোষ্ঠী ১৯২৫ সালে। ১৯৩০-এ হংকং-এর কমিউনিস্ট সভায় হো চি মিন ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট দলগঠন করেন এবং দু মাস পরে তা বৃহত্তর আকারে ইন্দো-চানার কমিউনিস্ট দল হিসেবে পরিচিত লাভ করে। ১৯৩৯ সাল তেকে এই দলবহু ধর্মঘট, সভাসমিতি ও অবস্থান করে। কিন্তু ফরাসি সরকার এইসব প্রচেষ্টা চূর্ণ করেদেয় অতি সহজে। তাই হো চি মিনের নেতৃত্বে এই দল তাদের নীতি বদল করে। হো চি মিন সমগ্র জনসাধারণকে এবং ছোট ছোট রাজনৈতিক দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক বৃহত্তর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের ডাক দেন এবং জন্ম দেন স্বাধীন ভিয়েতনামের গণতান্ত্রিক মোর্চার।

এরপর সময়ের সাথে সাথে মেকং-এ অনেক জল প্রবাহিত হয়। ১৯৪১-এর ঐতিহাসিক পার্ল হারবারের ঘটনার পর জাপান তার অধিকার বিস্তার করে থাইল্যান্ড পর্যন্ত এবং শেষ পর্যন্ত ফরাসিদের হাত থেকে সমগ্র ইন্দোচীন (ইন্দোচায়না) কেড়ে নেয়। জাপানের এই অঞ্চলের অধিকারের পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল (এই অঞ্চলের) বহুবিধ প্রাকৃতিক সম্পদ। হো চি মিনের নেতৃত্বে তখন সমগ্র দেশে চলেছে এক অভূতপূর্ব গণজাগরণ।

১৯৪৫ থেকে ভিয়েতনামবাসীরা সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করে ও ক্ষমতাহীন জাতীয় জাপানী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত

করে, ১৯শে আগষ্ট হ্যানয়কে মুক্ত করে এবং শেষে সমগ্র উত্তর ভিয়েতনামকে। জাপানী সরকারকে ভিয়েতনামীরা নাম দিয়েছিল "মেকী সরকার" এবং তাই তারা ভিয়েতনামীদের কাছে কোনই স্বীকৃতি পায়নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে ভিয়েতনাম আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের হাতে চলে যায়। ইতিমধ্যে ১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে হো চি মিন-এর সরকার ষোড়শ অক্ষাংশের উত্তর দিকে স্বাধীনভাবে, স্বাভাবিক নিয়মে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

১৯৪৯ সালে ৮ই মার্চ তারিখে ফরাসি ইউনিয়ন-এর মধ্যে ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া ও লাওসকে যুক্ত করা হয় এবং এলিসি (Elysee) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফরাসি রাষ্ট্রপতি ও ভিয়েতনামী রাজা বাও দাই (Bio-Dai)-এর মধ্যে। যদিও আসল কর্তৃত্ব ফরাসিদের হাতেই ছিল।

১৯৫১-১৯৫৩-র মধ্যে ভিয়েতনামী প্রজাতন্ত্রের গেরিলা বাহিনী জেনারেল গিয়াপের অধীনে সমস্ত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে সংগ্রামের সীমারেখা দ্রুতগতিতে বাড়াতে থাকে। ফরাসি সরকারেরও রক্তক্ষয়ী লড়াই হো চি মিন সরকারের বিরুদ্ধে দ্রুত স্ফুলিঙ্গের মত ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ইন্দোচীন যুক্তরাষ্টে।

১৯৫৪ সালে ঐতিহাসিক দিয়েন বিয়েন ফু-র যুদ্ধেরপর, দিয়েন বিয়েন ফু-র পতন যখন আসন্ন তখন জেনিভাতে ইন্দোচীন-এর স্বাধীনতার জন্য শান্তির আলোচনার সূত্রপাত হয়। জেনিভা সম্মেলনের পর এই প্রথম ইন্দোচীন যুদ্ধের অবসান হয় এবং ১৭ অক্ষ সমান্তরাল ভিয়েতনামকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এই অস্থায়ী ভাগ কেবল দু বৎসরের জন্য ছিল, যার পরে নির্বাচনের মাধ্যমে দুইভাগকে আবার জোড়া লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই চুক্তির ফসল কোন পক্ষই শেষ পর্যন্ত পালন করতে সক্ষম হয়নি। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিঃশব্দে প্রবেশ এই অঞ্চলের আবহাওয়াকে আরো বেশি দূষিত করে তোলে।

১৯৪৯ সালের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম নীতি ছিল যদি ভিয়েতনাম কমিউনিস্টদের কাছে নতিস্বীকার করে, তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। জেনভা সম্মেলন চলাকালীন ১৯৫৪ সালে ১৬ই জুন ফরাসি সরকার ভিয়েতনামের রাজা বাও দাই-এর সাথে যৌথভাবে ঘোষণা করে নগো দিন দিয়েমের নাম দক্ষিণ ভিয়েতনামের নতুন প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য। এই নগো সম্প্রদায়ের ক্যাথলিক হওয়ার দরুন, ক্যাথলিক বিরোধী প্যাগন জনতার আক্রমণ সহ্য করতে হয়। দিয়েম ও অন্যান্য কয়েকটি পরিবার বেঁচে যায়। এই দিয়েম ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাপানীদের ও ফরাসিদের তোষামোদ করে। ১৯৫৫ সালে প্রায় ৯৯% ভোটে বাও দাইকে হারিয়ে দিয়েম ভিয়েতনাম রিপাবলিকের রাষ্ট্রপতি হন। ১৯৫৬ সালে তিনি ঘোষণা করেন ন্যাশনাল এসেম্বলীর নির্বাচন ও সেখান থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনামে এক নতুন সংবিধান তৈরি করার। এই ঘোষণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ৩৫টি দেশের সমর্থন পায়। দিয়েমের শাসনকালে মানুষ অত্যাচারে জর্জরিত ছিল। বিশেষ করে দক্ষিণ ভিয়েতনামে দেখা যায় অরাজকতা।

১৯৬০ সালে অসন্তোষের দরুণ জন্ম হয় ভিয়েতনাম ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট-এর দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাষ্ট্রনায়ক দিয়েমের একনায়কত্ব ও মার্কিনদের সহৃদয় ও পূর্ণ সমর্থন ও সাহায্য গোটা দেশে অতি দ্রুত আনে চরম দুর্দিন। হাজার হাজার দেশপ্রেমী, বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাংবাদিক ও প্রাক্তন প্রতিরোধ যোদ্ধাদের জেলে প্রেরণ ইত্যাদি মিলিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে দাবানলের আগুন। যেদক্ষিণ ভিয়েতনামে বৌদ্ধ সাধকেরা

কোনদিনও মার্ক্সীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন না, তারাও সামাজিক পরিস্থিতির অবক্ষয়ের দরুন মার্ক্সীয় চিন্তায় নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ হন।

অবশেষে ১৯৬৩ সালে ১লা নভেম্বর জেনারেল দং ভ্যান মিনের নেতৃত্বে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচ্ছন্ন মদতে, সায়গন শহরে এক সামরিক অভ্যুত্থান হয় দিয়েমের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে। এই সামরিক অভ্যুত্থানে দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি দিয়েম ও তার ভাই ন্যু (Nhu)-কে হত্যা করা হয় এবং শেষে অবসান হয় দীর্ঘ নয় বছরে নগো পরিবারের তীব্র ও ভয়াবহভাবে পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার।

এরপর ৭ই নভেম্বর, ১৯৬৩ সালে, দক্ষিণ ভিয়েতনামে জেনারেল দংভ্যান মিনের নেতৃত্বে এক অস্থায়ী সরকার স্থাপিত হয়। মার্কিনীরা এই সরকারের স্বীকৃতি দেয় অতি দ্রুত। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে, যে এই সরকারই একমাত্র ভিয়েতনামের কমিউনিস্টদের ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে।

৭৭.১৪ অনুশীলনী

ক। নির্দেশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন।

১। ভিয়েতনামের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

২। ভিয়েতনামের মাটিতে ফরাসি শক্তির প্রবেশের আগে ভিয়েতনামের ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। ভিয়েতনামের গৃহযুদ্ধের পরিবেশ ও ফরাসি শক্তির প্রবেশ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

৪। ভিয়েতনামে ফরাসি শাসনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৫। ফরাসি ঔপনিবেশিকতা ফলাফল সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন। আপনি কী মনে করেন যে ফরাসি অপশাসনের ফলেই ভিয়েতনামী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়?

৬। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভিয়েতনামে জাপানী শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

৭। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফরাসি শাসনব্যবস্থার পুনঃপ্রচেষ্টা ভিয়েতনামের মাটিতে ও তার ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৮। হো চি মিনের সংগ্রাম ফরাসি ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে যাহা জানেন লিখুন।

৯। দিয়েন বিয়েন ফু যুদ্ধ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

খ। সংক্ষেপে উত্তর লিখুন :

(১) নগো বংশ (২) লে বংশ (৩) পিনোহ দ্য বোহোন (৪) ফরাসি ক্রিশ্চান মিশনারী (৫) সম্রাট ডিয়োলঙ (৬) ১৮৬২ সালের চুক্তি (৭) পল ডুমার (Paul Doumer) (৮) ফরাসি শাসনের বৈশিষ্ট্য (৯) ইন্দোচায়না কমিউনিস্ট পার্টি (১০) হো চি মিন (১১) ভিয়েত মিন (১২) বাও দাই (১৩) হো চি মিনের ঘোষণাপত্র (১৪) প্রথম ইন্দোচীনের যুদ্ধ (১৫) দিয়েন বিয়েন ফু যুদ্ধ।

৭৭.১৫ গ্রন্থপঞ্জী

১। Bernerd B. Fell, The Viet Minh Regime : Government and Administration in the Democratic Republic of Vietnam, Paraeger 1956.

২। The Two Vietnams : A Political history. Paraeger, New York, 1963.

৩। J. L. Mehta, A political and Cultural History of Vietnam upto 1954. Venus Publishing House. New Delhi. 1970.

৪। Nguyen Khac Vien, Contemporary Vietnam, 1858-1980. Foreign Language publishing House, Hanoi, 1981.

৫। R. S. Chavan, Vietnem : Trial and Triumph, Patriot Publisher, New Delhi, 1987.

৬। D.G.E. Hall, A Historyr of Southeast Asia, macmillan, London, 1955.

৭। ধ্রুব গুপ্ত, ভিয়েতনাম ঃ গ্রীক ঔপনিবেশিক জাতীয়তাদ ও তে-সন বিপ্লব (১৭২২-১৮০২ খ্রিঃ), ইতিহাস অনুসন্ধান—১২, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃঃ ৭৫১-৭৬০।

একক ৭৮ ❑ দ্বিতীয় ইন্দোচীনের যুদ্ধঃ মূল উৎসগুলি

গঠন

৭৮.০ উদ্দেশ্য
৭৮.১ প্রস্তাবনা
৭৮.২ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবেশ
৭৮.৩ দুই ভিয়েতনামের আভ্যন্তরীণ অবস্থা
৭৮.৪ দিয়েনের শাসনের বিরোধিতা
৭৮.৫ ভিয়েতনামের মাটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামরিক অধিগ্রহণ
৭৮.৬ গালফ্ অব্ টনকিনের ঘটনা
৭৮.৭ ভিয়েত কং-এর টেট আক্রমণ
৭৮.৮ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী, ভিয়েতনামে যুদ্ধ শেষ করার শর্তাবলী
৭৮.৯ ভিয়েতনামে যুদ্ধের আপস মীমাংসার আলোচনা ও শান্তি প্রচেষ্টার বাতাবরণ
৭৮.১০ নিকস্‌ন তত্ত্ব/উপদেশাবলী
৭৮.১১ হো চি মিনের প্রস্তাব
৭৮.১২ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আট দফা প্রস্তাব
৭৮.১৩ প্যারিস চুক্তি
    ৭৮.১৩.১ প্যারিস চুক্তি অবমাননা
৭৮.১৪ ভিয়েতনাম জনগণের ১৯৭৫ সালের মহাবিজয়
৭৮.১৫ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম যুদ্ধ ব্যর্থতার ইতিহাস
৭৮.১৬ ভিয়েতনামের আবির্ভাব নবরূপে
৭৮.১৭ সারাংশ
৭৮.১৮ অনুশীলনী
৭৮.১৯ গ্রন্থপঞ্জী

৭৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককের প্রধান উদ্দেশ্য হ'লো ফরাসী শাসনের পর ভিয়েতনামের সম্পর্ক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা অনুধাবন করা। ভিয়েতনামের যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান এবং ব্যর্থতারও ইতিহাস জানতে পারবেন। পরিশেষে ভিয়েতনামে শান্তি স্থাপন ও ভিয়েতনামের নবরূপে আবির্ভাব এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অবসান সম্পর্কেও জানতে পারবেন।

৭৮.১ প্রস্তাবনা

জেনিভা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার প্রথম ইন্দোচীনের যুদ্ধের অবসান হয় এবং ১৭ অক্ষ সমান্তরালে ভিয়েতনামকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এই ভাগাভাগি ছিল অস্থায়ী মাত্র ২ বছরের জন্য, এর পর নির্বাচন আয়োজিত হয় এবং যার দরুন উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামকে আবার জোড়া লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়। জেনিভা চুক্তির অন্তর্গত এই ব্যবস্থাগুলি ওপর নজরদারি করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয় আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন (International Control Commission)-এর উপর ভারতীয় সভাপতির তত্ত্বাবধানে। এই কমিশনের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল দক্ষিণ ও উত্তর ভিয়েতনামের সরকারেরা কতখানি সহযোগিতা করতে পারে তার ওপর। এই কমিশনে ব্রিটেন ও সোভিয়েট রাশিয়া ছিল সহ-সভাপতি হিসাবে যে বা যারা এই আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে সময় সময় বিস্তারিত খবর পাঠাত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের নতুন সরকার এই চুক্তি স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করে। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কথা দিয়েছিল যে সে কোনভাবেই এই চুক্তির রূপায়ণে অন্তরায় হবে না, উপরন্তু তারা চেষ্টা করবে সমগ্র ভিয়েতনামে প্রকৃত গণতন্ত্র যাতে ফিরে আসে যুক্তরাষ্ট্রের (United Nations) পরিচালনায় একটি মুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই উক্তি যথেষ্ট সন্দেহজনক মনে হয় এবং সেটা পুরোপুরি প্রকাশ পায় তার পরের দুই দশকের আচার-আচরণ ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে। জেনিভা সমঝোতা যাতে কার্যকর না হয়, তার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টা করে যেতে থাকে। সম্মেলনের সমাপ্তির পর ডালেস বলেন, অতীতের দশক নয়, ভিয়েতনামে আমরা যা হারিয়েছি তা যাতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে কমিউনিজমকে সম্প্রসারিত না করে তার জন্য ভবিষ্যৎ সুযোগের সদ্ব্যবহার করাই অত্যন্ত জরুরি। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনামকে বিশেষ করে নট নগো দিন দিয়েম সরকারকে যিনি গণতন্ত্রের নামে ব্যাপক কারচুপি করে দক্ষিণ ভিয়েতনামকে একটি রিপাবলিক হিসাবে ঘোষণা করে নিজেকে প্রেসিডেন্ট বলে ঘোষণা করলেন বাও দাইকে নির্বাচনে হারিয়ে, স্বাধীনভাবে ১৭ অক্ষ সমান্তরাল অন্তর্জাতিক সীমারেখার পরিবর্তন করতে উৎসাহ দেয়। ফলে সায়গন, আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সহযোগিতায় ১৯৫৬ সালের নির্বাচন মোটেই হতে দিতে চায় না এবং এর দরুন এই নির্বাচন ভবিষ্যতেও কোনদিনও হয়নি।

৭৮.২ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবেশ

১৯৪৯ সালের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম নীতি যে ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহল যদি ভিয়েতনাম কমিউনিস্টদের কাছে নতি স্বীকার করে, তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তবে ১৯৪০-এর দশকে ভিয়েতনাম আমেরিকার কাছে খুব একটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেশ ছিল না। ১৯৪৯ সালে চীনের পতন ও কমউনিস্ট চীনের উত্থান ও ওয়াশিংটনের বিদেশ নীতির রদবদল, তার সাথে ঠাণ্ডাযুদ্ধ এবং [(National Security Council Study (NSC-68)] এর বিশ্বমত ভিয়েতনামের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছিল। কমিউনিস্ট চীনের উত্থান, সোভিয়েট ইউনিয়নের আণবিক বোমা বিস্ফোরণ ও তার পূর্ব ইউরোপে রাজনৈতিক প্রভাব, মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের নীতিকারদের মধ্যে ভীষণ প্রভাব ফেলেছিল। তাই আমেরিকার নীতিকাররা তখন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে সোভিয়েটের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক প্রভাব আর কোনমতেই বৃদ্ধি পেতে দেওয়া যাবে না। ক্রেমলিনের অধীনে আর ক্ষমতা বৃদ্ধি হলে NSC-68 এর মতে আর কোন জোটই পাওয়া যাবে না যা ক্রেমলিনকে পর্যদুস্ত করতে পারবে। দ্বিধাবিভক্ত বিশ্ব দুটো বিপরীত মেরুতে অবস্থিত হওয়ার দরুন, সাম্য বজায় রাখা খুবই কঠিন এবং বিশ্বরাজনীতি হল "a zero sum game" যাতে সোভিয়েট ইউনিয়নের জয় মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয়। এর ফলে নানা গুরুত্বহীন দেশ যেমন ভিয়েতনাম, হঠাৎ করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কোরিয়া যুদ্ধের পর মার্কিন নীতিকারদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে রাশিয়া শক্তিসাম্যকে বিনষ্ট করার জন্য প্রয়োজনে সামরিক শক্তি প্রয়োগেও পিছিয়ে থাকবে না। এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দ্বন্দ্বযুদ্ধের দরুন ১৯৫০ সালে মার্কি রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান তার "Containment" নীতির প্রসার ইউরোপ থেকে বাড়িয়ে এশিয়াতে বিস্তৃত করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম নীতির গুরুত্ব লাভের পশ্চাতে আরো কতকগুলো নির্দিষ্ট কারণ রয়েছে যেমন "Domino" নীতি। এই নীতির মতে ভিয়েতনামের পতনের ফলে ইন্দোচীনের পতন হতে পারে এবং এইভাবে পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পতন বা ধ্বংস হতে পারে এবং পশ্চিমে এই ধ্বংসের পরবর্তী প্রভাব ভারত ও পূর্ব জাপান ও ফিলিপিন্সের ওপর পড়বে। এই ধারণা মার্কিন Joint Chiefs of Staff ১৯৫০ সালে পোষণ করেছিলেন এবং ১৯৪০-এর শেষের দিকে ও ১৯৫০ এর প্রথম দিকের ঘটনাসমুহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই বদ্ধমূল ধারণা আরো দৃঢ় করতে সাহায্য করে। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির প্রস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে যে শূন্যস্থানের সৃষ্টি করে, ঠিক সেই সময় মাও সে তুং-এর কমিউনিস্ট দলের চীনের দখল ও ইন্দোচীন বার্মা ও মালয়েশিয়াতে ঔপনিবেশিক বিপ্লব যথেষ্ট ভীতির সৃষ্টি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিবিদদের মনে। তাই ভিয়েতনামের চীনের দক্ষিণে অবস্থিত থাকার দরুন এই দেশের গুরুত্ব রাতারাতি বৃদ্ধি পায়, যা সেনেটর জন কেনেডির মতে "the keystone is the arch" ও "the finger is the dike" যদি ভিয়েতনামে পতন হয় তাহলে আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কাঁচামালের যোগান ও সামরিক গুরুত্ব বিনষ্ট হবে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বিশেষ কারণের জন্য প্রথমে ফরাসিকে প্রায় ৮০ শতাংশ সামরিক ও অন্যান্য সাহায্য করে ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট বিপ্লব রোধ করার জন্য। কিন্তু দিয়েন বিয়েন ফুতে ফ্রান্সের পরাজয়ের পর, নিজেরা সরাসরি যুক্ত হয়ে যায় এই লড়াইয়ের ময়দানে, দক্ষিণ ভিয়েতনামের নিরঙ্কুশ একনায়ক দিয়েম সরকারকে স্বীকৃতি, সমর্থন ও সাহায্য দিয়ে ও ম্যানিলা চুক্তি বা সিয়াটো (South-East Asia Treaty Organization) নামক এক সামরিক ব্লক গঠনের মধ্যে দিয়েই। প্রকৃতপক্ষে এই সিয়াটো গঠনের মধ্যে দিয়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জেনিভা সম্মেলনের চুক্তি ভাঙ্গা শুরু করে। মিঃ ইডেন তাঁর স্মৃতিকথায় স্বীকার করেছেন—"জেনিভা সম্মেলন যখন চলছিল, তখন অনির্দিষ্টকালের জন্যে ভিয়েতনামকে বিভক্ত রাখার এক গোপন চুক্তি আমেরিকা ও ব্রিটেন নেপথ্যে সেরে ফেলেছিলেন।" আইজেনহাওয়ার তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন— "ইন্দোচীনের বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এমন যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে ও চিঠিপত্র লিখে বুঝেছি, সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে শতকরা আশি জন লোক হো চি মিন—এর পক্ষেই ভোট দেবে।" তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই জেনিভা সম্মেলনে চুক্তিতে সই করেনি ও আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কোন নির্দেশই কখনও মেনে চলেনি।

৭৮.৩ দুই ভিয়েতনামের অভ্যন্তরীণ অবস্থা

জেনিভা সম্মেলন চলাকালীন, ১৬ জন ১৯৫৪ সালে ফরাসি সরকার রাজা বাও দাই সাথে ঘোষণা কর, নগো দিন দিয়েমের নাম নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দক্ষিণ ভিয়েতনামে। ভিয়েতনামের নগো সম্প্রদায় এক ঐতিহ্যপূর্ণ বিশেষ শ্রেণী। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই সম্প্রদায় ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করে। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে ক্যাথলিক বিরোধী প্যাগান জনতা এই নগো সম্প্রদায়ের ওপর ভয়াবহ আক্রমণ চালায়। অল্প কয়েকটি পরিবার এই নৃশংস আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। দিয়েম পরিবার অক্ষত ছিলো। দিয়েম হলেন একজন সম্মানপূর্ব ক্যাথিলিক কিন্তু কনফুসিয়ান ধর্মে বিশ্বাসী পরিবার থেকে আসা একজন ব্যক্তি। তার পরিবার ম্যান্ডারিনদের প্রতিনিধিত্ব করে এসেছে। দিয়েমের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ কোন সুশৃঙ্খল নিয়ম মেনে চলত না। ফরাসিদের কাছে তিনি ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহী বিপ্লবী। তাঁর নিজস্ব ক্যাথলিক মার্কা গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ হয়ত নিজের কাজেই খুব একটা পরিষ্কার ছিল না। কমিউনিজমের প্রতিপ্রবল বিতৃষ্ণা ও প্রবলতর হো চি মিন বিরোধিতা তাঁকে অতি উচ্চবর্ণের ডেমোক্রাট হিসাবে চিহ্নিত করে। তিনি জাপানীদের সঙ্গে মিতালী করে ক্ষমতা দখল করবার চেষ্টা করেছেন। আবার ফরাসিদের কৃপাভাজনও হয়েছেন।। ২৩ অক্টোবর ১৯৫৫ সালে ৯৯ শতাংশ ভোট পেয়ে তিনি বাও দাইকে হারিয়ে ভিয়েতনাম রিপাবলিকের রাষ্ট্রপতি হন। তারপর তিনি ঘোষণা করেন ৪ঠা মার্চ ১৯৫৬ সালে ন্যাশনাল এসেম্বলীর নির্বাচন ও সেখান থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনামে এক নতুন সংবিধান তৈরি করার কথা। দিয়েমের এই ঘোষণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ৩৫টি দেশ সমর্থন জানায়। ফলে ভিয়েতনামের রাজনৈতিক পটভূমিতে এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দিয়েমের নিরঙ্কুশ একনায়কত্ব ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাৎপর্যপূর্ণ সমর্থন ও সাহায্য দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজনীতিকে অতি দ্রুত এক সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিস্ট চক্রের দিকে নিয়ে যায়। কার্যভার হাতে নিয়ে দিয়েম আবিষ্কার করেন, তাঁর শক্তি আছে—পর্যাপ্ত ক্ষমতা নেই। জোর আছে—জৌলুস নেই। তিনি অদ্বিতীয়—তবু একমাত্র নন। প্রধান হয়েও শ্রেষ্ঠ নন। ফলে তিনি ক্ষমতালোভের রোগে আক্রান্ত হলেন, এবং কিছুদিনের মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে সর্বশক্তিমান হয়ে উঠলেন। পরিপূর্ণ রাষ্ট্রকর্তৃত্ব দিয়েমকে ধীরে ধীরে ভয়াবহ একনায়কত্বের দিকে ঠেলে দেয়। তিনি পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে শুরু করেন চরম সন্ত্রাস। তিনি আইন করলেন যে দেশের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনবোধ সমস্ত নাগরিক অধিকার হরণ করতে পারবেন। অপর্যাপ্ত আমেরিকান ডলার দিয়েমের গণতন্ত্রকে বীভৎস এক রক্তাক্ত পথে ভাসিয়ে নিয়ে চলে। বিকারগ্রস্ত এক উন্মাদ যেন রক্তস্নানের নেশায় দিশেহারা। পীড়ন ও অত্যাচার এমন জায়গায় পৌঁছায় যেন প্রতিরোধ সংগ্রামীদের সঙ্গে কোনরকম যোগসূত্র খুঁজে পেলে তার আর মুক্তি নেই। ফলে হাজার হাজার মানুষের নির্বিচারে হত্যা ও নিষ্ঠুর নিপীড়ন চলতে থাকে এবং গোটা দেশে আসে চরম দুর্দিন। চাষীদের হাত থেকে জমিদারদের হাতে আবার জমি ফিরে আসে। জলসেচ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মার্কিন পণ্যের চাপে দেশী ও কুটীর শিল্পে ধংসোন্মুক্ত হয়। কলকারখানা একটার পর একটা বন্ধ হয়ে যায়। যুবকদের সামনে একমাত্র ভবিষ্যৎ হয় নিষ্ঠুর সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ বা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। তাই চূড়ান্ত অরাজকতা সৃষ্টি হয় সারা দক্ষিণ ভিয়েতনাম জুড়ে।

দিয়ামের অপশাসন ও অত্যাচার জনসাধারণের মনে ক্রমশ অসন্তোষ বাড়াতে থাকে এবং সে অসন্তোষ শেষে রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবে দেখা দেয়। ক্ষুধার্ত কৃষক, বেকার, শ্রমিক, প্রতারিত বুদ্ধিজীবী ও নিগৃহীত ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের সভা ও মিছিল গ্রাম থেকে শহরের দিকে বিস্তার লাভ করে। দাবি ওঠে সাধারণ নির্বাচন চাই, ভিয়েতনামের দুই অংশের শান্তিপূর্ণ পুনর্মিলন হোক, দমননীতি প্রত্যাহার কর এবং মার্কিন ফৌজ হঠাও। ফলে এই অসন্তোষের দরুন ১৯৬০ সালে জন্ম হয় দক্ষিণ ভিয়েতনামে ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (National Liberation Front/NLF)। মুক্তি সংগ্রামের ডাকে সমগ্র দেশের মানুষ এগিয়ে আসে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহয়োগিতায়। ফ্রন্টে যোগ দেয় আগের যুগের গেরিলা যোদ্ধারা, র‍্যাডিকাল সোসালিষ্ট পার্টি, এসোসিয়েশন ফর মেন্টেন্যান্স অফ মরাল প্রিন্সিপল্‌স্, হোয়া হাও ও বৌদ্ধধর্মীয় সংস্থা। এই ফ্রন্টের মূল কর্মসূচী হল নিম্নরূপ ঃ

এক ।। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গুপ্ত ঔপনিবেশিক রাজত্বের ও আমেরিকান দাস নগো দিন দিয়ামের একনায়কত্বের অবসান ঘটিয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করা।

দুই।। উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করা।

তিন ।। স্বাধীন ও সার্বভৌম অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।

চার ।। ভূমিরাজস্ব কমানো, চাষীর হাতে জমি বিলির জন্য কৃষি সংস্কার।

পাঁচ ।। জাতীয় ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার পত্তন।

ছয় ।। মাতৃভূমি ও জনসাধারণের প্রতিরক্ষায় একজাতীয় সৈন্যবাহিনী গঠন, মার্কিন সামরিক উপদেষ্টা ব্যবস্থার বিলোপ। যে সমস্ত সৈন্য আমেরিকান ও দিয়ামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে তাদের পুরস্কার প্রদান করা। আমেরিকান ও দিয়েমের প্রাক্তন ও অনুচরেরা যারা তাদের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত ও জনসাধারণের সেবা করতে প্রস্তুত তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে হবে।

সাত ।। ভিয়েতনামের মাটি থেকে সমস্ত বিদেশী সামরিক ঘাঁটির বিলোপ-সাধন।

লিবারেশন ফ্রন্টের এই জাতীয় কর্মসূচীতে কোথাও কমিউনিজম-এ নামগন্ধ ছিল না। উত্তর ভিয়েতনাম সরকারের প্রতি কোথাও এতটুকু দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায় না এবং রুশ চীন সমাজতান্ত্রিক দেশের আদর্শবাদের ইঙ্গিতও নেই কোথাও। এই ফ্রন্টের মূল উদ্দেশ্য কমিউনিজম না হয়ে ন্যাশানালিজম বা জাতীয়তাবাদ, যারা সায়গন সরকার থেকে মুক্তি পেতে চায় এবং এমন একটা সরকার গঠনের চিন্তা তারা করেছিল যেখানে বিদেশীদের কোন নিজস্ব মতামত তাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারবে না। তারা গঠন করলো আরও দুটি সংগঠন—(১) পিপলস্ রেভ্যুলুশনারী পার্টি (People's Revolutionary Party) এবং (২) লিবারেশন আর্মি (Liberation Army)। তাছাড়া জাতীয় লিবারেশন ফ্রন্টের আরেকটি উদ্দেশ্য হল দুই ভিয়েতনামকে একসাথে করানো এবং তা অবশ্যই উত্তর ভিয়েতনামের কর্তৃত্বের উপর নয়। তাই পরিশেষে এই কথা বলা যায় যে রাষ্ট্রপতি দিয়েমের অপশাসনের দরুনই জন্ম নেয় জাতীয় লিবারেশন ফ্রন্ট, ভিয়েতনামের ইতিহাসের পাতায়।

ফরাসি শাসনের অবসানের পর ভিয়েতনামের আরেক অংশে অর্থাৎ উত্তর ভিয়েতনামের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ছিল ভিন্ন ধরনের। দিয়েন বিয়েন ফু যুদ্ধে শক্তি পরাজয় হওয়ার পর, ১৯৫৪ সালে হ্যানয়ে সুবিশাল জনসমুদ্রের সামনে রাষ্ট্রপতি হো চি মিন আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তর ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি একদিকে মার্কসবাদীয় চিন্তাধারায় যেমন দেশের সার্বিক উন্নতির চেষ্টা করেন তেমনি দশবিভাগ নয় বরং সংযুক্তির পক্ষে কঠোর সংগ্রামের পথই গ্রহণ করেন। ফলে শুরু হয় এক বিরামহীন আত্মত্যাগের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। তার সাধারণ জীবনযাত্রার মান ভিয়েতনামবাসীদের মনে অগাধ বিশ্বাসের জন্ম দেয়। উত্তর ভিয়েতনাম অর্থাৎ ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক কমিউনিস্টদের রক্ষণাবেক্ষণে কিছু ভূমি-সংস্কারের প্রতিজ্ঞা করেছিল লাল নদীর ব-দ্বীপে সেখানে চাষ-আবাদের মান ছিল খুবই উন্নত ধরনের। কিন্তু ঠিকমতো দেখাশুনা না হওয়ার দরুন ফরাসি শাসনের সময় চাষ-আবাদের অবস্থা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। ঠিক এই সময় খরায় আক্রান্ত ভিয়েতনাম ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত কয়লা খনিগুলির অপসারণ ফরাসিদের দ্বারা, উত্তর ভিয়েতনামের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটায়। ফলে রপ্তানি ও বিদেশী মুদ্রার টান পড়ে। এর দরুণ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ভিয়েতনাম তাড়াতাড়ি সোশালিষ্ট ধারা বেছে নেয় দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য যা সোভিয়েট নকসা অনুকরণের ধারায় তৈরি। এই অর্থনৈতিক অবনতির দরুন প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ, বেশির ভাগ ক্যাথলিক সহধর্মী, দক্ষিণ ভিয়েতনামে আশ্রয় নেয়। উত্তর ভিয়েতনাম অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য যে যৌথ ভূমিসম্বন্ধীয় কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করে সোভিয়েট নকশা অনুকরণে তার মুল বিষয় ছিল যে সমাজ ও রাষ্ট্র সরাসরি সাম্যবাদের স্তরে পৌঁছে যাবে পুঁজিবাদী পরিবৃত্তিকালকে উপেক্ষা করে। এই অর্থনৈতিক ও ভূমি সংস্কার পদ্ধতি গ্রহণ করা সত্বেও উত্তর ভিয়েতনামের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি যতটা পরিবর্তন হওয়ার প্রয়োজন ছিল, ঠিক সেই পরিমাণে হয়নি। অবশ্য এই জন্য উত্তর ভিয়েতনামের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বহুলাংশে দায়ী ছিল।

৭৮.৪ দিয়েমের শাসনের বিরোধিতা

দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাষ্ট্রনায়ক দিয়েমের নিরঙ্কুশ একনায়কত্ব ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহৃদয় ও পূর্ণ সমর্থন ও সাহায্য গোটা দেশে অতি দ্রুত আনে চরম দুর্দিন। তার রাজত্বকালে হাজার হাজার দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাংবাদিক ও প্রাক্তন প্রতিরোধ যোদ্ধাদের জেলে প্রেরণ, অত্যাচার ও শেষে হত্যা সৃষ্টি করে এক চরম অরাজকতা। কিন্তু এর মধ্যে ১৯৬৩ সালের বৌদ্ধদের সমস্যা এই সরকারকে আরো অপ্রিয় করে তোলে দেশের মধ্যে ও বাইরে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের বৌদ্ধ পুরোহিত ও সন্ন্যাসীরা কখনই মার্কসীয় চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু সামাজিক পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যাওয়ার জন্যই তারা ধীরে ধীরে সমস্ত জনসাধারণের মধ্যে বিচরণ করতে লাগলেন। সাধারণত ভিয়েতনামীরা ধর্ম ও রাজনীতিকে কোনদিনই আলাদা করে দেখেনি। তাদের ধর্ম ছিল কনফিউশিয়াস, টাওবাদ (Taoism), বৌদ্ধবাদ ও সর্বপ্রাণবাদের (animism) সমন্বয়। ভিয়েতনামীদের এক অদ্ভুত চারিত্রিক রূপ ছিল যে তারা যখন সুখে-শান্তিতে থাকে, তখন কনফিউশিয়ান ধর্ম নিয়ে থাকে এবং যখন অশান্তিতে বিচরণ করে তখন বৌদ্ধধর্ম নিয়ে বিচরণ করে। ফরাসি রাজত্বকালে বৌদ্ধর বেশিরভাগ সময়েই অরাজনৈতিক ছিল এবং এই

সরকার তাদের স্বাধীনভাবে ধর্মপালনের সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু দিয়াম ক্ষমতায় আসার পর ও নিজে ক্যাথলিকবাদের বিশ্বাসীর দরুন যে সমস্ত ধর্মীয় আচরণ তিনি শুরু করেনদক্ষিণ ভিয়েতনামে, তা বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে এক ত্রাসের সৃষ্টি করে। এর দরুন আমরা দেখতে পাই যে ১৯৬৩ সালে সংযুক্ত বৌদ্ধ চার্চ স্থাপিত হয় দক্ষিণ ভিয়েতনামে। ইতিমধ্যে বৌদ্ধরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে দিয়েম সরকারের কাছে ৭ই মে ১৯৬৩ সালে ধর্মমন্দিরে বৌদ্ধ উৎসবের জন্য অনুমতি চায়। কিন্তু দিয়েম সরকার এই আবেদনে শেষ পর্যন্ত সায় দেয়নি কারণ ৭ই মে ছিল দিয়েন বিয়েন ফুতে কমিউনিস্টদের হাতে ফরাসিদের পরাজিত হবার দিন। তাই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন বড় রকমের জমায়েত—যতই সে ধর্মসভা হোক শেষ পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বৌদ্ধ উৎসবে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু ৭ই মে-র উৎসব নিষিদ্ধ করায় দশ হাজারের বেশি এক বিরাট জনতা গভর্ণরের বাসভবনের সামনে জমা হয়ে দাবি জানায়—উৎসবের অনুমতি চাই। ব্যাপারটা আয়ত্তের বাইরে যাবার আগেই চতুর গভর্ণর ডেলিগেশনকে জানালেন—একজন পুরোহিত রেডিও মারফৎ 'সারমন' প্রচার করতে পারেন, কিন্তু বাইরে কোন মিছিল চলবে না। এর পর বৌদ্ধ নেতাদের সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য পরদিন ২০০০০ হাজারের এক বৌদ্ধ জনতা টু ডাম প্যাগোডায় সমবেতহয়, গভর্ণর হুয়ের বৌদ্ধ এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি একশো জন লোক নিয়ে রেডিও স্টেশনে বক্তৃতা দিতে যান। কিন্তু রেডিও স্টেশনে তাদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। তখন টু ডাম প্যাগোডায় সমবেত জনতা রেডিও স্টেশনের দিকে মিছিল নিয়ে যায়। ফলে প্রচণ্ড অসন্তোষ ও চঞ্চলতা তৈরি হয় ঐ অঞ্চলে! কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এক পুরো জনতাকে ঘিরে ধরে দিয়েমের পুলিশ ও সেনাবাহিনী। বৌদ্ধ জনতার ওপর চলে অতর্কিত গ্যাস, গ্রেনেড ও গুলি। ফলে ৯ জনের মৃত্যু ও আহত অনেক। দিয়েমের বৌদ্ধধর্মের প্রতি এই আচরণ ও অত্যাচারের প্রতিবাদে বৃদ্ধ বৌদ্ধ পুরোহিত থিচ কোয়াং দিউ পেট্রোল ঢেলে আত্মহত্যা করেন। রাষ্ট্রপতি দিয়েমের মতে বৌদ্ধদের এই অভ্যুত্থান আসলে কমউনিস্ট কার্যকলাপের ভিন্ন এক রূপ। এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে সারা দক্ষিণ ভিয়েতনামে জ্বলে ওঠে প্রতিবাদের ঢেউ। ধর্মঘট সাধারণ জীবনযাত্রা বানচাল করে দেয়। আমেরিকার বিরুদ্ধে ছাত্র বিক্ষোভ প্রচণ্ডভাবে দেখা যায়, অসংখ্য লোক গ্রেপ্তার হয়। অশান্ত আচরণ করতে আরম্ভ করে সেনাবাহিনী। জেলের অত্যাচারে হাত থেকে সেনাবাহিনীর পরিবারের অনেকেই নিষ্কৃতি পায় না। ফলে জেলের মধ্যে প্রাণ হারাতে হয় অনেক নিরীহ মানুষকে। বৌদ্ধদের ওপর এই অত্যাচারের প্রধান নায়ক ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তন্ হ্যাট দিন্। যিনি ছিলেন দিয়েমের অতিশয় প্রিয়। বৌদ্ধ মন্দির ও বৌদ্ধ নিধন অল্প সময়ের মধ্যে দিয়েম সরকারকে দক্ষিণ ভিয়েতনামবাসীদের মধ্যে খুব অপ্রিয় করে তোলে ফলে মার্কিন সরকারও এই দিয়েম সরকারে প্রতি আস্তে আস্তে তাদের ধারণা পাল্টাতে থাকে। তাদের এই বদ্ধমূল ধারণা হয় যে দিয়েম সরকার যেভাবে শাসনপ্রথা চালাচ্ছে তাতে কমিউনিস্টদের সহজে দমন করা যাবে না, মার্কিন সরকার যদি দিয়েমের প্রতি বিরূপ না হত এবং সায়গনের জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট যদি তৎপর না হয়ে উঠত, তা হলে এই বৌদ্ধ দমন-পীড়নের কাহিনী থেকে যেত অলক্ষ্যেই। এই গণ-আন্দোলনের বিশালতা এবং জনতার উৎসাহ ও সংগ্রামী মনোভাব সায়গনের মার্কিন কমান্ডের কাছে ছিল একটি বিরাট আঘাতস্বরূপ। কারণ তারা বুঝেছিল, 'ভিয়েত কং'রা একেবারে সায়গনের ভিতরে হাজারে হাজারে তাদের সঙ্গে মিশে রয়েছে এবং দিয়েমের সেনাবাহিনীকে বিপর্যস্ত, বিব্রত করে তুলেছে। এই লড়াইয়ে দিয়েম যে শুধুমাত্র গ্রামাঞ্চলেই পরাজয় বরণ করেছিল তা নয়; পরাজিত হচ্ছিলেন সায়াগনেও।

ফলে তাঁর অপসারণ হয়ে উঠেছিল সুনিশ্চিত। আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট কিন্তু সামরিক অভ্যুত্থান চাইছিল। তাই দক্ষিণ ভিয়েতনামে নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ক্যাবট লজের উপর এই কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়। "দিয়েমকে দিয়ে এ যুদ্ধ আমরা জিততে পারব না"—এ বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চিত হয়েছিল স্টেট ডিপার্টমেন্ট। তাছাড়া, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর দমন-পীড়ন এবং সায়গনের 'অভিজাত' ঘরানার হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে কারান্তরালে আটক—এই দুটি ব্যাপার অন্যান্য বৌদ্ধ রাজ্যগুলোর সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের পক্ষে হয়ে উঠেছিল মারাত্মক ক্ষতিকারক। রাষ্ট্রপুঞ্জের উপস্থিতিতেই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন স্টেট ডিপার্টমেন্টকে আরো অস্বস্তি পরিস্থিতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল এবং এই ঘটনাই স্টেট ডিপার্টমেন্টকে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে। রাষ্ট্রপুঞ্জে মার্কিন কর্মকর্তাগণ অতি অল্পের জন্য ভোট এড়াতে এবং কিছুকালের জন্য ব্যাপারটিকে ধামাচাপা দিতে সক্ষম হন। কিন্তু তার আগেই রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি তদন্তকারী দল গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল সায়গনে। ফলে দিয়েমের পতন স্টেট ডিপার্টমেন্টের চরম কাম্য হয়ে দাঁড়ায়। শুধু কাম্যই নয়; প্রকৃতপক্ষে হয়ে ওঠে অতি প্রয়োজনীয়। কারণ সেক্ষেত্রে, একটিমাত্র সামরিক অভ্যুত্থানেই আধডজনখানেক অস্বস্তিকর সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তাই অবশেষে ১৯৬৩ সালের ১লা নভেম্বরে জেনারেল দং ভ্যান মিনের নেতৃত্বে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচ্ছন্ন মদতে, সায়গন শহরে এক সামরিক অভ্যুত্থান হয় দিয়েমের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে। এই সামরিক অভ্যুত্থানে দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি দিয়েম ও তার ভাই ন্যু (Nhu)-কে হত্যা করা হয় এবং অবসান হয় দীর্ঘ নয় বছরের নগো পরিবারের তীব্র ও ভয়াবহ্ পরিচালিত শাসনব্যবস্থার। এরপর, ৭ই নভেম্বর ১৯৬৩ সালে, দক্ষিণ ভিয়েতনামে জেনারেল দং ভ্যান মিনের (Duong Van Minh) নেতৃত্বে এক অস্থায়ী সরকার স্থাপিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সরকারকে স্বীকৃতি দেয় অতি দ্রুত এই ধারণার বশবর্তী হয়ে, এই সরকারই একমাত্র ভিয়েতনামের কমিউনিস্টদের ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে। ফলে, সূচনা হয় এক নতুন ইতিহাসের ধারা ভিয়েতনামের মাটিতে।

৭৮.৫ ভিয়েতনামের মাটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামরিক অধিগ্রহণ

দিয়েমের পতনের তিন সপ্তাহ পর ম্যাকনামারাকে নতুন পর্যায়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামের যুদ্ধ করবার নির্দেশ দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কেনেডি ওয়াশিংটন ত্যাগ করেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামের নতুন রাষ্ট্রপ্রধান দং ভ্যান মিন ক্ষমতায় আসার পর দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কোন উন্নতি লক্ষ্য করা যায় না। ফলে সন্ত্রাস আবার শুরু হয় দক্ষিণ ভিয়েতনামের সৈন্যদের সাথে ভিয়েত কং গেরিলাদের মধ্যে। গেরিলাদের হাতে পাঁচ হাজার সরকারি ফৌজ প্রাণ হারায়। তাই অস্থির হয়ে ওঠে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্যে ১৯৬৪ সালের ৩০শে জানুয়ারী, আবার এক কম রক্তক্ষয়ী সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামে মেজর জেনারেল নুয়েন খাঁন, জেনারেল দং ভ্যান মিনকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেন। এই সামরিক অভ্যুত্থানের মূল কারণ ছিল দং ভ্যান মিনের গোপন ষড়যন্ত্র ফরাসিদের সাথে দক্ষিণ ভিয়েতনামের নিরপেক্ষতার প্রশ্নে। মার্চের ৮ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি

জনসনের আদেশে সামরিক সচিব রবার্ট ম্যাকনামারা এবং জেনারেল টেলার দক্ষিণ ভিয়েতনামে আসেন সেই দেশের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সাথে নতুন সরকারের সামরিক কার্যকারিতা ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনার জন্য। ম্যাকনামারা স্বদেশে ফিরে যাওয়ার পর, মার্কিন রাষ্ট্রপতি দক্ষিণ ভিয়েতনামকে যতদিন প্রয়োজন ততদিনের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। এপ্রিলের শেষে জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ড জেনারেল হ্যারকিন্স-এর জায়গায় মিলিটারী এড কমান্ডের ভার নিয়ে সায়গন এলেন। জুনের শেষে রাষ্ট্রদূত হয়ে এলেন ম্যাক্সওয়েল টেলর ও হেনরী ক্যাবট লজ ফিরে গেলেন ওয়াশিংটনে। ইতিমধ্যে মে মাসে, ম্যাকনামারা ও টেলর আবার দক্ষিণ ভিয়েতনামে ভ্রমণ করেন এবং ফিরে এসে মার্কিন সরকারকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের জন্য আরো বেশি অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা করার উপদেশ দেন, যেহেতু ভিয়েত কং (Viet Cong) তাদের আক্রমণ বহুলাংশে বৃদ্ধি করে। প্রচুর মার্কিন সামরিক ও অর্থনৈতিক আমদানি হওয়া সত্ত্বেও, ভিয়েত কং কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েতনামে তাদের আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ চার-পঞ্চমাংশ বৃদ্ধি করতে পেরেছিল। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি প্রবেশ দক্ষিণ ভিয়েতনামে এক নতুন উত্তেজনার দিক সৃষ্টি করে এবং এর দরুন ভিয়েতনামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়।

৭৮.৬ গাল্‌ফ অব টনকিনের ঘটনা

ফরাসি রাষ্ট্রপতি দ্য গলের 'ইন্দোচীনের নিজীবিকরণ' সমাধানের প্রস্তাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জনসন প্রত্যাখান করার পর গাল্‌ফ অব টনকিন-এর সমস্যার উদ্ভব হয়। এই সমস্যা কিন্তু হঠাৎ করে আকাশ থেকে পড়েনি। ১৯৬১ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি কেনেডি গোপনে উত্তর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। অন্যদিকে মার্কিন সহায়তায় দক্ষিণ ভিয়েতনামও উত্তর ভিয়েতনামের উপকূলবর্তী এলাকায় আক্রমণ করে। ফলে উত্তর ভিয়েতনাম যখন মার্কিন তৎপরতার জবাব দিতে শুরু করে, তখনই এই গ্যাল্‌ফ অব টনকিন সমস্যার উদ্ভব হয়। ১৯৬৪ সালের ২রা আগষ্ট মার্কিন বিধবংসী জাহাজ ম্যাডোক্স (Maddox) এবং তিনটি উত্তর ভিয়েতনামী পাহারাদারী নৌকার মধ্যে এক তুমুল সংঘর্ষ হয়। এর দরুন রাষ্ট্রপতি জনগণ প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন নৌবাহিনীকে আদেশ করেন :

(ক) গাল্‌ফ অব টনকিনের পাহারা চালিয়ে যাওয়া;

(খ) বিধবংসী জাহাজগুলির উপর সহায়কারী যুদ্ধবিমান সরবরাহ করা; এবং

(গ) যে কেউ মার্কিন রণতরী ধবংস করতে চায়, তাকেই সরাসরি আক্রমণ করা।

মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব ম্যাকনামারা আরো জানালেন যে সপ্তম নৌবহর থেকে ৬৪ বার বিমান আক্রমণ চালান হয়েছিল, যার ফলে ২৫টি ভিয়েতনামী জলযান (Vessel) ধবংস হয় এবং দুটি মার্কিন বিমান বিনষ্ট হয় ও দুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই গাল্‌ফ অব টনকিন সংঘর্ষের ফলে ও দিয়েমের মৃত্যুর পর, ভিয়েতনামের যুদ্ধ মার্কিন পরিণত হয় এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম সম্পূর্ণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে চলে যায়। বাড়ে দ্রুত মার্কিন সৈন্য সরবরাহ ও যুদ্ধ ব্যায়। ফলে ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যাও বেশি বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত দেখা যায় যে এই সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫,৪৩,৪০০ জন, এবং মিত্রশক্তির সংখ্যা ছিল ৬৮,৮৮৯ জন। ৪৬,৬১৬ জন সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যায় ও অন্যান্য ১০,৩৮৩ মৃত্যু মিলিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৬,৯৯৯ জন, আহত হয় ১,৫৩,৩২৯ জন।

গাল্‌ফ অব টনকিনের ঘটনার পর দক্ষিণ ভিয়েতনামে যুদ্ধ তীব্রতর হয়, ফলে সেখানে রাজনৈতিক অবস্থার অবনতি হয়। সরকারে স্থিতিশীলতা হ্রাস পায় অতি দ্রুত এবং হতে থাকে একটার পর একটা সামরিক অভ্যুত্থান। আবির্ভূত হয় নতুন নতুন জেনারেল, অসামরিক ডেমোক্রাট ও উচ্চবর্ণের রাজপুরুষ। আবার মিলিয়ে যায় অতি দ্রুত। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সায়গনী শাসনক্ষমতা হাতবদল হয় দশবার এবং শেষেদশ হাত ঘুরে দক্ষিণ ভিয়েতনামের শাসনক্ষমতায় আসেন নুয়েন কাও কী। এই রাজনৈতিক ভঙ্গুরতার দরুন বৌদ্ধরা ও ছাত্ররা সরকার বিরোধী প্রতিবাদ ও যুদ্ধাবসানের আন্দোলন শুরু করে। ভিয়েত কং শক্তি এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের আক্রমণ বাড়িয়ে দেয় এবংদক্ষিণ ভিয়েতনাম অঞ্চলে দুই-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা তাদের অধীনে আসে। এই অবস্থায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনসন দক্ষিণ ভিয়েতনামে সামরিক কার্যকলাপ বাড়িয়ে গেলেন অতি দ্রুত। কমিউনিস্টদের সরবরাহ-এর পথগুলির উপর ও উত্তর ভিয়েতনাম ও লাওস-এ সামরিক অস্ত্রশস্ত্রের মাটির উপর হয় প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ এবং এর ফলে সমগ্র ভিয়েতনাম অগ্নিগর্ভ রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৫ সালে উত্তর ভিয়েতনামে ৬৩,০০০ টন বোমাবর্ষণ করেছিল ও ১৯৬৭ সালে ২,২৬,০০০ বোমাবর্ষণ করেছিল এবং এর ফলস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৬০০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়েছিল।

৭৮.৭ ভিয়েত কং-এর টেট আক্রমণ

১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসেদক্ষিণ ভিয়েতনামে অবস্থিত মার্কিন উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা যুদ্ধ পরিচালনার সন্তোষ প্রকাশকরে। এর ফলে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনসন তার দেশের জনগণকে ভিয়েতনামকে সামরিক পরিস্থিতির সন্তোষজনক প্রগতির কথা পরিবেশন করেন। তখন মনে হয়েছিল শীঘ্রই এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান হবে। কিন্তু এই অবস্থার হঠাৎ পরিবর্তন হয়, যখন ভিয়েত কং ১৯৬৮ সালে ৩১শে জানুয়ারী থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারী এর মধ্যে টেট (Tet) আক্রমণ শুরু করে। এই আক্রমণের মূল অস্ত্র ছিল অগ্নিবর্ষণ ও স্থল অভিযান এবং তা হয় ৪৪টি দক্ষিণ ভিয়েতনামী প্রাদেশিক রাজধানীর মধ্যে ৩৯টি বিরুদ্ধে ও বহু জেলা সদরে।

মার্কিন শাসনতন্ত্র এই টেট আক্রমণে ভীষণভাবে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। ফলে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে জেনারেল ওয়েষ্টমোরল্যান্ডের অনুরোধে দক্ষিণ ভিয়েতনামে আরো বেশি আক্রমণ ও সৈন্য বলবৎ করে। কিন্তু এই টেট আক্রমণের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল যে এটি ভিয়েতনামের প্রতি মার্কিন নীতির এক নতুন দিকের উন্মোচন

করে। তাই মার্কিন শাসনব্যবস্থা তার দক্ষিণ ভিয়েতনামের সামরিক নীতি এক বিকল্প পথের সন্ধান করতে শুরু করে। ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনামের উপর আরো দায়িত্ব নিয়ে শুরু করে। এই কাজের প্রক্রিয়ার জেনারেল ওয়েষ্টমোরল্যান্ড নাম দিলেন "অপসারণ নীতি" (Withdrawal Strategy)। কিন্তু এই নীতির রূপায়ণ শুরু হয়েছিল রাষ্ট্রপতি নিক্সনের শাসনকালে যখন দক্ষিণ ভিয়েতনামী প্রজাতন্ত্র সেনাবাহিনী গঠন করাহয় ভিয়েতনামী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য। অন্যদিকে মার্কিন শাসনতন্ত্র আবার কমিউনিস্টদের সাথেও চুক্তি করার আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু টেট আক্রমণের জন্য ডিন রাস্ক (Dean Rusk), মার্কিন রাষ্ট্রসচিব মনে করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ভিয়েতনামের সাথে সংগ্রাম ও চুক্তির নীতি স্থাপন করা উচিত। রাষ্ট্রপতি জনসনও এই মতবাদে সহমত প্রকাশ করেন। পরিশেষে বলা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, স্বতন্ত্র দক্ষিণ ভিয়েতনাম বজায় রেখে উত্তর ভিয়েতনামের সাথে পূর্বশর্ত ছাড়াই চুক্তিকরতে আগ্রহী হয়। কিন্তু উত্তর ভিয়েতনাম এই মার্কিন প্রস্তাবে একেবারেই আগ্রহী ছিল না। উত্তর ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট মুখপত্র নান দান (Nhan Dan) ১৯৬৫ সালে ১২ই এপ্রিলের প্রকাশিত সংখ্যায় মার্কিনী এই প্রস্তাবকে তীব্রভাবে ধিক্কার দেয় এবং বলে যে যুক্তরাষ্ট্রের এই যৌথ বিকাশের পরিকল্পনা, আসলে মার্কিন চুক্তির প্রস্তাবকে গ্রহণ করার জন্য একটি অজুহাত মাত্র বিশেষ।

৭৮.৮ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের যুদ্ধ শেষ করার শর্তাবলী

ইতিমধ্যে হ্যানয় সরকার ঘোষণা করে যে ভিয়েতনামী জনগণের যথাযথ ও যুক্তিপূর্ণ দাবিগুলি মেটালে পরেই ভিয়েতনামের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান হতে পারে। ১৯৬৫ সালে এপ্রিল মাসে, জাতীয় অধিবেশনে সরকারে পক্ষ হয়ে উত্তর ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফাম ভান দং (Pham Van Dong) এইদাবিগুলির বিশদভাবে উল্লেখ করেন। এই দাবিগুলি হল ঃ

(ক) ভিয়েতনামী জনসাধারণের মৌলিক জাতীয় অধিকারগুলির স্বীকৃতি; শান্তি, স্বনির্ভরতা, সার্বভৌমতা, ঐক্য এবং আঞ্চলিক সংহতি। জেনিভা, চুক্তি অনুযায়ী মার্কিন সরকার দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে তার সব সৈন্য, সামরিক পদাধিকারী ব্যক্তি ও অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধের সামগ্রী আবশ্যিকভাবে অপসারিত করবে এবং সেখানে যত সামরিক গাঁটি আছে তাদেরকে বিনষ্ট করবে ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে পুতুল সরকারের সাথে সামরিক মৈত্রী শেষ করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনামে তার হস্তক্ষেপ এবং আগ্রাসনের নীতির অবসান করবে। মার্কিন সরকার উত্তর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ তৎপরতা বন্ধ করবে ও তার অঞ্চল এবং সার্বভৌমতায় অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ থেকে নিবৃত্ত থাকবে।

(খ) ভিয়েতনামে শান্তিপূর্ণ পুনর্মিলনের ব্যাপারে ১৯৫৪ সালের ভিয়েতনামের উপর সামরিক বিধিনিষেধগুলি কঠোরভাবে মান্য করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম উভয়েই বিদেশের সাথে সামরিক মৈত্রী থেকে বিরত থাকবে, সেখানে কোন বৈদেশিক সামরিক ঘাঁটি থাকবে না, তাকবে না কোন বৈদেশিক সৈন্য ও সামরিক পদাধিকারী ব্যক্তি।

(গ) দক্ষিণ ভিয়েতনামের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার সেখানকার জনগণের দ্বারাই নির্ধারিত করতে হবে, এবং তা নির্ধারিত হবে দক্ষিণ ভিয়েতনাম জাতীয় মুক্তবাদী মোর্চা (South Vietnam National Front for Liberation)-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী, বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই।

(ঘ) বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই এই দুই অঞ্চলের ভিয়েতনাম জনসাধারণের দ্বারাই ভিয়েতনামের শান্তিপূর্ণ পুনর্মিলন স্থাপিত হবে।

এই উপরের প্রস্তাবগুলি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের (DRV) মতে একমাত্র ভিয়েতনামে শান্তি আনার ও পুনর্মিলনের জন্য উপযুক্ত শর্তবলী সৃষ্টি করার যুক্তিপূর্ণ সমাধান। এই কারণেই উত্তর ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি হো চি মিন বলেছিলেন যে তার দেশ তখনই ভিয়েতনামে যুদ্ধের উপর কোন চুক্তি করতে রাজী হবে, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কমিউনিস্ট সরকারের এই চতুমুখী প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করবে।

কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েতনামে, দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারে বিরুদ্ধে এক বহু বিস্তৃত জনরোষ দেখা যায় বিশেষত যুদ্ধে আহত লোকেদের মধ্যে যারা জেনিভা চুক্তির যথাযথ রূপায়ণের উপর ভিত্তি করে হ্যানয়ের সাথে যুদ্ধ বিরতি চুক্তির জন্য অস্থির হয়েছিল। সামরিক অধিকারীদের দ্বারা ঘন ঘন সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে দক্ষিণ ভিয়েতনামের শাসনতন্ত্র বেশ দুর্বল ও অস্থায়ী হয়ে পড়েছিল, ফলে সেখানে ভিয়েত কং শক্তির কোন কার্যকরী বিরোধিতা ছিল না, যদিও ভিয়েত কং হ্যানয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু দেখা যায় এদের স্বনির্ভরতা কার্যক্ষমতাও অনেকাংশে ছিল। রাষ্ট্রপতি হো চি মিন তার বিচারবুদ্ধি ও সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে চীনের প্রতি নির্ভরতা নয়, বরং স্বনির্ভরতা দেখিয়েছিলেন, যাতে ভিয়েতনামে জমি কখনও চীনের দখল না হয় বা চৈনিক সৈন্য অথবা স্বেচ্ছাসেবী না আসে, সে বিষয়ে সব সময় সতর্ক থাকতেন। তিনি কখনও চীন-সোভিয়েটের আদর্শ বিবাদে অংশগ্রহণ করেন নি, তিনি অথবা ভিয়েতনাম কমিউনিস্টরা ভিয়েতনামে কখনও চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অনুকরণ করেন নি।

অন্যদিকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনসন, রক্তক্ষয়ী ভিয়েতনাম যুদ্ধের লম্বা ইতিহাস মার্কিন জনসাধারণের মধ্যে যে বিভেদ এবং বিদ্বেষ ও সরকারের ব্যর্থ ও হতাশাজনক ভিয়েতনাম নীতিতে, বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভিয়েতনাম যুদ্ধের খরচ তুলতে যে নতুন কর ব্যবস্থা চালু করেছিলেন ও বাধ্যতামুলকভাবে সেনাবাহিনী যোগদানে যে আইন প্রচলন করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনের ঢেউ ওঠে। ফলে অনেক নিকট উপদেশকদের সাথে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, তিনি ১৯৬৮ সালে ৩০শে মার্চ তারিখে এমন এক অভূতপূর্ব, কঠোর এবং নাটকীয় সিদ্ধান্তের ঘোষণা করলেন, যা শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও নয়, সমগ্র বিশ্বকে হতবাক ও স্তম্ভিত করে দেয়। এই সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে চারটি প্রধান সিদ্ধান্ত হল বিশেষভাবে আকর্ষণীয় এবং তা হলঃ

(ক) ভিয়েতনামে অবস্থিত মার্কিন সামরিক শক্তি যে অতিরিক্ত সৈন্যদল চেয়েছিল, তার উত্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নামে মাত্র কলেবর বৃদ্ধি করবে।

(খ) ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রাথমিক দায়িত্ব হিসাবে রাষ্ট্রপতি জনসন দক্ষিণ ভিয়েতনামের সামরিক শক্তির বিস্তার ও উন্নতিসাধন করবেন।

(গ) তিনি আরেক বারের জন্য দলের মনোনীত রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করবেন না।

(ঘ) শান্তি ত্বরান্বিত করার জন্য তিনি উত্তর ভিয়েতনামের অধিকাংশ অঞ্চলের উপর বোমাবর্ষণ বন্ধ করবেন।

তিনি রাষ্ট্রপতি না হওয়ার এই সিদ্ধান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে রাজনৈতিক বিভাজন সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে আবার ঐক্য ফিরে আসে। ফলে মার্কিন জাতি এক সম্মানজনক শান্তির জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু বোমাবর্ষণ বন্ধ করার জন্য কোন শর্ত চাপানো হল না। জনসন আশা করেছিলেন রাষ্ট্রপতি হো চি মিন ও তার এই পরিকল্পনাতে অবশ্যই স্বাগত জানাবেন। এমন কী তিনি Averell Harriman নামে এক বিশিষ্ট মার্কিন দূতকে তার ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসাবে হ্যানয়ের সাথে প্রত্যাশিত কথা বলার জন্য ঘোষণা করলেন।

১৯৬৮ সালের ৩রা এপ্রিল, মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনসন আরো বললেন যে গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্র মার্কিন প্রতিনিধির সাথে সংযোগ করতে আগ্রহী, যাতে মার্কিন দলের সাথে মার্কিন বোমাবর্ষণের এবং উত্তর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কার্যকলাপ নিঃশর্তে বন্ধ হবার কথা শুরু হতে পারে। তিনি আরো বলেন যে তিনি এবার মার্কিন প্রতিনিধিকে হ্যানয় প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করবেন, এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের ও অন্যান্য মিত্রদের সাথেও কথাবার্তা চালিয়ে যাবেন। ফলে ভিয়েতনামের সংঘর্ষের রক্তক্ষয়ী ইতিহাস অবশেষে আলোচনার দিকে অগ্রসর হয়।

৭৮.৯ ভিয়েতনাম যুদ্ধের আপস-মীমাংসার আলো ও শান্তি প্রচেষ্টার বাতাবরণ

১৯৬৮ সালের ১৩ই মে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর ভিয়েতনামের মধ্যে ভিয়েতনামের যুদ্ধের অবসর প্রসঙ্গে প্রথম আলাপ-আলোচনা শুরু হয় প্যারিসে। এই দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ফল প্রাথমিকভাবে খুব একটা ফলপ্রসু হয়নি। প্রথম থেকে দুপক্ষের অনড় মনোভাব নিজ নিজ চিন্তাধারায় ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি দানের তীব্র বিরোধিতা দক্ষিণ ভিয়েতনামে অস্থায়ী বৈপ্লবিক সরকারকে (Provisional Revolutionary Government or National Liberation Front) এই আলোচনায় বেশিদূর এগোতে দেয়নি। তাছাড়া মার্কিন সরকারে ক্রমবর্ধমান বোমাবর্ষণ সমগ্র ভিয়েতনামে, এই আলোচনায় বিশেষভাবে ব্যাহত করে। অবশেষে অনেক আলাপ-আলোচনার পর, ১৯৬৮ সালের ৩১শে অক্টোবর রাষ্ট্রপতি জনসন ঘোষণা করেন যে ১লা নভেম্বর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধের আগ্রহী। তাছাড়া দুপক্ষের বিস্তর আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়, তা হ'ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরোক্ষভাবে অস্থায়ী বৈপ্লবিক সরকারকে স্বীকৃতি ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন মদতপুষ্ট সরকার এবং এই অস্থায়ী সরকারকে যৌথভাবে শান্তি আলোচনায় অংশগ্রহণে সম্মতি। ইতিমধ্যে, ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি জনসনের জায়গায় রিচার্ড নিকসন্ (Richard Nixon) ক্ষমতায় আসেন। ক্ষমতায় এসে তিনি প্রথমে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারিমানকে সরিয়ে দেন ও তার জায়গায় ভিয়েতনাম যুদ্ধের আপস মীমাংসার জন্য মূল মার্কিন প্রতিনিধি হিসাবে হেনরি কেবট লজ্ (Henry Cabot Lodge)-কে স্থলাভিষিক্ত করেন।

৭৮.১০ নিকসন্ তত্ত্ব/উপদেশালী

ক্ষমতায় আসার পর, ১৯৬৯ সালের ৫ই জুলাই তাঁর এশিয়া ভ্রমণের সময়, মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিকসন্ গুয়াম (Guam) নামক একটি জায়গায় এক নিজস্ব তত্ত্ব পরিবেশন করেন যা পরবর্তীকালে নিকসন্ তত্ত্ব হিসাবে পরিচিত হয়। এই তত্ত্বর দ্বারা মার্কিন বিদেশনীতির এক বিশাল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই তত্ত্বের দ্বারা মার্কিন বিদেশনীতির এক বিশাল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় বিশ্ব ইতিহাসের পাতায়। এটি শুধুমাত্র ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান চায়নি, বরং ভবিষ্যৎ কালের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরিসমাপ্তি চেয়েছিল। এই তত্ত্বের মূল বিষয়গুলি হল নিম্নরূপঃ

(ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সবচুক্তি মেনে চলবে;

(খ) যদি কোন পারমাণবিক শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন মিত্র রাষ্ট্রে বা এমন কোন রাষ্ট্রে যেখানে মার্কিন নিরাপত্তার জন্য জরুরী, তার স্বাধীনতার অন্তরায় হয়, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক সাহায্য দিয়ে রক্ষা করবে আত্মরক্ষার্থ আবরণ হিসাবে;

(গ) অন্য ধরনের কোন আগ্রাসনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা দেবে, যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তি অনুযায়ী সে কোন অনুরোধ করে;

(ঘ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আশাকরে, যে দেশ আগ্রাসনের শিকার হতে পারে, তার নিরাপত্তার জন্য সে মানবশক্তি যোগানের প্রাথমিক দায়িত্ব নিতে পারবে।

নিকসন্ জাতীয় নিরাপত্তার ব্যাপারে স্বনির্ভরতার উপর ভীষণ জোর ও উৎসাহ দিতে চেয়েছিলেন, এবং এটি ছিল এশিয়াতে মার্কিন বৈদেশিক নীতির এক নতুন দিগন্ত। ১৯৬৯ সালের ৪ঠা নভেম্বর, এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে নিকসন্ ভিয়েতনাম যুদ্ধ সমাপ্ত করার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সমস্ত মার্কিন সৈন্য তুলে নিতে এবং পরিবর্তে দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্যদের নির্দিষ্ট সময়সীমা অনুযায়ী প্রয়োগ করতে, যদিও তিনি সেই নির্দিষ্ট সময়সীমার কোন উল্লেখ করেননি।

চুক্তি এবং যুদ্ধক্ষেত্রে এই দুইদিকে মার্কিন নীতি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি নিকসন্। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী, এক বছরের মধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে সমস্ত বৈদেশিক সৈন্য তুলে নেওয়া, যুদ্ধবিরতির আলোচনা ও আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে দক্ষিণ ভিয়েতনামে সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি আবার ঘোষণা করেছিলেন য়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামের মানুষদের ভবিষ্যৎ নিজেদের নিশ্চিত করার অধিকার ছাড়া, অন্য সব ব্যাপারে চুক্তি করা যেতে পারে।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের ময়নাতদন্ত করার সময় বলা যেতে পারে যে এর থেকে অধিকাংশ সামরিক শিক্ষাই গ্রহণ করার প্রয়াস করা হয়েছে। কোন কোন শিক্ষা, যাদের ওপর বেশি পরিমাণে জোর দেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল বৈদেশিক সামরিক শক্তি, এবং স্বদেশের রাজনৈতিক পরিকাঠামোর এক সমন্বয়, যে দেশে সামরিক তৎপরতা

চলেছে সে দেশের সম্পর্কে এক নির্দিষ্ট ধ্যানধারণা, দ্বন্দ্বের যথাযথ পরিকল্পনার পক্ষে সামরিক উপাদানের নিখুঁত মূল্যায়ন, দ্বন্দ্বের যথাযথ উদ্দেশ্য নিরূপণ, সৈন্যদের মধ্যে সংহতি, সামরিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি। এই নীতির দ্বারা রাষ্ট্রপতি নিকসন্ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো এক বৃহৎ শক্তিশালী দেশকে, এক ক্ষুদ্র জাতির দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে শোচনীয় পরাজয়ের সম্ভাবনা থেকে উদ্ধার করার এক প্রাঞ্জল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস নেন।

৭৮.১১ হো চি মিনের প্রস্তাব

৩০শে আগস্ট ১৯৬৯ সালে, মৃত্যুর ঠিক তিন দিন আগে উত্তর ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি হো চি মিন, নিকসনের প্রস্তাবগুলি সম্পূর্ণ বাতিল করে দেন। তিনি এই প্রস্তাবগুলি আলোচনা করতে রাজি হননি, যেহেতু এগুলি ভিয়েতনাম যুদ্ধ সংক্রান্ত জাতীয় মুক্তিবাহিনীর (National Liberation Front) পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। হ্যানয় সরকার চেয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই পরিকল্পনাগুলিকে নিঃশর্তে গ্রহণ করুক। বস্তুত এর মূল অর্থ ছিল যে মার্কিন সৈন্যের দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে অনতিবিলম্বে সম্পূর্ণ অপসারণ ও মার্কিন মদতপুষ্ট দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারে পতন।

যেহেতু হ্যানয়ের শর্তগুলি ওয়াশিংটনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ছিল না, এবং উভয়পক্ষই নিজ নিজ সিদ্ধান্তে অবিচল ছিল, সেজন্য প্যারিসে শান্তিচুক্তির কোন প্রগতি সম্ভবপর হয়নি। আগে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি নিকসন্ যুদ্ধক্ষেত্রে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সৈন্যবাহিনীর মোতায়েন এবং মার্কিন সৈন্যর সম্পূর্ণ অপসারণের উপর জোর দিয়েছিলেন, তা সে চুক্তির ক্ষেত্রেই যাই হোক না কেন, এমনকী তিনি গোপনে ব্যক্তিগত চুক্তির সম্ভাবনারও সঙ্কেত দিয়েছিলেন। তিনি হো চি মিনের সাথেও ব্যক্তি মাধ্যমে সংযোগের চেষ্টা করেছিলেন। উপরন্তু সোভিয়েট রাশিয়া, উত্তর ভিয়েতনামকে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছিল বলে, নিকসন্ এমনকী সোভিয়েটের সাহায্য পেতে চেয়েছিলেন যাতে শেষ পর্যন্ত অর্থপূর্ণ চুক্তি শুরু করা যেতে পারে।

উত্তর ভিয়েতনামে প্রতিনিধি Le Due Tho-এর সাথে প্রত্যক্ষ গোপনীয় চুক্তি করতে নিকসন্ দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি থিউ (Thieu)-এর সাথে আলোচনা করে, হেনরি কিসিঞ্জারকে মার্কিন প্রতিনিধি হিসাবে প্যারিসে পাঠিয়েছিলেন। এর পরেও কিসিঞ্জার ও Le Due Tho-এর মধ্যে প্যাসি অনেকবার গোপনে আলোচনা হয়েছিল এবং এই উদ্দেশ্য তাকে প্রায়ই প্যারিস, ওয়াশিংটন ও সায়গন যাতায়াত করতে হয়েছিল। উভয়পক্ষের মধ্যে অনেক প্রস্তাব আলোচিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষিত হয়েছিল। যেমন ১৯৭০ সালের ৭ই অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নিকসন্ পঞ্চমুখী মার্কিন পরিকল্পনা প্রস্তাব রেখেছিলেন এবং সেগুলি হলঃ

(ক) সমগ্র ইন্দোচীনে যুক্তবিরতি;
(খ) চুক্তিবদ্ধ সময়সীমা, যার মধ্যে মার্কিন সৈন্যকে দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে তুলে নিতে হবে;
(গ) সমস্ত যুদ্ধবন্দিদের অবিলম্বে মুক্তি;
(ঘ) সমগ্র ইন্দোচীনের জন্য আন্তর্জাতিক শান্তির সম্মেলন; এবং
(ঙ) রাজনৈতিক সমাধান যা দক্ষিণ ভিয়েতনামের নাগরিকদের ইচ্ছার প্রতিফলন করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করে নিলেও, উত্তর ভিয়েতনাম এই প্রস্তাবগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে ও পরিবর্তে নিজস্ব কিছু পরিকল্পনার প্রস্তাব দেয় যার মূল বিষয় ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য অপসারণ ও থিউ সরকারে পতন।

ইতিমধ্যে, ১৯৭০ সালের ১৮ই মার্চ-এ কম্বোডিয়ার এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং এর দরুন কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান নরোদম সিহানুক (Noradom Sihanouk) ক্ষমতাচ্যুত হন এবং তার জায়গায় সামরিক প্রধান লন্ নল (Lon Nol) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুরোপুরি সমর্থনে ক্ষমতায় আসেন। এই সামরিক অভ্যুত্থান ভিয়েতনামের শান্তির আলোচনার বাতাবরণকে ভীষণভাবে বিঘ্নিত করে। এরই সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের যৌথ উদ্যোগে ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাওস (Laos) আক্রমণ, বিশেষ করে কমিউনিস্টদের আশ্রয়স্থল ও উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে খাদ্য সংযোগকারী পথ (Hoi Chi Mih Trial নামে পরিচিত), এই আলোচনা পথকে আরো ঘোলা করে। এমন অবস্থায় ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে হেনরি কিসিঞ্জার পিকিং-এ যান এবং সেখানে চীনের নেতাদের সাথে আলোচনা করেন ভিয়েতনাম যুদ্ধের শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে এবং তিনি চীনা নেতাদের অনুরোধ করেন যে তারা হ্যানয় সরকারে ওপর মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণ করতে চাপ দেয় যেন। চীনের নেতারা হ্যানয়-এর সাথে আলোচনা না করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের উন্নতির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবগুলি উত্তর ভিয়েতনাম সরকারে উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনা যৌথভাবে হ্যায়নের উপর চাপ দেয় কোরীয় (Korean) ধরনের রাজনৈতিক সমাধানের জন্য এবং যার মূল বিষয় হল—যুদ্ধবিরতি, রাজনৈতিক অপরিবর্তিত অবস্থা এবং ভিয়েতনাম সমস্যা সমাধানের জন্য চুক্তি।

১৬ই আগস্ট উত্তর ভিয়েতনাম প্রতিনিধির সাথে, এক ব্যক্তিগত আলোচনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র — মার্কিন ও মিত্রশক্তিদের দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে সম্পূর্ণ অপসারণের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ১৩ই সেপ্টেম্বর উত্তর ভিয়েতনাম সে প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ নাকচ করে এবং ৮ই অক্টোবর উত্তর ভিয়েতনাম এক প্রস্তাব দেয় যাতে সামরিক যুদ্ধ সমাপ্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়, এবং এর পরের থেকেই ভিয়েতনাম যুদ্ধের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিগুলির অধ্যায় শুরু হয়। প্রথমে Le Due Tho, ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসানের জন্য, প্যারিসে যে শান্তির প্রস্তাব দেন তা হল ঃ

(ক) ভিয়েতনামে ও সম্ভব হলে অবশিষ্ট ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতি।

(খ) মার্কিন আগ্রাসনের অবসান।

(গ) দক্ষিণ ভিয়েতনামের অবস্থিত দুই পক্ষের মধ্যে (দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার ও Provisional Revolutionary Government (RPG) যা কমিউনিস্ট নীতির দ্বারা প্রভাবিত ছিল) সংযোগ স্থাপন।

(ঘ) মার্কিন শক্তির অপসারণ ও মার্কিন যুদ্ধবন্দীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

(ঙ) যুদ্ধবিরতির পর মার্কসবাদী ও অমার্কস্‌বাদী এই দুই ভিয়েতনাম সরকারে নিজ নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখা।

৭৮.১২ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আট দফা প্রস্তাব

Le Duc Tho-এর পাঁচ দফা প্রস্তাবের পর ১১ই অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নিকস্‌ন উত্তর ভিয়েতনামকে একগুচ্ছ প্রস্তাব দিয়ে এক ব্যক্তিগত প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। এই প্রস্তাবগুলি হলঃ

(ক) চুক্তি দিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন ও বৈদেশিক সৈন্যবাহিনীর সম্পূর্ণ অপসারণ।

(খ) একই সাথে ইন্দোচীনে সামরিক ও অসামরিক বন্দীদের মুক্তি।

(গ) দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ও উত্তরের সাথে দক্ষিণের পুর্ণমিলন স্থির করবে দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণ।

(ঘ) ১৯৫৪ সালে ইন্দোচীনের উপর জেনিভা চুক্তি এবং ১৯৬২ সালে লাওসের উপর চুক্তির উভয় পক্ষের দ্বারা মান্যতা।

(ঙ) স্বাধীনতা, সার্বভৌমতা, আঞ্চলিক অক্ষুণ্ণতা এবং পরস্পরে ব্যাপারে অন্তরায় না হওয়ার— এইগুলির উপর ভিত্তি করে ইন্দোচীনের জনগণের মধ্যে ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধান করা।

(চ) চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে সমগ্র ভিয়েতনামে সাধারণ যুদ্ধবিরতির ঘোষণা।

(ছ) যুদ্ধবিরতি সহ সামরিক চুক্তিগুলি পালনের ব্যাপারে আন্তজাতিক তত্ত্বাবধান।

(জ) ইন্দোচীন জনগণের মৌলিক জাতীয় অধিকারগুলির জন্য আন্তর্জাতিক অনুমোদন রক্ষার প্রচেষ্টা।

উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি আলোচনার জন্য উত্তর ভিয়েতনাম ২০শে নভেম্বর তাদের পাঠাতে সম্মতি হয়। কিন্তু Tho-এর শারীরিক অসুস্থতার জন্য শেষ পর্যন্ত উক্ত আলোচনা মুলতুবি থাকে। ইতিমধ্যে উত্তর ভিয়েতনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চাপ দেওয়ার জন্য ১৯৭২ সালে টেট (Tet) আক্রমণ আবার চালায় যাতে হ্যানয়ের প্রস্তাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত সম্মত হয়। এরই মধ্যে লক্ষ্য করা যায় যে দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্যরা ধীরে ধীরে পিছু হঠতে থাকে এবং নগর ও অন্যান্য অঞ্চলগুলি আস্তে আস্তে ছেড়ে দিতে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রে জনমত এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনামীকরণ প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ অর্থহীন ও ব্যর্থ মনে করে। ইতিমধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সৈন্যদলের মধ্যে অসহযোগিতার আভাস পেয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ উত্তর ভিয়েতনামের উপর পুনরায় বোমাবর্ষণ শুরু করে। এই পরিকল্পিত বোমাবর্ষণ উত্তর ভিয়েতনামের বহু সেতু, সেনাবাস, শক্তির উৎস (Power Plants), কলকারখানা, মালবাহী গাড়ি ও অন্যান্য সামরিক ঘাঁটিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে। শুধু তাই নয়, এই বোমাবর্ষণের শিকার হয় গির্জা থেকে আরম্ভ করে জন-উপনিবেশগুলি পর্যন্ত। এর প্রভাবে শিল্প, যানবাহন এবং পারমাণবিক শক্তির উৎসগুলি বহুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শহরের জনজীবন সম্পূর্ণরূপে

ব্যাহত হয়। এইসব সত্ত্বেও কিন্তু উত্তর ভিয়েতনামের জনগণ তাদের মনোবল একেবারেই হারায়নি। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের ঐকান্তিক মানসিক দৃঢ়তা তাদের এগিয়ে নিয়ে যায় তাদের নিজ উদ্দেশ্য সাধনের দিকে।

ইতিমধ্যে ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান প্রকল্পে ১৩ই অক্টোবর হেনরী কিসিঞ্জার, থো (Tho) ও Xuan Thuy-এর মধ্যে এক শান্তির আলোচনা শুরু হয়। এই আলোচনার ভিত্তিতে শেষ পর্যন্ত একটি খসড়া চুক্তি প্রস্তাবিত হয় এবং সেগুলি হল ঃ

(ক) আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে যুদ্ধবিরতি।

(খ) এক নতুন দক্ষিণ ভিয়েতনামী সরকারে গঠন।

(গ) দক্ষিণ ভিয়েতনামের এক নতুন সংবিধান প্রস্তুত করার জন্য নতুন সাংবিধানিক সভার গঠন।

(ঘ) শান্তি স্থাপনের ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য তিনটি পৃথক পৃথক কমিটির গঠন।

এই চুক্তির মূল দুটি অংশ ছিল— সামরিক ও রাজনৈতিক। প্রথমে যুদ্ধের অবসানের জন্য যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব হয় এবং এগুলির জন্য যে সব কাজের প্রয়োজন ছিল, সেগুলি হল দক্ষিণ ভিয়েতনামের সমস্ত সামরিক শক্তির ক্ষমতা বিলোপ ও উত্তর ভিয়েতনামের উপর বোমাবর্ষণসহ সমস্ত সামরিক কার্যকলাপের বিরতি, মার্কিন সামরিক বাহিনীর ভিয়েতনাম থেকে অপসারণ, যুদ্ধবন্দীদের আদানপ্রদান ও কাম্বোডিয়া এবং লাওসে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা ইত্যাদি।

চুক্তির রাজনৈতিক অংশে ছিল তৎকালীন সায়গন সরকার ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বৈপ্লবিক সরকার (Provisional Revolutionary Government)-এর মধ্যে এক সাময়িক গঠন করার চুক্তি, তারপর সাধারণ নির্বাচন ও শেষে সাংবিধানিক সভার মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামে নতুন সংবিধান ও সরকারে গঠন। এই প্রস্তাবগুলিকে কার্যকর করতে তিনটি পৃথক সমিতি (Committee) স্থাপন করা হয়েছিল এবং সেগুলি হল ঃ

(ক) যুদ্ধবিরতি তত্ত্বাবধানের জন্য এক আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান সংগঠন গঠন করা,

(খ) সায়গন ও অস্থায়ী বৈপ্লবিক সরকারের সদস্যদের এবং নিরপেক্ষদের নিয়ে এক সংগঠন স্থাপন করা, যে সংগঠন শেষ পর্যন্ত সাময়িক সরকার গঠন করবে।

(গ) যুদ্ধের সমস্ত পক্ষকে নিয়ে অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর ভিয়েতনাম, সায়গন সরকার ও অস্থায়ী বৈপ্লবিক সরকারকে নিয়ে এক সংগঠন তৈরি করা যা শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানিক সংগঠনের সাথে যৌথভাবে কাজ করবে এবং যার মূল কাজ হবে কোন পক্ষ যুদ্ধবিরতির সময় দক্ষিণ ভিয়েতনামের কোন অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করবে তা ঠিক করা।

উপরের প্রস্তাবগুলি নিকসনের সম্মতি পাওয়ার পর হেনরী কিসিঞ্জার এই প্রস্তাব নিয়ে সায়গনের প্রেসিডেন্ট থিউ (Thieu)-এর সঙ্গে দেখা করেন তার সম্মতির জন্য। এই প্রস্তাবটিতে থিউ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন কারণ চুক্তিতে ছিল উত্তর ভিয়েতনামের সৈন্যরা দক্ষিণ ভিয়েতনামে অবস্থান করতে পারবে না, এবং এই কারণে যুদ্ধবিরতি শুরু

হওয়ার আগেই দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজারের বেশি উত্তর ভিয়েতনামের সৈন্যদের অপসারণের উপর তিনি বিশেষভাবে জোর দেন। তাছাড়া তিনি আরো বলেন যে এক আন্তর্জাতিক সংগঠনই যুদ্ধবিরতির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে নিজের তত্ত্বাবধানে রাখবে। এই আলোচনা চলাকালীন, হ্যানয় বেতার হঠাৎ করে প্যারিসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে গোপন আলোচনার কথা ফাঁস করে দেয় এবং এর দরুন উত্তর ভিয়েতনাম নেতৃত্বের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নেতৃত্বের এক ভয়ানক মতভেদ সৃষ্টি হয়।

এইভাবে মেকং জলের ধারা অনেক দূর প্রবাহিত হওয়ার পর, অবশেষে ১৯৭৩ সালের ৭ই জানুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর ভিয়েতনামের মধ্যে আবার শান্তির আলোচনা শুরু হয়। এই আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। ১৯৪৫ সালে জেনিভা চুক্তি অনুযায়ী ভিয়েতনাম দুই অংশের মধ্যে অস্থায়ী সামরিক বিভাজন রেখা ও অস্থায়ী সীমান্ত অংশের মধ্যে অবাধ যাতায়াতের অধিকার স্থাপন করা। ইতিমধ্যে ১৪ই নভেম্বর ১৯৭২ সালে এক গোপন চিঠিতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিকস্‌ন সায়গনের থিউ (Thieu) সরকারকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে হ্যানয় চুক্তির শর্ত পালন না করলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে দ্রুত সামরিক অভিযান চালাবে। এই দৃঢ় আশ্বাসের পরেই থিউ প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে সম্মত হন এবং এর ফলে অবশেষে ১৩ই জানুয়ারি ১৯৭৩ সালে প্যারিস খসড়া চুক্তি চূড়ান্ত রূপ নেয়।

৭৮.১৩ প্যারিস চুক্তি

১৯৭৩ সালে ২৭শে জানুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম (Democratic Repulic of Vietnam), ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্র (Republic of Vietnam) এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বৈপ্লবিক সরকারে মন্ত্রীদের মধ্যে এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত ও সেই দিনই বলবৎ হয়। এই চুক্তির মুল অংশগুলি হল নিম্নরূপঃ

(ক) ১৯৫৪ সালের জেনিভা চুক্তি অনুযায়ী সব দল ভিয়েতনামের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, একতা এবং আঞ্চলিক সংহতি মান করবে।

(খ) ১৯৭৩ সালের ২৭শে জানুয়ারী সমগ্র ভিয়েতনামে যুদ্ধবিরতি শুরু হবে। দক্ষিণ ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্র ও তার অস্থায়ী বৈপ্লবিক সরকারের প্রতিনিধি এক যৌথ সামরিক সংগঠনের মাধ্যমে অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সব বিবাদ নিষ্পত্তি করবে। চুক্তি রূপায়ণের ৬০ দিনের মধ্যে সমস্ত মার্কিন ও মিত্রশক্তিগুলিকে তাদের ঘাঁটি সহ অপসারিত করতে হবে, এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামে সামরিক শক্তি এবং অন্যান্য সরঞ্জামের পুনঃপ্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।

(গ) ৬০ দিনের মধ্যে সমস্ত যুদ্ধবন্দিদের মুক্ত করতে হবে এবং উভয় পক্ষের দ্বারা যুদ্ধকালীন নিরুদ্দেশ সৈনিকদের বা তাদের কবর চিহ্নিত করতে হবে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে আটক সমস্ত অসামরিক বন্দীদের মুক্তি উভয়পক্ষের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্থির করতে হবে।

(ঘ) রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের মানুষের অধিকার দৃঢ় করতে হবে। আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে সাধারণ নির্বাচন সংগঠিত করার জন্য এক জাতীয় পরিষদ (National Council for National Reconciliation and Concord) গঠন করতে হবে। এই পরিষদটি নিরপেক্ষ সমেত তিনটি সমান অংশে বিভক্ত থাকবে এবং এর সিদ্ধান্ত হবেই সর্বসম্মত।

(ঙ) ভিয়েতনামের দুটি অংশ শান্তিপূর্ণ চুক্তির মাধ্যমে পুনর্মিলিত হবে তাদের মধ্যে সামরিক অবস্থানহীন অংশকে (Demilitarised Zone) দুই ভিয়েতনামের মধ্যে এক অস্থায়ী সামরিক বিভাজন রেখা রূপে চিহ্নিত করা হবে। এই অংশটি উভয় পক্ষের দ্বারা মান্য করা হবে, কিন্তু সাধারণ নাগরিকের গতিবিধি দুপক্ষের চুক্তির মধ্যে দিয়ে স্থির করা হবে।

(চ) শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের ৩০ দিনের মধ্যে ১৩ জন সদস্যবিশিষ্ট এক আন্তর্জাতিক সমাবেশের আয়োজন করতে হবে। এই ১৩ জন সদস্য প্রতিনিধিত্ব করবে যথাক্রমে চার দলীয় যৌথ সামরিক নিয়োগ, দক্ষিণ ভিয়েতনামের দ্বিদলীয় যৌথ সামরিক নিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক নিয়োগের (Commission) মধ্যে থেকে।

(ছ) আত্মপক্ষ নিরূপণের বা আত্মনির্ধারণের (Self-determination) অধিকার ও কাম্বোডিয়া এবং লাওসের নিরপেক্ষতা পুনরায় অধিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাছাড়া, আরো স্থির হয় যে এই দেশগুলিতে কোন বৈদেশিক শক্তির সামরিক ঘাঁটি বা সামরিক অস্ত্রশস্ত্র বজায় রাখা চলবে না।

(জ) চিরাচরিত নীতি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র ভিয়েতনাম যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি এবং ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্র ও সমগ্র ইন্দোচীনের যুদ্ধোত্তর পুনর্নির্মানের ব্যয়ভার গ্রহণ করবে।

(ঝ) সমস্ত স্বাক্ষরিত প্রতিনিধি আক্ষরিকভাবে এই চুক্তির রূপায়ণে সহায়তা করবে।

পরিশেষে বলা যায়, এই ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রভাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের মানসিকভাবে বিচলিত করেছিল যে জেনারেল Westmoreland তা এক উক্তির মাধ্যমে যথাযত বর্ণনা করেছেন— "No bells rang, no banks paraded few turned out to cheer."

৭৮.১৩.১ প্যারিস চুক্তির অবমাননা

প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর এই চুক্তি অনুযায়ী ঠিক ঠিক ভাবে চুক্তির রূপায়ণ সম্ভব হয়নি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকারে অনমনীয় এবং অভিন্ন আচরণের দরুন। ইহা সত্য যে ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী মাসে স্বাক্ষরিত প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামের স্বাধীনতা, সার্বভৌমতা, ঐক্য ও ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে যেমন স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল, তেমনি অস্থায়ী বৈপ্লবিক সরকার (PRG) ও তার সৈন্যবাহিনী এবং মুক্তাঞ্চলের অস্তিত্বও তারা মানতে বাধ্য হয়েছিল। এর দরুন ১৯৭৩ সালের ২৭শে মার্চ-এর পর থেকে প্রায় সমস্ত মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করা শুরু হয়। কিন্তু এই সেনা প্রত্যাহার মানে এই নয় যে ওয়াশিংটন দক্ষিণ ভিয়েতনামে সমস্ত স্বদেশপ্রেমী ও বিপ্লবী শক্তিতে ধবংসের বা নয়া সাম্যবাদী শাসকগোষ্ঠীকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত ত্যাগ করেছিল।

৭৮.১৪ ভিয়েতনাম জনগণের ১৯৭৫ সালের মহাবিজয়

মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সন, হেনরী কিসিঞ্জার, থিউ এবং অন্যান্য বিবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে স্বাক্ষরিত প্যারিস চুক্তি পুরোপুরি রূপায়ণ করার পরিবর্তে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সায়গন সরকার শেষ পর্যন্ত সামরিক সমাধানের পথকেই ভিয়েতনাম যুদ্ধের শেষ পথ হিসাবেই বেছে নিয়েছিল। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ এই দুই বছরে মধ্যে উত্তর ভিয়েতনাম ও অস্থায়ী বৈপ্লবিক সরকারে সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মার্কিন মদতপুষ্ট সায়গন সরকারে মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়। এই দুই বছরে মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ষাট হাজার ভিয়েতনামী সৈন্যের মৃত্যু হয় এবং আড়াই লক্ষের মত জনসাধারণ আহত হয়—১৯৭৩ সালের প্যারিসে গৃহীত যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরেও। এই দুই বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সায়গন সরকার এই যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সর্বাপেক্ষা ও তীব্রতর পরাজয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। এই সময়ের মধ্যে উত্তর ভিয়েতনামের মুক্তিবাহিনী ক্রমশ একের পর এক সায়গনের সামরিক ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করতে থাকে এবং শেষে দখল করে নেয়। ভিয়েতনামের এই মুক্তির সংগ্রাম সারা পৃথিবীর জনগণকে বিশেষভাবে উদ্বেলিত করেছিল। যদিও দক্ষিণ ভিয়েতনামের থিউ (Thieu) সরকার ও মার্কিন প্রশাসন ব্যাপক অথচ ব্যর্থ প্রচারের মাধ্যমে নিজেদের সাফল্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, অবশেষে এক সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও লড়াইয়ে পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মাথা নিচু করে ফিরে গিয়েছিল ভিয়েতনামের মাটি থেকে এবং ভিয়েতনামের মুক্তিবাহিনী তাদের বিজয় পতাকা শেষ পর্যন্ত ৩০শে এপ্রিল ১৯৭৫ সালে সায়গনের রাজপ্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ফলে শেষ পর্যন্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীর পেশীশক্তির তীব্র আস্ফালন পরাস্ত হয়েছিল ছোট্ট এবং দরিদ্র একটি দেশের দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধার কাছে। অবসান হয়েছিল এক সুদীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাস।

এই দীর্ঘ লড়াইয়ের ইতিহাসে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল দুই পক্ষেরই ও তার অঙ্কের পরিমাণ ছিল ভয়াবহ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধজয়ের জন্য যে পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র ও বোমাবর্ষণ করেছিল, তা ছিল সমগ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রের চেয়েও অধিক। ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৭৩-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত ভিয়েতনামে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ মার্কিন সেনা এসেছিল এবং তার মধ্যে প্রায় ৫৮ হাজার সৈন্য সেখানেই মারা যায়। ওয়াশিংটনে ভিয়েতনাম মেমোরিয়ালের দেওয়ালে উৎকীর্ন সেই ৫৮ হাজারের নাম এখনও সে দেশের মানুষের অন্তরে ভিয়েতনাম যুদ্ধের তিক্ত স্মৃতি উস্কে দেয়। সেই সঙ্গে ভিয়েতনামের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিখোঁজ ২০২৯ জন মার্কিন সেনা, অফিসার ও জঙ্গি বিমানের পাইলটের সন্ধান এখনও পর্যন্ত মার্কিন সরকার চালিয়ে যাচ্ছে।

এই ভিয়েতনাম যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দুই পক্ষেরই ছিল ব্যাপক। প্রায় ২ লক্ষ ৮২ হাজারের মতো সামরিক ব্যক্তি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের যৌথ হিসেবে) নিহত হয়। তাছাড়া ভিয়েতনামের সামরিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৬ লক্ষ ৬৬ হাজারের বেশি এবং সাধারণ জনগণের মৃত্যুর সংখ্যাও ছিল কম নয়, বিশেষ করে উত্তর ভিয়েতনামে এই সংখ্যা ছিল ৬৫ হাজারেরও বেশি ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে ৩ লক্ষের অধিক। এই যুদ্ধে ভিয়েতনামের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সত্যই অস্বাভাবিক ছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধজয়ে জন্য

নানারকম কৌশল অবলম্বন করেছিল। যেমন একদিকে তারা ব্যবহার করেছিল নেপাম বোমার মতো এক বিধবংসী অস্ত্র, তেমনি আরেক দিকে ব্যবহার করেছিল নানারকম রাসায়নিক ক্ষতিকারক দ্রব্যেরও। ফলে আজও সেখানে মানুষ ভুগছে যুদ্ধের সময় মার্কিন বিমান থেকে ফেলা রাসায়নিক বোমার প্রতিক্রিয়াজনিত অসুখে। ভিয়েত কং গেরিলাদের আশ্রয় ঘন জঙ্গল নির্মূল করতে ভিয়েতনামের জঙ্গল ও গ্রামে গ্রামে মার্কিনা নির্বিচারে বিমান থেকে ডি-অরেঞ্জ রাসায়নিক ফেলেছিল। মাটিতে ও বৃষ্টির জলে সেই রাসায়নিক মিশে এলাকার পানীয় জলকেও বিষাক্ত করে তুলেছিল। ফলে এখনও তা থেকে গ্রামের মানুষ নানা রোগে ভুগছেন। যুদ্ধের পর জন্ম নেওয়া শিশুদের শরীরেও ধরা পড়েছে এইসব বিষাক্ত রাসায়নিকের প্রতিক্রিয়ায় নানারকম দুরারোগ্য ব্যাধি। তাই বলা যায় ভিয়েতনামের মতো দরিদ্র, অনুন্নত ক্ষুদ্র দেশের কাছে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী, শিল্পোন্নত ও সামরিক শক্তিতে বলিয়ান দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও মানসিক পরাজয় ইতিহাসের পাতার সমস্ত কাহিনীকে সম্পূর্ণ উল্টে পাল্টে দেয়। তাই ভিয়েতনামে মার্কিন ব্যর্থতা ও সেখান থেকে তার পশ্চাদসরন প্রাথমিকভাবে বিপদ সংকীর্ণ পৃথিবীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি অক্ষম রাষ্ট্ররূপে প্রতিপন্ন হয়।

৭৮.১৫ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম যুদ্ধে ব্যর্থতার ইতিহাস

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরাজয়ের মূল কারণগুলি কি? ইহা অত্যন্ত জরুরী ও বড় প্রশ্ন থেকে যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম যুদ্ধের কি দরকার এবং বাধ্যতামূলক ছিল? ইহা কি জয়সূচক যুদ্ধ ছিল, কি ছিল না? এইসব প্রশ্নের মূল উত্তরগুলি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয়ের মূল কারণগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম যুদ্ধের যোগদানের বীজ লুকিয়ে ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী দুটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে পুরোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভাঙ্গন ও ঠাণ্ডাযুদ্ধ। ১৯৪০-এর দশকে ভিয়েতনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ১৯৪৯ সালের পর থেকে ভিয়েতনাম নীতি যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তা হল যদি ভিয়েতনাম কমউনিস্টদের কাছে নতি স্বীকার করে, তাহলে মার্কিনদের বৃহত্তর স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। ১৯৪৯ সালের চীনের পতন ও কমউনিস্ট চীনের আবির্ভাব ও ওয়াশিংটনের বিদেশনীতির রদবদল এবং তার সাথে জাতীয় সুরক্ষা সমিতির (National Security Council) বা NSC-৬৮ এর বিশ্বমত ভিয়েতনামের গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিকাররা তখন মনে করেছিলেন যে সোভিয়েট, পুর্ব ইউরোপ ও চীনের রাজনৈতিক প্রভাব যথেষ্ট সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবং তার ক্ষমতা বিস্তারে সুযোগ আর দেওয়া যাবে না। মার্কিন শাসকরা মনে করতেন যে ক্রেমলিনের অধীনে আর ক্ষমতা বৃদ্ধি হলে, শেষে এমন কোন জোটই পাওয়া যাবে না যা শেষ পর্যন্ত ক্রেমলিনকে পর্যদুস্ত করতে পারে। ফলে সাম্য বজায় রাখা খুব কঠিন হয়ে পড়বে এবং Zero Sum game-এর তত্ত্ব অনুযায়ী সোভিয়েট ইউনিয়নের জয় মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয়। ভিয়েতনামের আমেরিকার নীতিতে গুরুত্ব লাভের পশ্চাতে আরও একটি নির্দিষ্ট কারণ ছিল যেমন—কর্তৃত্ব

(Domino) তত্ত্ব (Theory)। এই তত্ত্ব মতে ভিয়েতনামের পতনে, ইন্দোচীনের পতন বা ধ্বংস হতে পারে এবং এইভাবে পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পতন ও পশ্চিমে এই পতনের পরবর্তী প্রভাব ভারতে ও পূর্ব জাপান ও ফিলিপিন্সের উপর পড়বে। ফলে সেখানে থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সরে গেলে এক ভীষণ শূন্যস্থানের সৃষ্টি হবে এবং তা কমিউনিস্ট শক্তিবৃদ্ধির বিশেষ সুবিধা করে দেবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনামের (Containment) নীতি অসফল ছিল। আমেরিকা ভিয়েতনাম যুদ্ধের আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংকীর্ণ একক বিশ্বনীতি স্থানীয় শক্তির প্রাধান্য ও গুরুত্ব বুঝতে ভুল হয়েছিল। এখানেই পরাজিত হয়েছিল তাদের দূরদর্শিতা সূক্ষ্মতার অভাব। তাদের এই যুদ্ধ ছিল স্ব-আরোপিত এবং তার তাৎপর্য ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন স্বভাবতই থেকে যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ধারণাগুলি কি যথাযথ? কমিউনিজমের প্রসার রোধ করতে তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থানকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে যুদ্ধ কি প্রয়োজনীয় ছিল? চূড়ান্তরূপে এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ মার্কিন সরকার নিজেরাই জানত না যে ভিয়েতনামে হস্তক্ষেপ না করলে কি হত? এটা সাধারণভাবে অনুমান করা যায় যে কোন এক প্রকার যুদ্ধ হতই এবং ভিয়েতনাম কোন শক্তির দ্বারা চালিত হয়ে সংঘবদ্ধ হত। কিন্তু তাতে কি কোন আগ্রাসন কি হত? নিশ্চিতভাবে তা একেবারেই বলা সম্ভব নয়। বরং এইক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সত্তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভুলভাবে ধারণা করেছিল এবং তারা সম্ভাব্য ফলাফলে কমিউনিস্টদের জয়কে অতিরিক্ত বেশি মাত্রায় গুরুত্ব দিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিভিন্ন সরকারকে রাজনৈতিক ও সামরিক সাহায্য ছিল এক মারাত্মক বৈদেশিক চালের ভুল। সময়ের সাথে সাথে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে দক্ষিণ ভিয়েতনামকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দখল করার ইতিহাসের প্রচেষ্টা ছিল সম্পূর্ণ দুর্বল ভিত্তির উপর নির্ভর করে। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের দিয়াম (Diem), থিউ (Thieu) ইত্যাদি সরকারগুলি ছিল সম্পূর্ণরূপে অ-কমিউনিস্ট, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে একটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে সেই দেশের লোকেদের নিজের দেশের প্রতি কোনরূপ ভালোবাসা ছিল না। এই দেশের শাসনব্যবস্তা সংকীর্ণ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং দেশের লোকেদের নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রায়ই ছিল না। ফরাসিরা যখন এই দেশ ছেড়ে চলে যায়, তারা এহ দেশের পুরাতন রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে যায়। এর ফলে এখানে কোন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে এমন কেউ নেতৃত্বে ছিল না যা রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এর ফলে এখানে কোন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে এমন কেউ নেতৃত্বে ছিল না যা রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। উপরন্তু এই দেশে অনেক জাতি, ধর্ম ও ভেদাভেদ ছিল। উল্টো দিকে উত্তর ভিয়েতনামের চিত্রটা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ফরাসি ঔপনিবেশিকতাবাদকে পরিহার করতে এবং বহু শতক থেকে বিচ্ছিন্ন দেশকে সংঘবদ্ধ করতে ভিয়েতনামে একটি বিপ্লবের উদগমন/সূচনা হয়েছিল। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও সংগ্রাম করার সময় একটি বিপ্লবের রেশ/ধারা জনপ্রিয় হয়েছিল জনগণ ও দেশীয় নেতাদের মধ্যে। হো চি মিন ভিয়েতনামে জাতীয় স্বাধীনতার উন্মাদনার ক্ষেত্রে প্রতীকরূপে স্থাপন করেছিলেন নিজেকে, যেমন জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার বিপ্লব প্রসারের ক্ষেত্রে এক মহান স্থান অর্জন করেছিলেন। ফ্রান্সকে আমেরিকার প্রচুর সাহায্যপ্রদান সত্ত্বেও, ১৯৫৪ সালে হো চি মিনের ভিয়েতনাম ফরাসিদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ব্যর্থ করেছিল। ইহাই সম্ভবত ১৯৫৪ সালের পরে ভিয়েতনামকে আরো সংঘবদ্ধ করে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তির

প্রয়োগ ও দূরদর্শিতার অভাব এই উত্তর ভিয়েতনাম জনগণের প্রতি, ছিল মার্কিন বৈদেশিক নীতির এক নিদারুণ ভুল মূল্যায়ন ও করুণ পরাজয়ের ইতিহাস।

তৃতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরাজয়ের আরেকটি মূল কারণ ছিল গঠিত রণনীতির অভাব। শুধু বোমাবর্ষণ ও হাজার হাজার সৈন্য দিয়ে প্রায় ২০,০০০ মাইল দূরে কোন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় যে সম্ভব নয় এই ভাবনাটুকুও মার্কিন সমরবিদদের মনে একেবারের জন্য মনে আসেনি। তাছাড়া ভিয়েতনামের গুণগত ও বিশেষ রণকৌশল পদ্ধতি অর্থাৎ গেরিলা যুদ্ধের প্রক্রিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিজ্ঞতা এই যুদ্ধ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত একটি বিশেষ কারণ হয়ে দাঁড়ায় এই লড়াইয়ের রণক্ষেত্রে। গেরিলা যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে এটা ছিল একপ্রকার যুদ্ধ যেখানে কোন নিশ্চিত লক্ষ্য ছিল না এবং জয়-পরাজয় বিষয়গুলো একেবারেই পরিষ্কার ছিল, এই ধরনের যুদ্ধ মার্কিনদের ক্ষেত্রে খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায় কারণ তারা চিরাচরিত যুদ্ধে অভ্যস্ত ছিল।

চতুর্থত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাসায়নিক অস্ত্র, আধুনিক মারণাস্ত্র নাপাম বোমা, আধুনিক যুদ্ধের সব অস্ত্র প্রয়োগ ও মিলিটারি শক্তি অপব্যবহারের দরুন হাজার হাজার মানুষের জীবনহানির এক ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলেছিল সারা পৃথিবীতে এবং বিশেষ করে মার্কিন জনগণের উপর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এর দরুন ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯৬৪ সালে। শুরুতে উত্তর ভিয়েতনামের জন্য ঔষধপত্র দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই আন্দোলনের জন্ম। ধীরে ধীরে বিক্ষোভ ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে এই আন্দোলনের গতির ধারা আরও বাড়ে। ১৯৬৫ সালের আগষ্ট মাসে স্টুডেন্ট পীস ইউনিয়ন, সোসাইটি অফ ফ্রেন্ডস্, উইমেনস্ ইন্টারন্যাশনাল লীগ ফর পীস অ্যান্ড ফ্রিডম, সোসালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি, ইয়ং সোসালিস্ট, স্টুডেন্টস ফর এ ডেমোক্রেটিক সোসাইটি সহ প্রায় ৩০টি যুদ্ধবিরোধী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে ভিয়েতনাম যুদ্ধ থামানোর জন্য তৈরি হয় জাতীয় সমন্বয় সমিতি (National Coordinating Committee) যার মূল উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধবিরোধী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা। শেষে এই আন্দোলনের মাত্রা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের মধ্যে। মার্কিনী এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতীকী প্রতিবাদ হিসাবে বহু মার্কিন নাগরিক সরকারকে রাজস্ব দান বন্ধ করেন। ১৯৭১ সালের ২৪শে এপ্রিল হাজার হাজার মানুষ মার্কিন কংগ্রেস অভিমুখে অভিযান করেন যুদ্ধবিরোধী শ্লোগান দিয়ে এবং শেষে ক্যাপিটাল ভবনের মেঝেয় এঁকে দেওয়া হয় শান্তির প্রতীক চিহ্ন। ফলে উত্তাল হয়ে ওঠে সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ ও সংবাদপত্র মাধ্যমগুলি। এই আন্দোলনের দরুন, মার্কিন সরকার তার ব্যর্থতাকে ঢাকতে শেষ পর্যন্ত মার্কিন জনমতকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। যুদ্ধবিরোধী এই জটিল বিপ্লব গণমাধ্যম বাধ্য করে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনসন ও নিক্সনকে ভিয়েতনামে মার্কিনী হস্তক্ষেপ থেকে বিরত হতে। সার্বিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরাজয়ের জন্য গণমাধ্যম ও যুদ্ধবিরোদী আন্দোলনকে মূল দোষী হিসাবে দায়ী করা হয়— কিন্তু তা অযথা মিথ্যাচার বলে আমার মনে হয়। তাই পরিশেষে এই কথা বলা যায় যে মার্কিন সরকার ভিয়েতনামের শক্তি ও মনোবলকে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি। তাই বুঝে নিতে পারেনি যে ভিয়েতনামের জনসাধারণ কোন শক্তিশালী দেশের বিরুদ্ধে এমনভাবে রুখে দাঁড়াবে। উত্তর ভিয়েতনামের লোকেরা শুরু থেকে যুদ্ধের চেয়ে বেশি উৎসাহী ছিল শক্তিশালী দেশ গড়ে তোলার স্বার্থে। তারা শক্তভাবে নিজেদের

লক্ষ্যের দিকে নিজেদের চালনা করেছিল, তারা নিজেদের দেশে নিজেদের পরিচিত মাটির উপর দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। এই সেই সমস্ত যুদ্ধনীতি ব্যবহার করেছিল যেগুলো তারা ফরাসিদের বিরুদ্ধে আগে ব্যবহার করেছিল। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতিকে জনসাধারণের মনে এক জনপ্রিয় অবিশ্বাসের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করেছিল। আর এখানেই হল মার্কিন সরকারের দূরদর্শিতার অভাব ও পরাজয়ের মূল কারণগুলি।

৭৮.১৬ ভিয়েতনামের আবির্ভাব নবরূপে

১৯৭৫ সালে ৩০শে এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরাজয়ের পর অনেক জল গড়িয়ে যায় ভিয়েতনামের ইতিহাসের পাতায়। এই যুদ্ধের শেষে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারে মধ্যে নতুন করে আলোচনা শুরু হয় সমগ্র ভিয়েতনামের পুণর্মিলনের বিষয় নিয়ে। বেশ কয়েক দফা আলোচনার পর দুপক্ষের সম্মতিতে ১৯৭৬ সালের ২৫শে এপ্রিল জাতীয় পরিষদ গঠনের জন্য এক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে মোট ৪৯২টি আসনের মধ্যে ২৪৯টি উত্তর এবং ২৪৩টি দক্ষিণ ভিয়েতনামের জন্য বন্টনের স্থির হয়। ফলে প্রায় কয়েক দশক পরে এই নির্বাচনের মাধ্যমে সমগ্র ভিয়েতনামে শান্তির বাতাবরণ আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। অবশেষে নব নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে ২৪শে জুন ১৯৭৬ সালে। এই নব নির্বাচিত অধিবেশনে ভিয়েতনামের প্রায় সব পক্ষের মানুষই উপস্থিত ছিলেন। এই অধিবেশনে পুণর্মিলনের বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ২রা জুলাই ১৯৭৬ সালে সমাজতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক ভিয়েতনামের (Socialist Republic of Vietnam) আবির্ভাব হয় দুই ভিয়েতনাম মিলনের ফলে। এই নতুন ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন Ton Due Thang এবং প্রধানমন্ত্রীরূপে নির্বাচিত হন ফাম ভান দং (Pham Van Dong)। এরপর শুরু হয় যুদ্ধবিধবস্ত ভিয়েতনামের পুনঃগঠনের প্রয়াস ও স্তব্ধ হয় এক দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। সেই সঙ্গেও অবসান হয় কয়েক শতাব্দী ধরে বৈদেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে এক সংগ্রামী লড়াইয়ের ইতিহাস।

৭৮.১৭ সারাংশ

আমেরিকার ভিয়েতনামের মাটিতে পদার্পণে (ফরাসিদের বদল) এই অঞ্চলের সমগ্র রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ অদল-বদল করে দেয়। ১৯৬৩ তে দিয়েমের পতনের তিন সপ্তাহ পর ম্যাকনামারাকে নতুন পর্যায়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামের যুদ্ধ শুরু করার নির্দেশ দিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জন কেনেডি ওয়াশিংটন ত্যাগ করেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামের নতুন রাষ্ট্রপ্রধান দং ভ্যান মিন আসার পরও দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কোন বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। ফলে সন্ত্রাস আবার শুরু হয় দক্ষিণ ভিয়েতনামে সৈন্যদের সাথে ভিয়েত কং গেরিলাদের মধ্যে। ১৯৬৪ সালে আবার এক সামরিক-অভ্যুত্থানের ফলে দং ভ্যান মিনকে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে হয়।

ফরাসি রাষ্ট্রপতি দ্য গলের 'ইন্দোচীনের নির্জীবিকরণ' সমাধানের প্রস্তাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জনসন প্রত্যাখান করলে গাল্‌ফ অব টনকিন-এর সমস্যার উদ্ভব হয়।

১৯৬৭ সালে দক্ষিণ ভিয়েতনামে অবস্থিত মার্কিন উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা যুদ্ধ পরিচালনার সন্তোষ প্রকাশ করে। এর ফলে জনসন তার দেশের জনগণকে ভিয়েতনামে সামরিক পরিস্থিতির সন্তোষজনক প্রগতির কথা পরিবেশন করে। তখন মনে হয়েছিল শীঘ্রই এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান হবে। কিন্তু এই অবস্থার হঠাৎ পরিবর্তন হয়। যখন ভিয়েত কং ১৯৬৬ সালে ৩১শে জানুয়ারী থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে টেট (Tet) আক্রমণ শুরু করে। এতে মার্কিন শাসনতন্ত্র ভীষণভাবে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই টেট আক্রমণের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল যে এটি ভিয়েতনামের প্রতি মার্কিন নীতির এক নতুন দিকের উন্মোচন। তাই মার্কিন শাসনব্যবস্থা তার দক্ষিণ ভিয়েতনামের সামরিক নীতির এক বিকল্প পথের সন্ধান করতে শুরু করে। ইতিমধ্যে মার্কিনরা দক্ষিণ ভিয়েতনামের উপর আরো দায়িত্ব দিতে শুরু করে। জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ড এই কাজের প্রক্রিয়ার নাম দিলেন "অপসারণ নীতি" (Wihdrawal Srategy)। কিন্তু এই নীতির রূপায়ণ শুরু হয়েছিল রাষ্ট্রপতি নিক্সনের শাসনকালেই।

ইতিমধ্যে হ্যানয় সরকার ঘোষণা করে যে, ভিয়েতনামী জনগণ যথাযথ ও যুক্তিপূর্ণ দাবিগুলো মেটালে পরেই ভিয়েতনামের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান হতে পারে। ১৯৬৫ সালে জাতীয় অধিবেশনে সরকারে পক্ষ থেকে উত্তর ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফাম ভান ডং (Pham Van Dons) কিছু দাবি প্রস্তাব করেন এবং সেইগুলির মধ্যে বিশেষ করে উলেখযোগ্য হল (ক) ভিয়েতনামী জনগণের জাতীয় অধিকারগুলির স্বীকৃতি;

(খ) শান্তি, স্বনির্ভরতা, সার্বভৌমত্ব, ঐক্য, আঞ্চলিক সংহতি ইত্যাদি;

(গ) দক্ষিণ ভিয়েতনামের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সেখানকার জনগণের দ্বারাই নিধারিত করতে হবে, এবং তা নির্ধারিত হবে দক্ষিণ ভিয়েতনাম জাতীয় মুক্তিবাদী মোর্চা (South Vietnam National Front for Liberation)-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী, বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই;

(ঘ) বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই এই দুই অঞ্চলে ভিয়েতনাম জনসাধারণের দ্বারাই ভিয়েতনামের শান্তিপূর্ণ পুনর্মিলন স্থাপিত হবে।

এই উপরের প্রস্তাবগুলি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের (DRV) মতে একমাত্র ভিয়েতনামে শান্তি আনার এই পুনর্মিলনের জন্য উপযুক্ত শর্তাবলী সৃষ্টি করার যুক্তিপূর্ণ সমাধান। এই কারণেই উত্তর ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি হো চি মিন বলেছিলেন যে তার দেশ তখনই ভিয়েতনাম যুদ্ধের উপর কোন চুক্তি করতে রাজি হবে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কমিউনিস্ট সরকারের এই চতুর্মুখী প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করবে।

এই অবস্থায় দক্ষিণ ভিয়েতনামে এই সরকারের বিরুদ্ধে এক বহুবিস্তৃত জনরোষ দেখা যায়। অন্যদিকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনসন রক্তক্ষয়ী ভিয়েতনাম যুদ্ধের লম্বা ইতিহাস মার্কিন জনসাধারণের মধ্যে যে বিভেদ এবং বিদ্বেষ ও সরকারের ব্যর্থ ও হতাশাজনক ভিয়েতনাম নীতিতে বিশেষ চিহ্নিত হয়। নানা উপদেষ্টাদের সাথে আলোচনার পর ১৯৬৮ সালে তিনি এমন এক অভুতপূর্ব কঠোর এবং নাটকীয় সিদ্ধান্তের ঘোষণা করলেন যে শুধু মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রকেই নয়, সমগ্র বিশ্বকে হতবাক ও স্তম্ভিত করে দেয়। এই সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে চারটি প্রধান সিদ্ধান্ত হল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং তা হ'ল ঃ

(ক) ভিয়েতনামে অবস্থিত মার্কিন সামরিক শক্তি যে অতিরিক্ত সৈন্যদল চেয়েছিল, তার উত্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নামেমাত্র কলেবর বৃদ্ধি করে।

(খ) ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রাথমিক দায়িত্ব হিসাবে রাষ্ট্রপতি জনসন দক্ষিণ ভিয়েতনামের সামরিক শক্তির বিস্তার ও উন্নতিসাধন করবেন।

(গ) তিনি আরেকবারের জন্য দলের মনোনীত রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করবেন না।

(ঘ) শান্তি ত্বরান্বিত করার জন্য তিনি উভয় ভিয়েতনামের অধিকাংশ অঞ্চলের উপর অমানবিক বোমাবর্ষণ বন্ধ করবেন।

১৯৬৮ সালের ১৩ই মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর ভিয়েতনামের মধ্যে ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু হয় প্যারিসে। এই দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ফল প্রাথমিকভাবে খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। প্রথম থেকে দু পক্ষের অনড় মনোভাব নিজ নিজ চিন্তাধারায় ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি দানের তীব্র বিরোধিতা দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবিক সরকারকে (Provisional Revolutionary Government বা National Liberation Front) এই আলোচনায় বেশিদূর এগাতে দেয়নি। তাছাড়া মার্কিন সরকারের ক্রমবর্ধমান বোমাবর্ষণ সমগ্র ভিয়েতনামে, এই আলোচনাকে বিশেষভাবে ব্যাহত করে। অবশেষে অনেক আলাপ-আলোচনার পর, ১৯৬৮ সালে ৩১শে অক্টোবর রাষ্ট্রপতি জনসন ঘোষণা করেন যে ১লা নভেম্বর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধে আগ্রহী।

ইতিমধ্যে ১৯৬৯ সালে জানুয়ারি মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসনের জায়গায় রিচার্ড নিক্সন ক্ষমতায় আসেন। তিনি ক্ষমতায় এসে প্রথমে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারিমানকে সরিয়ে দেন ও তার জায়গায় ভিয়েতনাম যুদ্ধের আপস মীমাংসার জন্য মূল মার্কিন প্রতিনিধি হিসেবে হেনরি কেবট লজ (henry Cabot Lodge)-কে স্থলাভিষিক্ত করেন। নিক্সন্ ক্ষমতায় আসার পরে এশিয়া ভ্রমণের সময়, গুয়াম (Guam) নামক একটি জায়গায় এক নিজস্ব তত্ত্ব পরিবেশ করেন যা পরবর্তীকালে নিক্স্ন তত্ত্ব হিসাবে পরিচিত হয়। এই তত্ত্বের দ্বারা মার্কিন বিদেশনীতির এক বিশাল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় বিশ্ব ইতিহাসের পাতায়। ৩০শে আগস্ট, ১৯৬৯ সালে, মৃত্যুর ঠিক তিন বছর আগে হো চি মিন (উত্তর ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি) নিক্সনের প্রস্তাবগুলি সম্পূর্ণ বাতিল করে দেন।

১৯৭০ সালের ১৮ই মার্চ-এ কাম্বোডিয়ায় এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং এর দরুন কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপতি নরোদম সিহানুক ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং জায়গায় সামরিক প্রদান লন্ নল (Lon Nol) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুরোপুরি সমর্থনে ক্ষমতায় আসেন। এই সামরিক অভ্যুত্থানে ভিয়েতনামের শান্তির আলোচনার বাতাবরণকে ভীষণভাবে বিঘ্নিত করে।

১৯৭৩ সালে ২৭শে জানুয়ারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক ভিয়েতনাম (Dem. Rep. of Vietnam) ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্র (Republic of vietnam) এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বৈপ্লবিক সরকারে মন্ত্রীদের মধ্যে এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত ও সেইদিনই বলবৎ হয়। এই চুক্তির ঠিকভাবে রূপায়ণ হয়নি মার্কিন ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের অভিন্ন আচরণ ও অনমনীয় ভাবের দরুন।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সন, হেনরী কিসিঞ্জার, থিউ এবং অন্যান্য বিবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে স্বাক্ষরিত প্যারিস চুক্তি পুরোপুরি রূপায়ণ করার পরিবর্তে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সায়গন সরকার শেষ পর্যন্ত সামরিক সমাধানের পথকেই ভিয়েতনাম যুদ্ধের শেষ পথ হিসেবেই বেছে নিয়েছিল। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫— এই দুই বছরে মধ্যে উত্তর ভিয়েতনাম ও অস্থায়ী বৈপ্লবিক সরকারের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মার্কিন মদতপুষ্ট সায়গন সরকারে মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দুই পক্ষেরই ছিল ব্যাপক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম যুদ্ধে পরাজয়ের মূল কারণগুলি মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ঠাণ্ডা লড়াই-এর প্রভাব ও বিশেষ করে ভিয়েতনামবাসীর অনমনীয় মানসিক লড়াই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী লড়াই-এর ইতিহাস ভিয়েতনামের মাটিতে শেষ হয় ৩০শে এপ্রিল ১৯৭৫ সালে। এরপর ১৯৭৬ সালে জুলাই মাসে সমাজতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক ভিয়েতনামের (Socialist Rep. of Vietnam) আবির্ভাব হয় দুই ভিয়েতনাম মিলনের ফলে। এই নতুন ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন ফাম ভান দং (Pham Van Dong)-এর পর শুরু হয় যুদ্ধবিধ্বস্ত ভিয়েতনামের পুনর্গঠনের প্রয়াস ও স্তব্ধ হয় এক দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। সেই সঙ্গেই অবসান হয় কয়েক শতাব্দী ধরে বৈদেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে এক সংগ্রামী লড়াইয়ের ইতিহাস। এই লড়াই-এর ইতিহাস বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

৭৮.১৮ অনুশীলনী

ক। বড় প্রশ্ন ঃ

১। ১৯৫৪ সালের জেনিভা চুক্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২। দ্বিতীয় ইন্দোচীন যুদ্ধের মূল উৎসগুলি কী কী?

৩। দিয়াম শাসনব্যবস্থা ও তার ফলাফল সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪। ভিয়েতনামের মাটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবেশ ও তার ফলাফল সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৫। নিক্সন তত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৬। ১৯৭৩ সালের প্যারিস চুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

৭। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্যারিস চুক্তির অবমাননা আপনি কী মনে করেন অগণতান্ত্রিক? কারণগুলি নিজের ভাষায় যুক্তি সহকারে লিখুন।

৮। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরাজয়ের মূল কারণগুলি কী কী?

৯। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে ভিয়েতনামী জনগণের মানসিক লড়াইয়ের দৃঢ়তা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

খ। সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডমিনো (Domino) তত্ত্ব; জাতীয় মুক্তি মোর্চা (National Liberation Front); ভো নুয়েন গিয়াপ; ভিয়েত কং; বৌদ্ধ বিদ্রোহ; নগো দিন দিয়াম; গালফ্ অব টনকিনের ঘটনা; টেট আক্রমণ; গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের যুদ্ধ শেষ করার শর্তাবলী; ১৯৬৮ সালে রাষ্ট্রপতি জনসনের ঐতিহাসিক ঘোষণা; নিক্সন তত্ত্ব; হো চি মিনের প্রস্তাব; ১৯৭০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আট দফা প্রস্তাব; অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার (Provisional Revolutionary Government); প্যারিস চুক্তি; ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন জনমত; গেরিলা যুদ্ধ; ভিয়েতনাম যুদ্ধের মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ; ভিয়েতনামী মানুষের সংগ্রামী মনোভাব; সমাজতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক ভিয়েতনাম (Socialist Republic of Vietnam)।

৭৮.১৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। Democratic Republic of Vietnam, Foreign Laguages Publishing House, Hanoi 1975.

২। George McT. Kahin, Intervention: How America Became Involved in Vietnam. New york, Knopf, 1986.

৩। Nguyen Khac Vien, Contemporary Vietnam : 1858-1890, Foreign Language Publishing House, Hanoi, 1981.

৪। R.S. Chavan, Vietnam : Trial and Triumph, Patriot Publishers, New Delhi, 1987.

৫। Tridib Chakraborti, India and Kampuchea : A Phase in their relations, 1978-81. Minerva Associates, Calcuta, 1985.

৬। D.G.E. Hall, A History of Southeast Asia, Macmillian, London, 1955.

৭। উইলফ্রেড বার্চেট, ভিয়েতনাম গেরিলাযুদ্ধের কাহিনী, অনুবাদ বিজন চক্রবর্তী, আনন্দধারা প্রকাশন, কলকাতা, ১৩৭৮।

৮। হো চি মিন ও ভিয়েতনাম বিজয়ের পঁচিশ বছর, নন্দন, জুলাই, ২০০০, পৃঃ ৩১-৪৪।

একক ৭৯ □ ইন্দোনেশিয়া

গঠন

৭৯.০ উদ্দেশ্য

৭৯.১ প্রস্তাবনা

৭৯.২ ডাচ ঔপনিবেশিকতা ও ইন্দোনেশীয় জাতীয়বাদ

৭৯.৩ ডাচ উপনিবেশের সম্প্রসারণ

৭৯.৪ ডাচ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সংগ্রাম

৭৯.৫ জাতীয়তাবোধের অনুপ্রেরণা ও চেতনা

  ৭৯.৫.১ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা

  ৭৯.৫.২ ডাচ প্রশাসন ও অর্থনীতি

  ৭৯.৫.৩ ডাচ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ

৭৯.৬ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

  ৭৯.৬.১ প্রথম জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ

  ৭৯.৬.২ পি এন আই

৭৯.৭ জাপানী শাসনের প্রভাব

৭৯.৮ ইন্দোনেশীয় বিপ্লব

  ৭৯.৮.১ ডাচ সমরশক্তির ব্যবহার

  ৭৯.৮.২ আন্তর্জাতিক জনমত ও স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি

৭৯.৯ সারাংশে

৭৯.১০ অনুশীলনী

৭৯.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৭৯.০ উদ্দেশ্য

অধ্যায়ের প্রথম এককটি পাঠ করলে ছাত্রছাত্রীরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম দেশ ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসের যে দিকটি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করবেন তা হ'ল স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পূর্বেকার ঘটনাবলী, বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জন্ম ও তার রূপরেখা। দ্বিতীয় এককে স্বাধীনতা-উত্তর পর্বের ঘটনাবলীর উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

৭৯.১ প্রস্তাবনা

মানচিত্রের দিকে তাকালে এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া এই দুই মহাদেশের মধ্যে এবং ভারত ও প্রশান্ত এই দুই মহাসাগরে সংযোগস্থল অবস্থিত সতেরো হাজারেও অধিক দ্বীপ নিয়ে গঠিত বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দ্বীপপুঞ্জ যা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেই দেশটির নাম ইন্দোনেশিয়া। কেবলমাত্র ভৌগোলিক অবস্থানই নয়, আয়তন, প্রাকৃতিক সম্পদ জনসংখ্যা ও অন্যান্য মাপকাঠির বিচারেও নিঃসন্দেহে ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের বৃহৎ ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলির মধ্যে একটি হিসাবে স্বীকৃতির দাবি করতে পারে। নিরক্ষবৃত্তর এক-দশমাংশেরও বেশি জুড়ে বিস্তৃত দ্বীপগুলির মধ্যে প্রধান হল পাঁচটি—জাভা (Java), সুমাত্রা (Sumara), সুলাওয়েসি (Sulawesi), ইরিয়ান জায়া (Irian Jaya) ও বালি (Bali)। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম দেশ হিসাবেও ইন্দোনেশিয়ায় গুরুত্ব অপরিসীম। আয়তনে সর্বাপেক্ষা বড় না হলেও জাভার স্থান সর্বোপরি। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি হল জাভা উপজাতি গোষ্ঠী (Javanese) যাদের বেশিরভাগই জাভায় বসবাস করে। ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জাভার স্থান যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা উপলব্ধি করা যায়। স্বাধীনতালাভের পূর্বে ও পরবর্তীকালে জাভা উপজাতি গোষ্ঠীর প্রাধান্য ও প্রভাব বরাবরই বজায় থেকেছে। জাভার বাইরে দ্বীপগুলিতে (Outer Islands) বসবাসকারী সংখ্যালঘু উপজাতিদের মধ্যে এই ব্যাপারে অনেকদিন থেকেই একটা অসন্তোষ দানা বেঁধেছে। বেশ কয়েকবার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের ফলে দেশের অখণ্ডতা বিপন্ন হয়েছে। এখনও এই সমস্যা রয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় আদর্শবাণী হল *Bhinneka Tungal Ika* (Unity in Diversity) তিনশোরও বেশি উপজাতি নিয়ে গঠিত এই বিশাল দেশের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল জাতিগত বৈচিত্র্য। বলাই বাহুল্য এই বিরাট বৈচিত্র্যের মাঝে জাতীয় ঐক্যের বুনিয়াদ শক্তিশালী করার প্রয়াস কতখানি ফলপ্রসূ হয় তার উপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার যোগাযোগ ছিল। খ্রিস্টাব্দের শুরুতে মুখ্যত গুজরাট থেকে ভারতীয়দের ইন্দোনেশীয়ায় আগমন হয়। সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে ইন্দোনেশিয়ার ভাষা ও সংস্কৃতির উপর। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কও গড়ে ওঠে। প্রথম থেকে শুরু করে সপ্তম শতকে পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের প্রবেশ অব্যাহত থাকে। একই সঙ্গে ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্ম ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের সকল প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। জাভাবাসীদের প্রত্যেক স্তরের লোকেরাই এই ধর্মগ্রহণ করে। অন্যান্য দ্বীপগুলিতে অবশ্য কেবলমাত্র উচ্চ শ্রেণীর লোকেদের মধ্যেই সুসংগঠিতভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন এবং সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত এই সকল রাজ্যের অধিপতিগণ হিন্দু কিংবা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই কারণবশতঃ ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসে এই সময়কাল হিন্দু রাজত্বকাল (Period of Hindu Kingdoms) নামে পরিচিত। এই যুগ ষোড়শ শতক পর্যন্ত স্থায়ী হয়। আবার সেই সময় হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মজাত সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে স্থানীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ হওয়ায় এই যুগকে হিন্দু-ইন্দোনেশীয় যুগ (Hindu-Indonesian-Period) হিসাবেও ধরা হয়।

তেরো শতকে গুজরাট ও পারস্য দেশ থেকে মুসলমান ব্যবসায়ীরা ইন্দোনেশিয়ায় আসতে শুরু করে ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বাণিজ্য প্রধান লক্ষ্য হলেও এই ব্যবসায়ীরা ইন্দোনেশিয়ায়, বিশেষ করে জাভার

উপকূলবর্তী এলাকায়, ইসলাম ধর্ম প্রচারের কাজে লিপ্ত হয়। পরবর্তীকালে এই ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হিন্দু রাজাদেরও প্রভাবিত করে ও ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হয়। ধর্মান্তরিত রাজাদের মধ্যে প্রথম ছিলেন ডেমাক (Demak) অধিপতি যার প্রচেষ্টার পরবর্তী সময়ে ইসলাম ধর্ম পশ্চিমদিকে সিরেবোন (Cirebon) ও ব্যান্টেন (Banten) এবং পূর্বদিকে জাভার উপর কূল বরাবর গ্রেসিক (Gresik) রাজ্য পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে। শেষ পর্যন্ত ডেমাক সুলতানই শক্তিশালী মাজাপাহিত রাজ্যের পতন ঘটান, মাজাপাহিতের পতনের পর ইসলাম ধর্ম আরও ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ার জনসংখ্যার আশি ভাগের ওপর ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং মুসলিম দুনিয়ায় এই দেশের স্থান প্রথম। প্রসঙ্গক্রমে অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে ইন্দোনেশিয়া ইসলামধর্মীয় রাষ্ট্র নয়।

১৫১১ খ্রিস্টাব্দে মালয় উপদ্বীপের ইসলামধর্মীয় রাজ্য মালাক্কা (Malacca) জয় করার পর্ব পর্তুগীজরা মসলার সন্ধানে ইন্দোনেশিয়ায় পৌঁছয়। তারপর আসে স্পেন দেশীয়রা। পর্তুগীজ ও স্পেন দেশীয়রা খ্রিস্টধর্মের প্রচারে লিপ্ত হয় এবং মিনাহাসা (Minahasa) ও মালুকু (Maluku) অঞ্চলে বিশেষ সাফল্য লাভ করে। সুমাত্রা দ্বীপের উত্তরে অবস্থিত এ্যাচে (Aceh) জাভায় অবস্থিত ডেমাকের সুলতান ও মালুকু দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত টেরনেট (Ternate) অধিপতি পর্তুগীজদের প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে মিলিত হন।

৭৯.২ ডাচ ঔপনিবেশিকতা ও ইন্দোনেশীয় জাতিয়তাবাদ

ইন্দোনেশিয়ায় মসলা ব্যবসা ডাচদেরও আকৃষ্ট করে। ইন্দোনেশিয়া থেকে মসলা ইয়োরোপের বাজারে অনেক দামে বিক্রি করে মুনাফালাভের আশা ডাচদের প্রলুব্ধ করে। ১৬০২ সালে মসলা ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ডাচরা ডাচ ইষ্ট ইনিজয়া কোম্পানি (Dutch East Indies Company) গঠন করে। গভীর সমুদ্রে মসলা ব্যবসায় নিযুক্ত যানসমূহে ঘন ঘন জলদস্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্য সরকারি নির্দেশে যুদ্ধজাহাজগুলি সঙ্গে থাকে। ষোড়শ সতকের গোড়ায় ডাচ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পশ্চিম জাভায় নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করার পর পূর্বদিকের দ্বীপগুলিতে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে কুঠি স্থাপনের কাজে মনোনিবেশ করে। উদ্দেশ্য ছিল পূর্বদিকের দ্বীপগুলি যা মশলা উৎপাদনের প্রধান অঞ্চল সেগুলির উপর সার্বভৌম কর্তৃত্ব স্থাপন করা। ১৬০৫ সালে এ্যমবন (Ambon) ও ১৬২৩ সালে ব্যান্দা (Banda) দ্বীপ দখলের ফলে ডাচরা মসলা ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার স্থাপনে সক্ষম হয়। তার ফলে মশলা বাণিজ্যে দেশের মানুষের হাত থেকে ডাচদের হাতে চলে যায়। ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলিতে তারা ইউরোপীয় বাজারে কাঁচা মালের যোগানদার হিসাবে ব্যবহার করতে থাকে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে সতেরো শতকের শুরু থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অর্থাৎ তিনশো বছরে বেশি সময় ইন্দোনেশিয়া ডাচ ঔপনিবেশিক শাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই ধারণা ভুল কারণ বিংশ শতাব্দীর আগে ইন্দোনেশিয়ার অখণ্ড স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বলে কিছু ছিল না। এই প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা একান্ত আবশ্যক যে, উনিশ শতকের শেষের দিকে অর্থাৎ ডাচরা আসার বেশ কিছুদিন পর ডাচ ঔপনিবেশিক শাসন ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে বিস্তারলাভ করতে শুরু করে। এমনকি জাভা যা ছিল ডাচদের অবস্থানের প্রধান কেন্দ্র, সেখানে পর্যন্ত উনিশ শতকের আগে কোনো জোরালো প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল না। অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলিতে 'ঘাঁটি গেড়ে' বসতেই ডাচদের দুই শতকের বেশি সময় লেগেছে।

প্রথম দিকে ডাচ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্যের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। অন্তত সেই সময় দ্বীপপুঞ্জে সাম্রাজ্য বিস্তার তাদের লক্ষ্য ছিল না। অবশ্য ব্যবসায়ে একচেটিয়া সুবিধার লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হতে ইন্দোনেশিয়ায় সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী জাতি রূপে ডাচরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে। ধীরে ধীরে প্রথমে জাভা দ্বীপ ও পরে দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য অংশ ডাচ শক্তির কবলে চলে আসে। ১৭৯৯ সালে ব্যবসার ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনা ব্যবস্থা ও দুর্নীতি ডাচ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে প্রায় দেউলিয়া করে দেয়। সেই সময় বাটাভিয়াতে অবস্থিত ডাচ প্রশাসন কোম্পানির সকল কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। এইভাবে কোম্পানির সম্পত্তি ও অধীনস্থ সকল এলাকা ডাচ রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসা হয়।

৭৯.৩ ডাচ উপনিবেশের সম্প্রসারণ

উনিশ শতকে ডাচ অর্থনৈতিক স্বার্থের সম্প্রসারণ ঘটে ও সেই কারণে নতুন দায়িত্বভার বহন করার জন্য ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলিতে ডাচ সরকারি প্রশাসনিক ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় করা প্রয়োজন হয়। যোগাযোগের একটা নতুন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়। জাভা ও সুমাত্রায় রেলপথ ও রাস্তা নির্মাণ এবং জাভা ও অন্যান্য দ্বীপগুলির মধ্যে জাহাজে যাতায়াতের ব্যবস্থা.দ্বীপগুলিতে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে। যোগাযোগের এই উন্নতির ফলে এক অভূতপূর্ব অবস্থার সূচনা হয় যা বিভিন্ন দ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন উপজাতির মধ্যে একটা সামগ্রিক ইন্দোনেশীয় জাতিয়তাবোধ গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত করে। ডাচ বিনিয়োগের ফলে ইন্দোনেশিয়ার যে রপ্তানিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল উনিশ শতকে তা এক বিরাট আকার ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন এলাকা দখলের কাজও সমানতালে চলতে থাকে। অর্থাৎ এই সময় থেকে ডাচরা ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলিতে উপনিবেশ স্থাপনে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৮৭০ সালের পর ইন্দোনেশিয়ার যে সকল অংশের উপর ডাচ ব্যবসায়িক নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সেই অঞ্চলগুলিকেও আয়ত্তে আনার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ১৮৭০ থেকে ১৯০৮ দীর্ঘ ও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ এ্যাচে যুদ্ধের (Aceh War) সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সুমাত্রা দ্বীপ ডাচদের অধীনে আসে। বোর্ণিও (Borneo), সেলেবেস (Celebes) এবং মলাক্কাসে (Moluccas) যে সকল অঞ্চল সাধারণভাবে ডাচ সার্বভৌম কর্তৃত্বাধীন ছিল সেই অঞ্চলগুলির উপর শাসনের বাঁধন আরও শক্ত করা হয়। উপরেও কিছু নতুন এলাকাও ডাচরা অধিকার করে নেয়, যেমন ১৯০৬ সালের মধ্যে দক্ষিণ ও মধ্য সেলেবেস, ১৯০৭ সালে সেরাম (Ceram) ও বুরু (Buru) এবং ১৯০৯ সালে টেরনেট (Ternate) এইভাবে ইন্দোনেশিয়ার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ডাচ অভিযান চলতে থাকে। পশ্চিম নিউগিনিকেও (West New Guinea) প্রশাসনিক কাঠামোর অন্তর্গত করা হয়। এইভাবে ১৯১০ সালের মধ্যে উনিস শতাব্দীর শেষভাগে উপনিবেশ সম্প্রসারণের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তা সম্পূর্ণ হয়।

৭৯.৪ ডাচ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সংগ্রাম

ইন্দোনেশীয় জাতিয়তাবোধকে বিংশ শতাব্দীর দান রূপে গণ্য করা যেতে পারে। কারণ বিংশ শতাব্দীর আগে ডাচ শক্তির বিরুদ্ধে যে সকল বিদ্রোহ ও সংগ্রাম দেখা যায় তা বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। এবং এগুলির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কোথাও দ্বীপের যুবরাজ, কোথাও অভিজাত সম্প্রদায়, কোথাও বা ডাচ কবলমুক্ত

নেতারা যাদের লক্ষ্য ছিল একটা রাজ্যকে পুনরুদ্ধার করা বা পুরাতন সমাজব্যবস্থা ধাঁচটিকে ফিরিয়ে আনা। এদের একজনেরও উদ্দেশ্য ছিল না ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলিকে এক রাষ্ট্রে পরিণত করা। পাদ্রি যুদ্ধ (Padri Ware) যা ১৮২১ সালে শুরু হয়ে ১৯৩৭ সালে শেষ হয়, তার নেতৃত্বে ছিলেন মুসলিম মৌলবাদীরা যাদের উদ্দেশ্য ছিল মিনাংকোবাউ (Minangkabau) তে ইসলামী শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা। ১৮২৫ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত দিপোনেগোরো যুদ্ধের (Diponegoro War) নেতৃত্ব দিয়েছিলেন একজন গদীচ্যুত জাভানীয় রাজকুমার, যিনি চেয়েছিলেন মধ্য জাভায় তার মাতারাম (Mataram) রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে। অ্যাচে যুদ্ধের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল অ্যাচেনীয়দের স্বাধীন করা। ১৮৮৮ সালে ব্যানটাম (Bantam)-এর কৃষক বিদ্রোহও পুরোনো ঐতিহ্যে ফিরে পাওয়ার সংগ্রাম অথবা ভূমিসম্বন্ধীয় অসন্তোষ ও বিক্ষোভের উদাহরণস্বরূপ গণ্য করা যায়। আগেই বলা হয়েছে যে এখন পর্যন্ত যে বিদ্রোহগুলির কথা হল সেগুলি ইন্দোনেশীয় 'জাতিয়তাবাদ' বোধ থেকে উদ্ভূত হয়। এগুলি ছিল অঞ্চলভিত্তিক।

৭৯.৫ জাতীয়তাবোধের অনুপ্রেরণা ও চেতনা

৭৯.৫.১ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা

ডাচরা ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলিকে এক ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার অন্তর্গত করে। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের মধ্যে একটি নতুন জাতীয়তাবোধের জন্ম হয়, তা হ'ল ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জকে একই আর্থিক ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা হয়। যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির ফলে দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন এলাকার অধিবাসীদের একে অপরের সংস্পর্শে আসার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল বিংশ শতাব্দীর শুরুতে স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য পাশ্চাত্য (ডাচ) শিক্ষার প্রবর্তন যা তাদের জাতীয়তাবোধকে দৃঢ় করেছিল।

উনিশ শতকের শেষে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে ইউরোপীয় শাসনে জর্জরিত উপনিবেশগুলিতে যে স্বাদেশিকতার জোয়ার দেখা যায় ইন্দোনেশিয়ার জাতিয়তাবোধের সঞ্চার তারই একটি উদাহরণ। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোই কেবলমাত্র স্বাদেশিকতার মূলমন্ত্র ছিল না, একটা গঠনমূলক দিকও ছিল তা হল যে নতুন জাতীসত্তার উন্মেষ ঘটেছিল তাকে আরও জোরদার করা। ঔপনিবেশিকতার যন্ত্রণা দ্বীপপুঞ্জের সকল অধিবাসী সমানভাবে ভোগ করায় এই জাতীসচেতনতার জন্ম হয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ সম্পৃক্ত হয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ডাচ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করা এবং ডাচ ঔপনিবেশিক ভৌগোলিক সীমানা অনুযায়ী একটি স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার প্রতিষ্ঠা দেওয়া।

৭৯.৫.২ ডাচ প্রশাসন ও অর্থনীতি

আগেই বলা হয়েছে যে, উনিশ শতকে ডাচ অর্থনৈতিক স্বার্থ বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারি প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, জাভায় কালচার ব্যবস্থা (Culture System) কার্যকর করার জন্য একটা ব্যাপক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়। এই কালচার ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রত্যেক

গ্রামে জমির একটা অংশ রপ্তানির ফসল উৎপাদনের জন্য সরিয়ে রাখতে হত ও সেই ফসল কর স্বরূপ সরকারে হাতে তুলে দিতে হত। ১৮৭০ সালে একটি নতুন কৃষিসংক্রান্ত আইনের বলবৎ করা হয় যেখানে বেসরকারি ডাচ সংস্থা বা ব্যক্তিকে দীর্ঘমেয়াদী পাট্টার (লীজর) ভিত্তিতে জমি অধিগ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়, অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়ায় সরাসরিভাবে ডাচ শোষণের সূত্রপাত হয়। বেসরকারি উদ্যোগকে এই উৎসাহ, ঔপনিবেশিক ডাচ নীতির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই নীতি 'লিবারাল পলিসি' নামে পরিচিত। নতুন আইনের ফলে এক্ষেত্রে ডাচ বিনিয়োগ এত দ্রুত বৃদ্ধি পায় যে কম সময়ের মধ্যেই এই দ্বীপপুঞ্জের অর্থনীতি পরিবর্তিত আকার ধারণ করে। কালচার ব্যবস্থায় দেখা গেছে যে ইন্দোনেশীয় শ্রমিকেরাই তাদের নিজ নিজ জমির নির্দিষ্ট অংশে রপ্তানিযোগ্য ফসল উৎপাদন করত এবং তা ডাচ সরকারকে কর হিসাবে প্রদান করত। লক্ষণীয় হল এখানে জমি মালিক ছিল ইন্দোনেশীয়রাই। কিন্তু 'লিবারাল' রীতিতে ডাচরাই দীর্ঘকালীন মেয়াদে জমি মালিকানা স্বত্বের (লীজ) ভিত্তিতে উৎপাদন শুরু করে। সেখানে ইন্দোনেশীয়দের ভূমিকা ছিল শুধুই শ্রমিকের ভূমিকা। একথা বলাই বাহুল্য যে, এর ফলে প্রথম ব্যবস্থা তুলনায় দ্বিতীয় ব্যবস্থায় ডাচ শোষণ বৃদ্ধি পায় এবং এই শোষণ আর পরোক্ষ থাকে না, প্রত্যক্ষ আকার ধারণ করে।

ডাচ শাসকদের অপমানজনক ও বৈষম্যমূলক আচরণে ইন্দোনেশিয়ার জনগণের মনে ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ডাচ ঔপনিবেশিক আইনে দেশীয় লোকেদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ ছিল। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির কাঠামো বৈষম্যমূলক ছিল। আপাতদৃষ্টিতে সেরকম গুরুত্বপূর্ণ না হলেও কিছু কিছু ডাচ আইন ও আচরণ ইন্দোনেশীয়দের পক্ষে অত্যন্ত ও অপমানজনক ছিল। ডাচদের নিজ শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অতিরিক্ত প্রত্যয়, 'নেটিভ'দের প্রতি তাচ্ছিল্যসূচক আচরণ ও মনোভাব, সামাজিকভাবে বর্জন, শাসিত নিপীড়িত জনসাধারণের মনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। এই অমর্যাদা ও অপমান যুবক সুকর্ণর ইন্দোনেশিয়ার জাতিয়তাবাদী আন্দোলনের কর্ণধার এবং প্রথম রাষ্ট্রপতির মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। খুব স্বাভাবিকভাবেই নিজের ও দেশের অন্যান্য লোকের আত্মসম্মান পুনরুদ্ধার করা ও নিজের মতামত ও অধিকার জোরের সঙ্গে তুলে ধরার তীব্র ইচ্ছা সুকর্ণর রাজনৈতিক জীবনে ও স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণের দিনগুলোতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

৭৯.৫.৩ ডাচ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ

উনিশ শতকের শেষার্ধের্ব ডাচ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি সম্প্রসারণের ফলে ইন্দোনেশিয়ায় বিরাট সামাজিক পরিবর্তন এসেছিল এবং এই সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই আবার জনসাধারণের মধ্যে এক নতুন আত্মসচেতনাবোধের উন্মেষ ঘটেছিল। দেশবাসীর মধ্যে এই আত্মসচেতনতা বোধ অবশ্যই সুকর্ণ সৃষ্টি করেন নি, কিন্তু তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার কৃতিত্ব সুকর্ণরই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানির প্রতিনিধিদের কার্যকলাপের প্রভাব তদানীন্তন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উপর খুব একটা বেশি পড়েনি কারণ তাদের কাজ ছিল কেবলমাত্র উৎপাদিত বস্তু সংগ্রহ করা। দেশীয় শাসকগোষ্ঠীয় প্রতি কিছুটা সম্মান প্রদর্শনেও তারা পিছপা হননি। কিন্তু উনিশ শতকের শেষে ডাচ শাসন ও ডাচ বিনিয়োগ ইন্দোনেশিয়ার এক বিরাট পরিবর্তন আনে। পুরোনো কৃষিভিত্তিক সমাজের ভারসাম্য নতুন অর্থনৈতিক কর্মচাঞ্চল্যের উত্তেজনায় নষ্ট হয়ে যায়। নতুন নতুন শ্রেণীর সৃষ্টির হয়, প্রাচীন অভিজাত শ্রেণীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, এবং দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত সামাজিক গঠনের ভিত আলগা

হয়ে যায়। এই সময় ইন্দোনেশিয়ার দিকে চোখ ফেরালে দেখা যায় একদিকে প্রাচীন সমাজের গঠনগত পরিবর্তনের ফলে প্রাচীন ধারণাগুলির সংস্কার ঘটেছে, অন্যদিকে ডাচ শাসনে ইন্দোনেশিয় দ্বীপপুঞ্জ রাজনৈতিক ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে যা ইন্দোনেশিয়াদের মনে এক নতুন জাতীয় চেতনার জন্ম দিচ্ছে। একদিকে যেমন ঔপনিবেশিক শাসনের ব্যাপকতা জনগণের মধ্যে যন্ত্রণা বাড়িয়ে তোলে তেমনি এই যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েই তারা পরিবর্তনশীল বিশ্ব সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে। এই আগ্রহ থেকেই জন্ম নেয় তাদের নিজেদের ধর্মসংস্কৃতিকে নতুন করে জানার ইচ্ছা বা জাতীয় চেতনাতে পরিণতি পায় এবং এই পরিণত মনেই জন্ম নেয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা।

মনে রাখতে হবে ইন্দোনেশীয়দের মধ্যে জাতিয়তাবাদের যে চেতনা জাগরিত হল তার কারণ শুধু ডাচ দখলকারীদের কালচার সিস্টেম বা লিবারাল পলিসি নয়। ডাচ প্রবর্তিত Ethical Policy এই জাগরণের অন্যতম পরোক্ষ কারণ। যদিও ইন্দোনেশিয়দের উপকার করার ইচ্ছা নিয়েই এই নীতি প্রবর্তন করা হয়, ডাচদের এই উপকারের প্রচেষ্টা কিন্তু ইন্দোনেশীয়দের নবজাগরিক জাতীয় চেতনা দৃঢ় করতে পরোক্ষে ইন্ধন জোগায়। যা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য তা অপরের কাছ থেকে দান হিসাবে গ্রহণ করতে আত্মমর্যাদা আঘাত লাগে। এই আহত মানসিকতা বিদেশী শাসন সম্বন্ধে সচেতনতা এবং বিদেশী শাসকদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা বাড়িয়ে তোলে।

৭৯.৬ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

মনে রাখতে হবে ঔপনিবেশিক নীতি প্রণয়নের ফলে যে অসন্তোষ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল রাজনৈতিক আন্দোলন তারই সাহায্য গড়ে ওঠে এবং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ইন্দোনেশীয় এলিট সম্প্রদায় আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। সংগঠিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য করা হয় ১৯০৮ সালে 'বুদি উতোমো'র (Budi Utomo) প্রতিষ্ঠা। এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ওয়াহিদিন সুদিরাসু (Wahidin Sudirasu) যিনি ছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত জাভানীয় ডাক্তার। প্রারম্ভে বুদি উতোমো একটি সাংস্কৃতির প্রতিষ্ঠান রূপে পরিচিত ছিল, অবশ্য এই প্রতিষ্ঠানের কিছু জাতীয়তাবাদী গুরুত্বও ছিল। এর অনতিকাল পরেই কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে যেগুলির সদস্য সংখ্যা ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ 'বুদি উতোমো'র তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'সারেকাত ইসলাম' (Sarekat Islam) নামক জনসমিতি। এই সমিতি গঠন করার মূল উদ্দেশ্য ছিল জাভানীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা এবং তাদের কয়েকটি একান্ত নিজস্ব শিল্পকে, যেমন বাটিকা শিল্প, বিদেশী হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করা। যে কারণে তাঁরা চীনা ব্যবসায়ীদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে চেয়েছিল। প্রথমে এই সমিতি 'সারেকাত দাগাঙ ইসলাম' (Sarekat Dagang Islam) নামে পরিচিত ছিল। ১৯১২ সালে এই সমিতির নামকরণ করা হয় 'সারেকাত ইসলাম'। উমর সায়েদ জোক্রোয়ামিনোতো (Jokroaminoto) দক্ষতার সঙ্গে এই সমিতির পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং বহু মানুষকে জাতিয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে এই সংগঠনের সদস্যারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের ভূমিকা বৃদ্ধির কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। জোক্রোয়ামিনেতোর নেতৃত্বে মাত্র কয়েক

বছরে মধ্যেই সারেকাত ইসলামের সদস্যসংখ্যা কয়েক হাজার থেকে বেড়ে কয়েক শত সহস্র হয়। ১৯১৯ সালের মধ্যে এই সমিতি দাবি করে যে, তার সদস্যসংখ্যা আড়াই মিলিয়ন, অবশ্য এর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। একথা অবশ্য মানতেই হবে যে, সারেকাত ইসলাম আমজনতার অন্তর স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিল। একদিকে যেন কৃষকগোষ্ঠী তেমনি সুরাবায়া, সেমারাং ও অন্যান্য শহরে শ্রমিকসম্প্রদায়ও এই সমিতির কার্যকলাপের উদ্বুদ্ধ হয়। এই সমিতি তাদের সংগঠিত করার কাজে বিরাট সাফল্যলাভ করে এবং সংরক্ষকের ভূমিকা পালনে অগ্রণী হয়। এই সমিতির মাধ্যমে মুসলমান বা অমুসলমান পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এই সমিতি সান্ত্রি অর্থাৎ গোঁড়া মুসলমান এবং আবাংগান (Abangan) অর্থাৎ যারা নামেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন, এই দুই শ্রেণীর লোকেদেরই সমিতির কার্যকলাপে সামিল করতে সক্ষম হয়েছিল। সারেকাত ইসলাম প্রতিষ্ঠার পরবর্তী দশ বছর ধরে সংঘটিত জাতিয়তাবাদের বিশিষ্টতম নিদর্শন হিসাবে চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও এই প্রতিষ্ঠান যে একমাত্র জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানে ছিল তা নয়। যেমন ইউরোপীয়দের নিজস্ব সংগঠন ছিল। তারা মনে করতেন যে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত জাতিগত পরিচয় নয়, স্থায়িভাবে ইন্দোনেশিয়ার বসবাস করা ও দেশের প্রতি দায়িত্ব পালন করা জাতীয়তবাদের মূল উপাদান। অন্য একটি সংগঠন ছিল ইন্ডিজ সোশ্যাল ডেমোক্রটিক অ্যাসোসিয়েশন (Indies Social Democratic Association-ISDV) যার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। মার্কসবাদী হেন্ডরিক স্লিভলিয়েত (Hendrick Sheevliet) ১৯১৪ সালে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুরুতে এই সংগঠন ডাচ সদস্য প্রধান হলেও ক্রমশ ইন্দোনেশিয়ারা সদস্যরূপে যোগদান করে। ১৯২০ সালে ISDV ইন্ডিজ কম্যুনিস্ট পার্টিতে (Indies Communist Party) পরিণত হয়।

এই সংগঠনগুলির চরিত্র থেকে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে ডাচ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে জাতীয়তাদী আন্দোলন বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত ছিল। জাতীয়তাবাদীদের নিজেদের মধ্যে নীতিগত ও কৌশলগত মতভেদ ছিল। মনে রাখার দরকার সেই সময় এই সংগঠনগুলি নেতৃবৃন্দ বুঝতে পেরেছিলেন দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির বিষয়টি তখন বহু দূরের ব্যাপার। যার ফলে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী দলগুলি সেই সময় নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী যথাযথভাবে স্থির করার প্রয়োজনীয়তা সেরকমভাবে বোধ করেনি। এই কারণে আবার দলগুলির মধ্যে নীতিগত ও কৌশলগত মতভেদ বিশেষ প্রকট হয়ে ওঠেনি। উপরন্তু স্বীকার করতেই হবে বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে মতের অমিল থাকলেও একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ভাবনাচিন্তা এই দলগুলির মধ্যে একটা বাহ্যিক ঐক্য ও সেতু-বন্ধনের কাজ করেছিল। প্রথমদিকে জাতীয়তাবাদী আবেগের জোয়ারে দলগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মতপার্থক্য অনেকটা আড়ালে, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফাটলগুলি প্রকট হয়ে ওঠে।

৭৯.৬.১ প্রথম জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ

১৯২৬ ও ২৭ এই সময় ইন্দোনেশীয়, যারা কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী তারা বিদ্রোহ করে বসে। কমিউনিস্ট চিন্তাভাবনায় বিশ্বাসী ইন্দোনেশীয় ঐতিহাসিকদের মতে এই বিদ্রোহই ছিল ইন্দোনেশিয়ার প্রথম জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ। অনেকে তাদের এই দাবি গ্রহণযোগ্য বলে মনে না করলেও স্বাধীনতাপূর্ব ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসে এই বিদ্রোহের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই বিদ্রোহের প্রক্রিয়ায় জাতিয়তাবাদী আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে ওঠে। সেই সময় থেকে বিষয়টি স্বাধীনতাপূর্ব ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।

৭৯.৬.২ পি-এন্-আই

অবশ্য এখানে মনে রাখতে হবে যে, ১৯২৭ সালেই ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব ঘটেনি। বরং ১৯২৭ সালে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল তা হল PNI (Partai National Indonesia) অর্থাৎ ইন্দোনেশীয় জাতিয়তাবাদী পার্টির জন্ম। যা ডাট ইষ্ট ইন্ডিজে এই পার্টিই সর্বপ্রথম, দেশের স্বাধীনতালাভকে লক্ষ্যবস্তু রূপে স্থির করে। তাদের স্লোগান ছিল, Indonesia Merdeka অর্থাৎ স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া। এই প্রসঙ্গে মনে রাখার দরকার যে, ১৯২২ সালে হল্যাণ্ডে গঠিত Indonesische Verenigin-এ 'Indonesia Merdeka' এই ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করেছিল। এই সংগঠন সেই সময় বিদেশে পাঠরত ইন্দোনেশীয় ছাত্রদের নিয়ে গঠিত হলেও কিছুদিনের মধ্যেই ডাচ ইষ্ট ইন্ডিজে অনেকে এর অনুগামী হয়। ১৯২৪ সালে এই সংগঠনের নতুন নাম হয় পেরহিমপুনান ইন্দোনেসিয়া (Perhimpunan Indonesia)। এই বছরে সুকর্ণর নেতৃত্বাধীন বান্দুং স্টাডি ক্লাব Perhimpunam Indosnesia-এর সঙ্গে গনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বান্দুং স্টাডি ক্লাবের অনেক সদস্যই এর প্রাক্তন সদস্য ছিলেন। ১৯২৭ সালে ৪ঠা জুলাই বান্দুং স্টাডি ক্লাব রূপান্তরিত হয় Perserikatan National Indonesia এবং পরের বছর এই সংগঠনের প্রথম কংগ্রেসের পর এর নাম হয় Partai National Indonesia (PNI)।

ডাচ শাসনাধীন ডাচ ইষ্ট ইন্ডিজে জাতিয়তাবাদী আন্দোলন যে দৃঢ়তর হচ্ছে এর অন্যতম প্রমাণ ইন্দোনেশিয়া নামের ব্যবহার। বেশ কিছুদিন ধরে এমনকি ১৯১৭ সালেও কোনো কোনো জাতিয়তাবাদী নেতা মাঝে মাঝে এই নাম ব্যবহার করেছিলেন। অবশ্য প্রথম যে রাজনৈতিক সংগঠনে নামে আমরা 'ইন্দোনেশিয়া'র ব্যবহার দেখতে পাই তা হল 'পেরহিমপুনান ইন্দোনেশিয়া (Perhimpunan Indonesia)। আবার যে রাজনৈতিক দল প্রথম দলের নাম হিসাবে 'ইন্দোনেশিয়া, শব্দটি ব্যবহার করে তা হল ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি। ক্রমশ জাতীয়তাদী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এই নাম ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় ও ১৯২৬ সাল থেকে দেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে 'ইন্দোনেশীয়' নাম ব্যবহার করা হয়। ১৯২৯ সালে এমনকি সারেকাত ইসলামের মত মুসলিম সংগঠনও নিজের নামের সঙ্গে 'ইন্দোনেশিয়া' শব্দটি ব্যবহার করে। নতুন নাম হয় 'পাতহি সারেকাত ইসলাম ইন্দোনেশিয়া' (Partai Sareket Islam Indonesia)।

৭৯.৭ জাপানী শাসনের প্রভাব

ডাচ উপনিবেশ থাকাকালীন ইন্দোনেশিয়া ১৯৪২ সালের প্রারম্ভে জাপান দ্বারা অধিকৃত হয়। মুখ্যত মুষ্টিমেয়ের সমর্থনের ভিত্তিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ইন্দোনেশিয়ার জাতিয়তাবাদী আন্দোলন ছিল এলিট শ্রেণীর আন্দোলন। সেই সময় জাতিয়তাবাদী আন্দোলনে ইন্দোনেশিয়াবাসীর বৃহত্তর অংশের কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। কিন্তু জাপান ইন্দোনেশিয়া অধিকার করার পর আন্দোলনের ছবিটি পাল্টে যায়, ইন্দোনেশিয়ার জনসাধারণ জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে চলে। এই সচেতনতার মূল কারণ ছিল জাপান এবং ডাচ শাসন পদ্ধতির তারতম্য। ডাচ শাসনে ইন্দোনেশিয়াবাসীর আইডেনটিটিকে মূল্য দেওয়া তো দূরের কথা, নির্মমভাবে তা দমিয়ে রাখার চেষ্টা চলেছিল। অপরদিকে জাপানী সহায়তায় ইন্দোনেশিয়াবাসীরা

তাদের স্বাতন্ত্র্য ও সংস্কৃতি এককথায় জাতীয় অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। আপাতদৃষ্টিতে জাপানের এই আচরণ মহৎ বলে মনে হলেও মূলত তা ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইন্দোনেশিয়াবাসীকে স্বপক্ষে পাওয়ার উদ্দেশ্যে নিজ গোষ্ঠীর শক্তিবৃদ্ধির কথা মাথায় রেখেই তারা ইন্দোনেশিয়াবাসীর আবেগকে ব্যবহার করেছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীদের বৃহত্তর অংশই জাপানকে তাদের মুক্তিদূত বলে মনে করেছিল। তাদের এই ধারণা বাস্তবায়িত হল যখন তারা আবার জাতীয় সঙ্গীত গাইবার এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলনের অধিকার ফিরে পেল যে মর্যাদা তারা হারিয়েছিল ডাচ ঔপনিবেশিক শাসনকালে। উপরন্তু জাপানীরা ইন্দোনেশিয়ার জাতিয়তবীদের শত্রু ডাচ্ উপনিবেশিকদের তাদের সমর্থন ইউরেশীয়দের অসামরিক বন্দী শিবিরে (Concentration Camp) প্রেরণ করেছিল এবং ডাচ ও ইউরোশীয়দের অধিকৃত পদগুলিতে দেশীয়দের নিয়োগ করেছিল। এই প্রথম ইন্দোনেশীয়রা বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মপদ্ধতি সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। এর ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই জাপানীরা ইন্দোনেশীয়রা বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মপদ্ধতি সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। এর ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই জাপানীরা ইন্দোনেশীয়দের সমর্থন পেয়েছিল যদিও সেই সমর্থন ছিল ক্ষণস্থায়ী। জাপানীরা ডাচ স্কুলগুলিকে সরিয়ে ইন্দোনেশীয় ভাষাকে স্বীকৃতি দেয় ও তার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ইন্দোনেশিয়ার প্রত্যেকটি উপজাতি গোষ্ঠীর জন্য একই মানের (Unified) শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইন্দোনেশীয়দের সমর্থন পাওয়ার আশায় জাপানীরা সুকর্ণ এবং হাতাকে মুক্তি দেয় এবং অদূর ভবিষ্যতে স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে তারা সুকর্ণ ও হাতাকে একটি জাতিয়তাবাদী সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করে। এই সংগঠন 'পুতেরা' (Putera-Pusat Tenaga Rakjat Centre of people's Power) নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে জাপানীদের উদ্দেশ্য সাধিত হয়নি। সংগঠন ইন্দোনেশিয়ার জাতিয়তাবাদী সংগঠনরূপে নিজেদের এগিয়ে চলার উদ্দেশ্য কাজ করতে পারে। পুতেরা বহু যুবসংগঠন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল, সবচেয়ে বড় কথা পুতেরার নেতৃবৃন্দ জনমানসের কাছে পৌঁছতে পেরেছিল। অবশেষে জাপানীরা যখন উপলব্ধি করল যে এই সংগঠনের দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না তখন তারা একটি নতুন সংগঠন গড়ে তোলে।

জাপান অধীনস্থ ইন্দোনেশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তি হল ১২০,০০০ সদস্য সম্বলিত 'পেতা (PETA—Fatherland Defence Force) নামে এক হোমগার্ড বাহিনী, একে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে ইন্দোনেশিয়ার সামরিক বাহিনী গড়ে ওঠে। ডাচ আমলে মুষ্টিমেয় ইন্দোনেশীয়কে সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত করা হয়েছিল। জাপানীরা আত্মসমর্পণ করার পর ডাচরা যখন পুনরায় নিজেদের কর্তৃত্বে ফিরে যেতে চায়,— লক্ষ্যণীয় বিষয় হল সেই প্রচেষ্টায় তারা বাধাপ্রাপ্ত হয় নবগঠিত ইন্দোনেশীয় সমরশক্তি দ্বারা।

সবশেষে জাপানীদের নৃশংসতার শিকার হয় ইন্দোনেশিয়ার জনসাধারণ, বিশেষ করে কৃষক সম্প্রদায়। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জাপানী অধিকারের শেষ পর্যায়ে ইন্দোনেশীয় বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে নবজাগরিত রাজনৈতিক সচেতনতা আরও প্রবল হয়ে ওঠে এবং সহিংস রূপ নেয়। এই আন্দোলনই ইন্দোনেশিয়ার প্রথম মুক্তি প্রচেষ্টারূপে পরিগণিত হয়। সাড়ে তিন বছরের জাপানী শাসন ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। এই প্রভাব শুধুমাত্র ইন্দোনেশিয়াবাসীর জাতিয়তাবোধ জাগরিত করেনি, একই সঙ্গে তাদের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়ে তোলে।

৭৯.৮ ইন্দোনেশীয় বিপ্লব (১৯৪৫-৪৯)

১৯৪৫ সালে আগষ্ট মাসে মাঝামাঝি জাপানীরা আত্মসমর্পণ করে। সুকর্ণ ও হাতা জাতিয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের প্রতিনিধি হিসাবে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা করে। এই সময়ই ডাচ ব্রিটিশ সহায়তায় ইন্দোনেশিয়ার ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। কিন্তু ডাচরা লক্ষ্য করল পথ নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও ইন্দোনেশিয়া জাতিয়তাদী নেতৃবৃন্দ তাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে অর্থাৎ স্বাধীনতার লক্ষ্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। ইন্দোনেশিয় জাতিয়তাবাদী যুবগোষ্ঠী যারা ইতিমধ্যেই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল তাদের মত ছিল সংগ্রামের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতার লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। অপরদিকে আর একটি মত হল যুদ্ধ নয় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছানো যাতে রক্তক্ষয় এড়ানো যায়। এই মতের পক্ষে ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার জাতিয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠিত নেতারা। এই সময় ডাচদের দৃষ্টিভঙ্গির সামান্য পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। তারা কিছুটা নরম মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। তারা বলেছিল ইন্দোনেশীয়দের স্বাধীনতার দাবি তারা মেনে নেবে যদি সেই স্বাধীনতা ডাচদের স্বার্থের পরিপন্থী না হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে ডাচ ঔপনিবেশিক এং জাতীয়তাবাদী ইন্দোনেশীয়দের মতপার্থক্য তীব্র হয়ে ওঠে, যার ফলে এই ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয় না। ডাচরা ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করবার আশ্বাস দিলেও সেই ঘোষণার কোনো নির্দিষ্ট তারিখ দিতে চায়নি, বলেছিল স্বাধীনতালাভের পূর্বে যে কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন সেই ব্যাপারেই আলোচনা হওয়া উচিত। কিন্তু এই বক্তব্য ইন্দোনেশীয় জাতিয়তাবাদীদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না কারণ সত্বর স্বাধীনতালাভেই তাদের কাম্য ছিল। বহু অত্যাচার বহু দণ্ডভোগ করার পর বহু প্রতীক্ষিত এই স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য তারা উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছিল। অপরদিকে ডাচ ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের ঔপনিবেশিক ধারণাকে একেবারে ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক ছিল না। কয়েকটি প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছিল যেগুলো মোটেই স্পষ্ট ছিল না। এবং পুরোনো (জাপানী অধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী) ঔপনিবেশিক চিন্তাধারায় অভ্যস্ত ডাচরা ভাবতেও পারেনি ইন্দোনেশীয় জাতিয়তাবাদীরা সত্যই স্বাধীনতালাভের যোগ্য হয়ে উঠেছে এমনকি সত্যই তারা স্বাধীনতা চায়। যদিও ডাচ ঔপনিবেশিকরা বুঝতে পেরেছিল ইন্দোনেশিয়ায় তাদের পুনরাগমন মোটেই কাম্য নয় তবুও এই বাস্তব সত্যকে মেনে সেদিন নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এই পরিস্থিতিতে কোনো আলোচনাই সফল হতে পারে না। যদিও দুপক্ষই আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি সমাধানে ইচ্ছুক ছিল কিন্তু আলোচনা বিষয় কী হবে সেই নিয়ে তারা কখনই একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। অবশ্যই ইন্দোনেশীয় জাতিয়তাবাদীদের ও ডাচ ঔপনিবেশিক শক্তির মধ্যে দুটি বড় রকমে চুক্তি হয়েছিল একটি ১৯৪৬ সালের নভেম্বরে লিঙ্গজাতি চুক্তি (Renville Agreement), কিন্তু কোনো চুক্তিই স্থায়ী হয়নি। চুক্তিগুলি ভেঙ্গে পড়া মূলে ছিল যে কারণ তা হল ঔপনিবেশিকরা মোটেই মেনে নিতে পারছিল না যে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হবে। বহুজাতিক দেশ ইন্দোনেশিয়াকে ডাচরা একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল। কিন্তু ইন্দোনেশিয়াকে এই বহু রাজ্যে বিভক্ত করার বিভাজন নীতিকে ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদীরা সন্দেহের চোখে দেখেছিল। কারণ তারা মনে করেছিল এর ফলে বিভক্ত রাজ্যগুলির উপর ডাচ কর্তৃত্ব বজায় রাখা সহজ হবে।

এর ফলে ডাচদের পরিকল্পনা এক প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হল। এই সঙ্গে একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ইন্দোনেশীয় জাতিয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছিলেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ডাচরা ইন্দোনেশিয়ার একটি অঞ্চকে আলাদা আলাদা প্রদেশ হিসাবে চিহ্নিত করে ফেলে। প্রথম দিকে সেখানকার অধিবাসীরা এই ব্যবস্থার পক্ষে থাকলেও শেষ পর্যন্ত তারা মত পরিবর্তন করে। এই মত পরিবর্তনের পশ্চাতে বেশ কয়েকটি কারণ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ইন্দোনেশিয়াবাসীদের আঞ্চলিকতাবোধ থেকে দেশাত্মবোধ উত্তরণ ঘটেছিল, যার ফলে দেশের এই টুকরো হয়ে যাওয়া তারা মেনে নিতে পারেনি। আর একটি কারণ হল ১৯৪৭-এর মাঝামাঝি ও ১৯৪৮-এর শেষের দিকে ডাচ ঔপনবেশিক শক্তি তাদের সমরশক্তিকে ইন্দোনেশীয় জাতিয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়েছিল। এই ঘটনায় ইন্দোনেশিয়াবাসীরা জাতীয়তাবোধ নাড়া খেয়েছিল।

৭৯.৮.১ ডাচ সমরশক্তির ব্যবহার

১৯৪৭ সালে জুলাই মাসে সমরশক্তির প্রথম ব্যবহারে ডাচরা কিছু সফলতা লাভ করলেও এই সাফল্যের জন্য তাদের অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল, যা ছিল তাদের ধারণা বাইরে। এই সময় তারা জাভা এবং সুমাত্রার অনেকটা অংশ দখল করে নেয়, যার ফলে ইন্দোনেশীয় জাতিয়তাবাদীরা কিছু অসুবিধায় পড়ে। খাদ্যবণ্টন ব্যবস্থায় যে অসুবিধার সৃষ্টি হয় সেটাই ছিল প্রধান কারণ। অন্যদিকে ডাচরা হারিয়েছিল কিছু ইন্দোনেশীয়বাসীর সমর্থন, যারা বুঝতে পেরেছিল ডাচদের শঠতা। তারা একদিকে বলেছিল 'স্বাধীনতা দেব', অন্যদিকে ইন্দোনেশীয়দের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী নামাচ্ছিল। এর ফলে জাতিয়তাবাদীদের সংগ্রাম আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল। আন্তজাতিক ক্ষেত্রেও ডাচদের এই সমরশক্তির ব্যবহার নিন্দার কারণ হয়েছিল। ডাচ ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে ইন্দোনেশীয় জাতিয়তাবাদীদের এই সংঘর্ষ আন্তজাতিক ক্ষেত্রে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এর ফলে হল্যাণ্ডের উপর যে আন্তজাতিক চাপ সৃষ্টি করা হয় তারই ফলে ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থিত ডাচ শক্তি ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হয়।

৭৯.৮.২ আন্তর্জাতিক জনমত ও স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি

আন্তজাতিক জনমত যা নবনির্মিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করেছিল, তার ফলে প্রথম পুলিশী আক্রমণ তুলে নেওয়া হল এবং দুই পক্ষ নতুন করে আলোচনা মাধ্যমে একটা সমঝোতায় আসার চেষ্টা করল। কিন্তু এই আলোচনা কোনো সমাধান সূত্র বের করতে পারল না। এই আলোচনার সময়কাল ছিল ১৯৪৭-এর শেষ থেকে ১৯৪৮-এর শেষ পর্যন্ত। ১৯৪৮-এর ডিসেম্বর মাসে ডাচ ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বিতীয়বার পুলিশী আক্রমণ চালায়। ১৯৪৯ সারে প্রারম্ভ পর্যন্ত এই আক্রমণ চালান হয়। আগেই বলা হয়েছে এর ফলে তারা একদিকে ডাচ শক্তির সমর্থনকারী ইন্দোনেশিয়াবাসীর সমর্থন হারায় অন্যদিকে তেমনি এই ঘটনা জাতিয়তাবাদী আন্দোলনকে আরও সংগঠিত ও জোরদার করে তোলে। এর ফলে আন্তজাতিক স্তরে ডাচরা সমালোচনা শিকার হয় এমনকি ন্যাটোর (NATO) সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ন্যাটোর অন্যতম সদস্য আমেরিকার সমর্থন হারায়। এর ফলে তারা আবার আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়। এই আলোচনার পরিণতিতে (১৯৪৯-এর শেষে) ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীন রষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। স্বাধীনতার পূর্বে ১৯৪৯ সালে আগস্ট ও নভেম্বরের মাঝামাঝি নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে এক গোলটেবিল বৈঠকে উভয়পক্ষের মধ্যে স্বাধীনতা সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা হয় এবং এখানেই

উভয়পক্ষের শর্তাবলী নিরূপিত হয়। ডাচদের পক্ষে প্রধান শর্ত ছিল যে ডাচ ইন্ডিজকে একটি যুক্তিরাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে, যার মধ্যে থাকবে ডাচসৃষ্ট ১৫টি রাজ্য ও রিপাবলিক এবং রাজ্যগুলির তুলনায় রিপাবলিক অর্থাৎ কেন্দ্রের ক্ষমতা বেশি হবে।

অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, গোলটেবিল বৈঠক চিল মূলত উভয়পক্ষের মধ্যে সমঝোতার সূত্র নিরূপণের বৈঠক। এই আলোচনায় পশ্চিম নিউগিনির ভবিষ্যত অন্ধকারেই থেকে যায়, কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। একদিকে ইন্দোনেশীয় জাতিয়তাবাদী প্রতিনিধিরা পশ্চিম নিউগিনিকে স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত করতে বদ্ধপরিকর ছিল। অপরদিকে ডাচরা এই এলাকার উপর তাদের অধিকার ছাড়তে চায়নি। শেষ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ পশ্চিম নিউগিনিতে সাময়িকভাবে স্থিতাবস্তা মেনে নেয়। যদিও শর্ত ছিল যে, উভয়পক্ষ পরের বছর আলোচনার মাধ্যমে স্থির করবে এই এলাকা কাদের শাসনাধীন থাকবে। এও স্থির করা হয় যে নেদারল্যান্ডস্ ও ইন্দোনেশিয়া একটি ইউনিয়ন গঠন করবে। অবশ্য সেই ইউনিয়নকে বিশেষ কোন ক্ষমতা দেওয়ার কথা বলা হয়নি। আলোচনায় আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে স্বাধীনতা-উত্তর ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ বিনিয়োগকারী এবং প্রশাসনিক কর্মে নিযুক্ত ডাচরে স্বার্থ রক্ষিত হবে, গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে নতুন রাষ্ট্রকে তা নেদারল্যাণ্ডস সরকারে সঙ্গে আলোচনা ভিত্তিতেই নিতে হবে, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্তটি রাজত্ব চলাকালীন ডাচ ঔপনিবেশিকরা যে বিপুল ঋণ করেছিল সেই ঋণের দায়িত্ব স্বাধীনতা-উত্তর ইন্দোনেশিয়াকেই নিতে হবে। যদিও এই শর্তগুলি ইন্দোনেশিয়ায় এক বিপুল সমালোচনার ঝড় তুলেছিল তবুও সুকর্ণ এবং হাত্তার প্রবল জনপ্রিয়তা এবং মাসজুমি (Masjumi) ও পি.এন.আই (P.N.I.) রাজনৈতিক দলের সমর্থনের ফলে শর্তগুলি স্বীকৃত হয়। এই শর্তগুলিকে ভিত্তি করেই ১৯৪৯ সালে ২৭শে ডিসেম্বর স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হয়। সুকর্ণ রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন আর হাত্তা পান প্রধানমন্ত্রীর পদ।

৭৯.৯ সারাংশ

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বৃহত্তম দেশ হিসাবে ইন্দোনেশিয়ার গুরুত্ব সর্বজনবিদিত। হাজার হাজার দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই রাষ্ট্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জাভা দ্বীপ ও জাভানীয় উপজাতি গোষ্ঠীর বিশেষ প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। সুপ্রাচীনকাল থেকেই এইসকল দ্বীপের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল। প্রথমদিকে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মজাত সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে স্থানীয় সভ্যতার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। পরে অবশ্য দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন প্রান্তে ইসলাম ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৬০২ সালে ডাচরা ইন্দোনেশিয়া মশলা ব্যবসার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ডাচ ইষ্ট ইন্ডিজ কোম্পানি (Dutch East Indics Company) গঠন করে। বহুদিন ধরে ডাচরা ব্যবসা সংক্রান্ত কাজকর্মেই লিপ্ত ছিল। সাম্রাজ্য স্থাপনে তারা মনোনিবেশ করেনি। কিন্তু উনিশ শতকের শেষার্ধে ডাচ কর্মপন্থায় এক বিরাট পরিবর্তন আসে। ডাচ অর্থনৈতিক স্বার্থের সম্প্রসারণ ঘটায় নতুন নতুন এলাকা দখলের কাজ শুরু হয় এই সময়। ১৯১০ সালের মধ্যে ডাচ ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় এবং ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলিকে একই শাসনব্যবস্থার অন্তর্গত করা হয়। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের মনে জাতিয়তাবোধের আবির্ভাব ঘটে। দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র একই আর্থিক ব্যবস্থার প্রচলন, পাশ্চাত্য (ডাচ) শিক্ষার প্রবর্তন ও যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতিসাধন ইন্দোনেশিয় জাতিয়তাবোধকে সুদৃঢ় করেছিল। দেশাবাসীকে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত

করা ও ডাচ ঔপনিবেশিক ভৌগোলিক সীমানা অনুযায়ী একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শুরু হয় জাতিয়তাবাদী আন্দোলন। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে জনগণের মনে যে অসন্তোষ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল তারই সাহায্যে স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলন বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত ছিল। অবশ্য নিজেদের মধ্যে নীতিগত ও কৌশলগত মতভেদ থাকলেও জাতিয়তাবাদী ভাবনাচিন্তা এই দলগুলির মধ্য এক বাহ্যিক সেতুবন্ধনের কাজ করেছিল। ডাচ উপনিবেশ থাকাকালীন ১৯৪২ সালে ইন্দোনেশিয়া জাপান দ্বারা অধিকৃত হয়। ইন্দোনেশীয় জাতিয়তাবাদী আন্দোলনের উপর জাপানী শাসন বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। প্রথমদিকে জাপানীদের মুক্তিদূত হিসাবে দেখলেও শীঘ্রই জনগণের মনে জাপানী শাসনের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। অবশেষে নবজাগরিত রাজনৈতিক সচেতনতা আরও প্রবল হয়ে ওঠে ও জাপানী শাসনের শেষ পর্যায়ে এক সহিংস আকার ধারণ করে। ১৯৪৫ সালে জাপানীদের আত্মসমর্পণের অব্যবহিত পরেই ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। অপরদিকে ডাচরা ঔপনিবেশিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। কিন্তু কোন চুক্তিই স্থায়ী হয়নি। ১৯৪৭-এর মাঝামাঝি ও ১৯৪৮-এর শেষের দিকে ডাচ শক্তি জাতিয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে সমরশক্তি প্রয়োগ করায় স্বাধীনতা সংগ্রাম আরও প্রবল হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক স্তরে চাপের সম্মুখীন হয়ে ডাচরা ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হয়।

৭৯.১০ অনুশীলনী

ক। **একটি শব্দে / বাক্যে উত্তর দিন :**

১। ইন্দোনেশিয়ার কয়েকটি বড় দ্বীপের নাম উল্লেখ করুন।

২। ইন্দোনেশিয়ার কোন উপজাতি গোষ্ঠীর প্রভাব বেশি?

৩। সুকর্ণ কে ছিলেন?

৪। ১৯০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠনকে ইন্দোনেশিয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য করা হয়?

৫। ৪নং-এ বর্ণিত সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

৬। ইন্দোনেশিয়ার কোন সালে কমিউনিস্টরা বিদ্রোহ করেছিল?

৭। কোন রাজনৈতিক সংগঠনের নামে 'ইন্দোনেশিয়া' শব্দটির ব্যবহার প্রথম দেখা যায়?

৮। কোন রাজনৈতিক দলের নামে প্রথম 'ইন্দোনেশিয়া' শব্দটি ব্যবহার করা হয়?

৯। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ডাচ ঔপনিবেশিক শক্তি ও ইন্দোনেশিয় জাতিয়তাবাদীদের মধ্যে কোন দুটি চুক্তি হয়েছিল?

১০। কোন সালে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃতি লাভ করে?

খ। সংক্ষেপে উত্তর দিন :

১। হিন্দু-ইন্দোনেশীয় যুগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

২। ইন্দোনেশিয়ায় কোন সময়ে ও কীভাবে ইসলাম ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল?

৩। বিংশ শতাব্দীর পূর্বে ডাচ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪। ইন্দোনেশিয়ায় জাতিয়তাবোধের জন্ম হওয়া উল্লেখযোগ্য কারণ কী কী?

৫। 'কালচার' ব্যবস্থা সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

৬। 'লিবারাল পলিসি' সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

৭। 'সারেকাত ইসলাম' সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

৮। কোন সালে এবং কীভাবে ইন্দোনেশিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা হয়?

৯। পি.এন.আই. সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

১০। ইন্দোনেশীয় জাতিয়তাবাদী আন্দোলনের উপর জাপানী শাসনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব কী ছিল?

১১। 'পুতেরা' কারা গঠন করেছিল? কী তার উদ্দেশ্য ছিল? সেই উদ্দেশ্য কী সফল হয়েছিল?

৭৯.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। Kahin, George Mc Turnan, Nationalism and Revolution in Indonesia, I thaca N.Y., Cornell University Press, 1952.

২। Legge, J.D. Indonesia, Englewood Cliffs, N.Y., prentice—Hall, 1965.

৩। Peter Polomke, Indonesia Since Sukarno, penguin Books, Victoria, 1971.

৪। Bastin, J. and Benda, H.J., A History of Modern Southeast Asia, Coloniaslim, Nationalism and Decolonization, Englewood Cliffs, N. J. Prentice—Hall, 1968.

৫। Hall, D.G.E., A History of South-East Asia, London, MacMillan, 1968.

৬। Woodman, Dorothy, the Republic of Indonesia, New York, Philosophical Library, 1955.

৭। Sardesai, D.R., Southeast Asia : Past or Present, New Delhi, Harpercollins Publishers, India, 1977.

৮। Cady, John F., Southeast Asia : Its Historical Development, New York, McGraw-Hill, 1964

৯। Steinberg, David J., In Search of Southeast Asia, Praeger, New York, Second Edition, 1985.

১০। Gibb, R.B., Modern Indonesia : A History Since 1945. New York, Longman, 195.

একক ৮০ ☐ ইন্দোনেশিয়া : রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রেক্ষাপট

গঠন

৮০.০ উদ্দেশ্য
৮০.১ লিবারাল যুগ
৮০.২ গাইডেড ডেমোক্রেসী
৮০.৩ সুকর্ণর পতন
৮০.৪ সুহার্তোর শাসনকাল
৮০.৫ সারাংশ
৮০.৬ অনুশীলনী
৮০.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৮০.০ উদ্দেশ্য

এই এককে ইন্দোনেশিয়ার লিবারেল যুগ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। গাইডেড ডেমোক্রেসির সূচনার ফলে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন হয় এবং পরবর্তীকালে সুহার্তোর শাসনব্যবস্থা সম্পর্কেও এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

৮০.১ লিবারাল যুগ (১৯৪৯-১৯৫৮)

এই যুগেই প্রথমেই যা লক্ষ্য করা গেল তা হল কয়েকমাসের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে গিয়ে ইন্দোনেশিয়া একটি Unitary State-এ পরিণত হয়। আগেই বলা হয়েছে যে ইন্দোনেশীয় সংগঠনগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বিপক্ষে ছিল, যদিও স্বাধীনতার লাভের জন্য তা মেনে নিতে হয়েছিল। স্বাধীনতা-উত্তর ইন্দোনেশিয়ায় তারা এর বিরুদ্ধে সরব হয়ে যায় পরিণতিতে ইন্দোনেশিয়া, একটি ইউনিটারি রিপাবলিক অব ইন্দোনেশিয়াতে (Republic of Indonesia) রূপান্তরিত হয়। ইন্দোনেশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা মাত্র সাত মাসের বেশি সময় স্থায়ী হয়। এখানে মনে রাখতে হবে যে, শাসনব্যবস্থার এই কাঠামোগত পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে ইন্দোনেশিয়ার কয়েকটি রাজ্যে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে। এর কারণ ছিল প্রস্তাবিত ইন্দোনেশিয়ার একরাষ্ট্রে পরিণতির বিষয়ে ডাচ ইন্ডিজ সৈন্যের বিরোধিতা।

১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসের পরবর্তী সময় লিবারাল যুগ বলে পরিচিত। পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে লিবারাল ডেমোক্রেসির সমাপ্তি ঘটে এবং গাইডেড ডেমোক্রেসির সূচনা হয়। গণতন্ত্রের রূপের এই যে পরিবর্তন তা একদিনে হয়নি, ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৯ এই চার বছর ধরে নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এই পরিবর্তন ঘটে। লিবারাল ডেমোক্রেসিতে শাসনক্ষমতা ছিল ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের হাতে। পার্লামেন্টের হাতে বেশকিছু ক্ষমতা ছিল, অপরদিকে প্রেসিডেন্ট সুবর্ণ এবং সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা কার্যত সীমিত ছিল।

১৯৪৯ সালের ঠিক পরেই ক্ষমতা ছিল প্রধানত দুটি দলের হাতে। সেই দুটি দল হল মাসজুমি ও পি.এন.আই। স্বাধীনতার পর প্রথম দুটি কোয়ালিশন সরকারে নেতৃত্ব দিয়েছিল মাসজুমি পার্টি। অপেক্ষাকৃত ছোট হলেও ইন্দোনেশিয়ার সমাজবাদী দলের (Indonesian Socialist Party) বেশ খানিকটা পরোক্ষ প্রভাব ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি তখনও দুর্বল ছিল, যদিও ১৯৫২ সালের পর তাদের ক্ষমতার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। মাসুজমির অন্তর্গত নাহ্‌দাতুল উলামা (NU) মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল হিসাবে পরিচিত লাভ করে। পরবর্তীকালে ‘NU’ ইন্দোনেশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

এই সময় বেশ কয়েকটি ছোট ছোট রাজনৈতিক দলগুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ফলে কোয়ালিশন সরকারের মধ্যে প্রায়ই দ্বন্দ্ব লেগে থাকত। উত্তেজনা যখন চরমে উঠত তখন দলগুলির মধ্যে প্রেসিডেন্ট অথবা সামরিক বাহিনীর সঙ্গে হাত মেলানোর প্রবণতা দেখা যেত। যার ফলে এই ‘মিলিজুলি’ সরকার কখনই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ডিসেম্বর ১৯৪৯ ও মার্চ ১৯৫৭-এর মধ্যে যে কয়েকটি সরকার গঠিত হয় তার সংখ্যা সাতের কম নয় এবং কোন সরকারই দুবছর স্থায়ী হয়নি।

১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি উইলোপো (প্রধানমন্ত্রী) মন্ত্রিসভার পতনের সময় পরিস্থিতির এত দ্রুত অবনিত ঘটে যে রাজনৈতিক সংগঠনগুলি দুটি বিরুদ্ধে শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে মাসজুমি, সোস্যালিস্ট ও দুটি ছোট খ্রিস্টান পার্টি (প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক) আর অন্যদিকে ছিল পি.এন.আই, অনেকগুলি ছোট রাজনৈতিক দল ও কমিউনিস্ট পার্টি। এই দটি শিবিরের বিরোধিতা এত প্রবল ছিল যে এদের মধ্যে সমঝোতার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এখানে মনে রাখতে হবে যে, ১৯৫২-তে সামরিক বাহিনীর একদল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তৎকালীন পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট সুকর্ণর উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। এই ঘটনাটি ‘October 17 Affair’ নামে পরিচিতি। এর ফলে ইন্দোনেশিয়া গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হয়। উইলোপা ক্যাবিনেটের পতনের পর কমিউনিস্ট সমর্থিত প্রথম আলি সাস্ত্রোয়ামিজোয়ো (Ali Sastroamidjojo) ক্যাবিনেট গঠিত হয়। এই কোয়ালিশনে P.N.I.-এর সঙ্গে ছিল নাহ্‌দাতুল উলেমা, অপেক্ষাকৃত ছোট ন্যাশনালিস্ট ও ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলি। এই ক্যাবিনেট যতটা প্রেসিডেন্ট সুকর্ণর সমর্থনপুষ্ট ছিল আগের কোন ক্যাবিনেটই ও ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলি। এই ক্যাবিনেট যতটা প্রেসিডেন্ট সুকর্ণর সমর্থনপুষ্ট ছিল আগের কোন ক্যাবিনেটই ততটা ছিল না। অপরদিকে উপরাষ্ট্রপতি হাত্তার সমর্থন পেয়েছিল বিরোধী পক্ষ মাসজুমি, স্যোসালিস্ট পার্টি।

১৯৫৫ সালের জুন মাসে সামরিক নেতৃবৃন্দ নতুন সেনাধ্যক্ষ হিসাবে আলি ক্যাবিনেট মনোনীত ব্যক্তিকে সমর্থন করতে রাজী না হওয়ায় আলি ক্যাবিনেটের পতন ঘটে। দুই মাস পর বুরহানুদ্দিন হারাহাপের নেতৃত্বে মাসজুমি-সোস্যালিস্ট-নাহ্‌দাতুল উলামা কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয় এবং তার ফলে অধিকাংশ ব্যাপারেই

সরকার ও বিরোধীপক্ষের মধ্যে যে তিক্ততার সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা চরমে পৌঁছায় ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত যথাক্রমে পার্লামেন্ট ও রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র গঠনকর পরিষৎ নির্বাচনের সময়। এটা সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, লিবারাল ডেমোক্রেসিকে আর ধরে রাখা যাবে না। এই ব্যবস্থার সম্ভাব্য বিকল্প হিসাবে কয়েকটি বিষয়ের কথা ভাবা হয়েছিল যেমন একক বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, সামরিক শাসন, একটা নতুন বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন। এত ভাবনাচিন্তা সত্ত্বেও একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে ১৯৫৫ সালের নির্বাচন হয়ত সমাধানের পথ দেখাবে। আশা ছিল এই নির্বাচনের ফলে একটি গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটবে ও রাজনৈতিক দলের সংখ্যা কমে গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে।

বাস্তবিকই এই নির্বাচনে কিছুটা আশার আলো দেখা গেল। ছোট ছোট দলগুলির পার্লামেন্টে নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে কমে যায়। নবনির্বাচিত ২৬০ জন সদস্যের পার্লামেন্টে যে চারটি দলের প্রাধান্য ছিল সেগুলি হল পি.এন.আই. (৫৭টি আসন) মাসজুমি (৫৭ জন প্রতিনিধি) নাহ্দাতুল উলামা (৪৫ জন প্রতিনিধি) আর কমিউনিস্ট পার্টি (৩৯টি আসন)। কিন্তু একটি শক্তিশালী ক্যাবিনেট গঠনের যে আশা ছিল তা পূর্ণ হল না। ১৯৫৬ সালে সবকটি প্রধান অকমিউনিস্ট দলগুলি পি.এন.আই. নেতা আলির নেতৃত্বে সরকার গঠন করে। এইভাবে দ্বিতীয় আলি ক্যাবিনেট গঠিত হয়। পি.এন.আই-র নেতৃত্বে গঠিত নতুন মন্ত্রিসভা মাসজুমি পরিচালিত গোষ্ঠীর সঙ্গে একটা সমঝোতার আসার উদ্দেশ্য সমানে চেষ্টা চালিয়ে যায়। কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয়নি। সরকার গঠনকারী দলগুলির নিজেদের মধ্যে দলাদলি, দুর্নীতি থেকেই গিয়েছিল ফলে একটা শক্তিশালী সরকার গঠন করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং ১৯৫৫ সালের নির্বাচনের ফলে অবস্থার কোনরকম উন্নতি হয়নি।

১৯৫৬ সালে দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে লোকের বিতৃষ্ণা অনেকগুণ বেড়ে যায়। যদিও অবস্থার এই পরিণতির জন্য কে দায়ী এই নিয়ে ঐকমত ছিল না, তবুও সমালোচনা ও নিন্দা যতই সরব হতে থাকে তা ব্যাপক আকার ধারণ করে ততই আলি সরকার ও দেশের সাংবিধানিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে। এই বছরে শেষভাগে সরকার নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ার আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রথমত ছিল সুলাওয়েসি ও সুমাত্রায় আঞ্চলিক সামরিক কমান্ডারদের মদতে চোরাচালানকারীদের কার্যকলাপ, কমিউনিস্ট-বিরোধী ও প্রাক্তন স্থলবাহিনী অস্থায়ী প্রধান কর্ণেল জুলকিফ্লি লুবিস (Zulkifli Lubis)-এর ক্রিয়াকলাপ, জাকার্তায় সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা এবং সবশেষে রাষ্ট্রপতি সুকর্ণর রাজনৈতিক দলব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পাল্টানোর ও লিবারাল গণতন্ত্রের পরিবর্তে গাইডেড ডেমোক্রেসি প্রবর্তনের দাবি।

সঙ্কটের পরবর্তী পর্যায়ের শুরু ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরে। এই সময় প্রাকৃতিক সম্পদে ও রপ্তানি বাণিজ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুমাত্রা দ্বীপের তিনটি প্রদেশেই রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থান হয়। ফলে ক্ষমতা চলে যায় সামরিক বাহিনীর আঞ্চলিক নেতৃত্বের হাতে। এই নেতৃবৃন্দ আলি মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, লাল ফিতা, অত্যধিক কেন্দ্রীকরণ, সুমাত্রার প্রতি অর্থনৈতিক অবহেলা ও কমউনিস্টদের প্রতি অত্যাধিক সহনশীলতার অভিযোগ আনে আলি ক্যাবিনেটের স্বীকৃতি না দেওয়ার ঘোষণা করে। আঞ্চলিক নেতারা নিজেদের এলাকার রপ্তানির একটা অংশ নিজেদের হাতে তুলে নেয়। তার ফলে জাকার্তা সরকারের বৈদেশিক মুদ্রা আমদানি কমে যায়। এই সময় কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর সুমাত্রায় আঞ্চলিক কাউন্সিলকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু মধ্য ও দক্ষিণ সুমাত্রায় আঞ্চলিক কাউন্সিলগুলি ক্ষমতায় রয়ে যায়। এর ফলে দেশের অন্যান্য প্রদেশেও কেন্দ্রীয় সরকারকে না মানার

প্রবণতা ছড়িয়ে পড়ে। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পূর্ব ইন্দোনেশিয়ায় একটি একই ধরনের সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং এখানে শাসনক্ষমতা চলে যায় সেনাবাহিনীর আঞ্চলিক নেতৃত্বের হাতে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই অভ্যুত্থানের একটা রাজনৈতিক দলগত পরিচয়ও ছিল। এরা ছিল মাসজুমি সোস্যালিস্ট প্রভাবিত। সুতরাং এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আগে যেমন ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতি দুটি রাজনৈতিক শিবিরে বিভক্ত ছিল, এখন আবার তাদের মধ্য একটা ভৌগোলিক বিভাজনও দেখা দিল। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দলগুলি যে জনসমর্থন পেয়েছিল তার পরিসংখ্যানের ছবিটি এই প্রসঙ্গে তুলে ধরার মত :

পি.এন.আই., এন.ইউ., এবং কমিউনিস্ট এই তিনটি পার্টিই তাদের প্রাপ্ত ভোটে পঁচাশি শতাংশেরও বেশি ভোট পেয়েছিল জাভাতে। অন্যদিকে, মাসজুমি তার প্রাপ্ত ভোটের ২৫.৪ শতাংশ ভোট পায় পূর্ব ও মধ্য জাভায়, আরও ২৫.৯ শতাংশ ভোট আসে পশ্চিম জাভা ও জাকার্তা থেকে। উল্লেখযোগ্য যে মাসজুমি ৪৮.৭ শতাংশ ভোট পায় বাইরের দ্বীপগুলি থেকে সেখানে অধিবাসীর সংখ্যা অত্যন্ত কম।

ইতিমধ্যে জাতীয় রাজনীতিতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। জাভার বাইরে ইন্দোনেশিয়ার অন্যান্য দ্বীপে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রায় ছিল না বললেই চলে। আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবোধ এই সময়ে প্রবল হয়ে ওঠে যা রাষ্ট্রের অখণ্ডতার পক্ষে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য দুটি প্রস্তাব এসেছিল। মাসজুমি সমর্থিত শিবির চেয়েছিল পুরোনো ধাঁচের ক্যাবিনেট গঠন করতে যেখানে সুমাত্রাসম্ভূত মাসজুমি সমর্থিত হাত্তা, যিনি ১৯৫৬ সালে ডিসেম্বরের গোড়ায় উপরাষ্ট্রপতির পদে থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন, তাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে ফিরিয়ে আনতে হবে। অর্থাৎ তাদের মতে রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষা করার একমাত্র পথ হচ্ছে সুকর্ণ আর হাত্তার মধ্যে ঐকমত্য ফিরিয়ে আনা। অপরদিকে পি.এন.আই. নেতা সুকর্ণ তার প্রস্তাবিত 'গাইডেড ডেমোক্রেসি'কেই সমাধানের পথ হিসাবে দেখেছিলেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, তাঁর নেতৃত্বে পরামর্শদানের জন্য জনগণের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের কাউন্সিল গঠন করতে হবে। সেই প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে থাকবে শ্রমিক, কৃষক, প্রাক্তন ও সমসাময়িক সেনাবাহিনীর লোকেরা, ব্যবসায়ী ও অন্যানরা। এছাড়াও সুকর্ণ এমন একটি ক্যাবিনেট গঠন করার কথা বলেছিলেন যাতে সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি থাকবে।

১৯৫৭ সালে যখন দ্বিতীয় আলি ক্যাবিনেটের পতন ঘটে তখন সুকর্ণর প্রস্তাব গৃহীত হয়। অবশ্য প্রস্তাবগুলির ছোটখাট কয়েকটি পরিবর্তন করা হয়। সুকর্ণ নিজেই একটি পার্লামেন্ট বহির্ভূত ক্যাবিনেট গঠন করেন যার নেতৃত্বে ছিলেন জুয়াণ্ডা যিনি কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। এই মন্ত্রিসভার মাসজুমি তো নয়ই, কমিউনিস্ট পার্টিরও কোন প্রতিনিধি ছিল না। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, মাসজুমি পার্টি সুকর্ণ প্রস্তাবিত 'গাইডেড ডেমোক্রেসি'র কঠোর বিরোধিতা করেছিল। নতুন ক্যাবিনেট কার্যভার গ্রহণের অব্যবহি পরেই যে ন্যাশনাল কাউন্সিল গঠিত হয়, কমিউনিস্ট কয়েকজন সদস্য সেই কাউন্সিলে আসন লাভ করে

ইন্দোনেশিয়ায় রাজনৈতিক সঙ্কট চলাকালীন সেনাবাহিনীর প্রধান এ.এইচ. নাসুতিয়নের নেতৃত্বের কেন্দ্রীয় সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ১৪ই মার্চ সারা দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়। ফলে অসামরিক ব্যাপারে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ আইনসিদ্ধ হয়।

নতুন প্রধানমন্ত্রী জুয়ান্ডা কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের মধ্যে একটা সমঝোতার প্রয়াস চালিয়েও সফল হতে পারেন নি। উপরন্তু দুই সরকারের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। একদিকে বিদ্রোহী আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ ভয় পেয়েছিল যে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের বিরুদ্ধে সমরশক্তির সহায়তা নেবে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার সন্দেহ করেছিল যে বিক্ষুব্ধ আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ পশ্চিমী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে জাকার্তা সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করছে।

১৯৫৭ সালে নভেম্বরের শেষে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণর প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়। কয়েকজন ইসলাম ধর্মাবলম্বী যুবক সেই চেষ্টা করে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দুপক্ষই বুঝতে পারে যে আলোচনার মাধ্যমে সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

এবার পুনরায় পশ্চিম ইরিয়ান প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। ১৯৪৯ সালে ইন্দোনেশীয় জাতিয়তাবাদী নেতা ও ডাচ ঔপনিবেশিক শাসকের মধ্যে যে গোলটেবিল বৈঠক হয়েছিল তাতে পশ্চিম ইরিয়ান প্রসঙ্গটি পরবর্তীকালে আলোচনার জন্য পাশে সরিয়ে রাখা হয়। এই সময় বিষয়টি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ওঠে। এখানে একটা প্রস্তাব ছিল যে, ডাচদের উচিত ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনায় বসা কিন্তু এই প্রস্তাবের উপর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে যে ভোট নেওয়া হয় তাতে ইন্দোনেশিয়া হেরে যায়। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ আগেই হুমকি দিয়ে রেখেছিলেন যে যদি তাদের প্রস্তাব গৃহীত না হয় তবে ডাচদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ভোটের কয়েকদিনের মধ্যেই ডাচ মালিকানাধীন সংস্থাগুলির ইন্দোনেশীয় কর্মচারীরা ইন্দোনেশীয় রিপাবলিকের নামে সেগুলি অধিকার করে নেয়। এই ব্যাপারে যে সরকারের একটা পরোক্ষ সমর্থন ছিল তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। ১৩ই ডিসেম্বর মেজর জেনারেল নাসুতিয়ন একটি সামরিক ডিক্রি জারি করে ইন্দোনেশীয় কর্মচারীদের দ্বারা অধিকৃত ডাচ সংস্থাগুলিকে অধিগ্রহণ করেন। এইভাবে বিশাল ডাচ মালিকানাধীন ব্যবসায়িক সংস্থাগুলি সরকারি সম্পত্তিতে পরিণত হয়। পরের বছর এই সংস্থাগুলির অনুষ্ঠানিক জাতীয়করণ করা হয়।

এই ঘটনার অল্প কিছুদিন পরেই দেখা গেল কেন্দ্র ও বিদ্রোহী আঞ্চলিক কাউন্সিলগুলির মধ্যে বিবাদ একটা নতুন মোড় নিয়েছে। ১৯৫৮ সালে জানুয়ারি মাসে মধ্য সুমাত্রায় কয়েকটি বিদ্রোহী রাজ্যের প্রতিনিধিমণ্ডলীর বৈঠক বসে। মাসজুমি ও সোস্যালিস্ট পার্টির বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতা এই আলোচনায় যোগদান করেছিলেন। ১০ই ফেব্রুয়ারি বৈঠকে অংশগ্রহণকারী নেতারা যে চূড়ান্ত হুমকি দেন তা হল যদি জুয়ান্ডা মন্ত্রিসভা পরবর্তী পাঁচদিনের মধ্যে তাদের শাসনক্ষমতা হাত্তা অথবা জোগজাকার্তার সুলতান কিংবা একযোগে এই দুজনের কাছে হস্তান্তরিত না করে তবে তারা জুয়ান্ডা মন্ত্রিসভার পাল্টা একটি সরকার গঠন করবে। ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারা 'রেভলিউসনারি গভর্নমেন্ট অব দা রিপাবলিক অব ইন্দোনেশিয়া' (PPRI) নামে একটি সমান্তরাল সরকার ঘোষণা করে। এই সরকারে প্রধানমন্ত্রীর পদে পান মাসজুমি নেতা ও প্রাক্তন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক গভর্নর স্যাফরুদ্দিন প্রাউইরানেগারা (Sjafruddin Prawiranegara)। সুমাত্রার বিদ্রোহীরা সুকর্ণর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে তিনি কমিউনিস্টদের মদত দিচ্ছেন এবং দেশকে কমিউনিজমের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। কিন্তু সরকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও দাবি করে। দক্ষিণ সুলাওয়েসি দ্বীপ এদের সাথে যোগদান করে। কিন্তু এই বিদ্রোহীরা সংঘবদ্ধ হতে পারে নি। যেহেতু

তারা অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তাবাদ এবং সাংস্কৃতিক ও বিভিন্ন ধর্মীয় পরিচিতিতে আস্থাবান ছিল সেহেতু তারা পরস্পর পরস্পরের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেনি। উপরোক্ত তাদের সামরিক শক্তি কেন্দ্রীয় সামরিক শক্তির তুলনায় অনেক দুর্বল ছিল। ফলে সুকর্ণ সামরিক শক্তির সহায়তায় এই বিদ্রোহ দমন করতে পেরেছিলেন।

৮০.২ গাইডেড ডেমোক্রেসি

১৯৫৮ সালের মাঝামাঝি নাগাদ দেশের বিপন্ন অখণ্ডতা বিপন্মুক্ত হয়। অখণ্ডতার প্রশ্নে একটা ইতিবাচক পরিস্থিতির উদ্ভব হলেও অন্যান্য বহু বিষয়ে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। ইতিপূর্বে ডাচ সংস্থাগুলি অধিগ্রহণের ফলে ইন্দোনেশীয় অর্থনীতি প্রবল চাপের মুখোমুখি হয়। শিপিং ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। রপ্তানি বাণিজ্যে ক্ষতির পরিমাণ অনেকখানি বেড়ে যায়। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারে এত টান পড়ে যে আমদানির পরিমাণ বহুলাংশে কমিয়ে আনতে হয়। দ্বিতীয়ত, একই সময় সামরিক খাতে ব্যয়ের পরিমাণ অনেকটা বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে ইন্দোনেশিয়ায় মুদ্রাস্ফীতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে যা স্বাধীনতা-উত্তর ইন্দোনেশিয়ায় ইতিপূর্বে কখনও ঘটেনি। আগে অর্থনীতিতে বেসরকারি প্রভাব বেশি ছিল, কিন্তু এই সময় দেখা যায় যে সরকারি প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন আসে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে ইন্দোনেশিয়ার গত দুই বছরে সঙ্কটকালে সামরিক বাহিনী এবং তাদের বিশ্বস্ত দলগুলির ক্ষমতা আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ডাচ মালিকানাধীন যেসকল ব্যবসায়িক সংস্থা সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হয়েছিল সেগুলির পরিচালনমূলক পদগুলিতে সামরিক বাহিনীর অফিসারদের বসিয়ে দেওয়া হয়।

আগের কথায় একটু ফিরে যাওয়া যাক। গৃহযুদ্ধের সময় মেজর জেনারেল নাসুতিনয় ও তার বিশ্বস্ত আঞ্চলিক কমান্ডাররা প্রভূত পরিমাণে দেশবাসীর উপর সামরিক আইন প্রয়োগ করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল অসামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিস্থাপন করা। সামরিক বাহিনী যেভাবে অতি দ্রুত বিদ্রোহ দমন করে তার ফলে জনমানসে তাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দেশবাসী বুঝতে পারে যে, ১৯৫৬ সালের পূর্বে সামরিক বাহিনীর উপর গণতন্ত্রের যে নিয়ন্ত্রণ ছিল তা ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব। এমনকি এই সময় সামরিক একনায়কতন্ত্রও আলোচনার একটি বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে।

এখানে মনে রাখতে হবে, শুধুমাত্র যে সামরিক বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল তা নয়, সমান্তরালভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রেসিডেন্ট সুকর্ণর নিজের ক্ষমতাও। ডাচ মালিকানাধীন ব্যবসা-সংস্থাগুলি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের বিষয়টি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং এর ফলে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ-র ভাবমূর্তি ও জনমানসে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সুকর্ণর বিরোধীপক্ষীয় অন্যান্য দল, মাসজুমি এবং সোস্যালিস্ট দল, যারা পি.আর.আর.আই-এর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তাদের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। এই সময় গাইডেড ডেমোক্রেসির প্রস্তাব, যার কথা সুকর্ণ আগে থেকেই বলে আসছিলেন তা জনগণের বিপুল সমর্থন লাভ করে। এমনকি এই বিরাট জনসমর্থনের চাপে পড়ে, নিজেদের শক্তি হ্রাস হবে বুঝতে পেরেও সামরিক বাহিনী এই প্রস্তাবে অসম্মতি হতে পারেনি এবং এও লক্ষণীয় যে বিগত আট বছর ধরে রাজনৈতিক দলগুলি যারা ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতিতে প্রবল প্রভাব ফেলেছিল, তাদের সেই গুরুত্ব একেবারেই লোপ পায়।

প্রেসিডেন্ট সুকর্ণর জনপ্রিয়তা এত উর্ধ্বে ওঠে যে তিনি গাইডেড ডেমোক্রেসির পক্ষে মতামত দিতে গিয়ে লিবারাল ডেমোক্রেসির ত্রুটিগুলি যখন জনসমক্ষে তুলে ধরলেন তখন লিবারাল ডেমোক্রেসির সমর্থনকারী রাজনৈতিক দলগুলি জনমানস থেকে তাদের মর্যাদা হারাল। লিবারাল ডেমোক্রেসির সমর্থনকারী নেতারাও কিন্তু এই ডেমোক্রেসির স্বপক্ষে যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্য রাখতে পারেনি। লিবারাল ডেমোক্রেসির আমলে যে কয়েকটি রাজনৈতিক সংগঠন লাভবান হয়েছিল তারাও এই জনমতের পক্ষে, গাইডেড ডেমোক্রেসির সমর্থনে 'হ্যাঁ-তে হ্যাঁ' লিমিয়েছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মাসজুমি নিজের জায়গা থেকে এক পাও সরে আসেনি।

এইভাবে লিবিরাল ডেমোক্রেসি নীতিগতভাবে পরাজয় স্বীকার করে নিতে বাধ্য হল এবং পরিত্যক্ত হল। এই সময় একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি অস্তিত্ব বজায় থাকলেও সামরিক শক্তির চাপে পড়ে মাসজুমি বা সোস্যালিস্ট দলের মত এই দলও কিছু সঙ্কটের মুখে পড়ে। ১৯৫৮ সালের শেষার্ধে পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থায় সেরকম কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। পার্লামেন্টের অধিবেশন চলতে থাকলেও পার্লামেন্টের গুরুত্ব বহুলাংশে দুর্বল হয়ে পড়ে। এতদিন পর্যন্ত পার্লামেন্টকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মত কোন বিরোধী পক্ষ ছিল না। এখন সুকর্ণ নিয়োজিত ন্যাশনা কাউন্সিল ও মোরে জেনারেল নাসুতিয়নের নেতৃত্বে সামরিক কমান্ডারদের বৈঠক পার্লামেন্টকে সেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়। এই সময় সুকর্ণ জনমাধ্যমগুলিকে নিজের মতাদর্শ (বিশেষ করে পঞ্চ শীল ও গাইডেড ডেমোক্রাসি) প্রচারের কাজে ব্যবহার করেন এবং প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করার মত প্রায় কেউই থাকে না। সে সমস্ত পত্রিকা সুকর্ণর সমালোচনা করেছিল, সেই পত্রিকাগুলি সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়, কোন কোন পত্রিকা জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ইন্দোনেশীয় সরকারি মুখপাত্ররা ইঙ্গিত দেন যে গাইডেড ডেমোক্রেসি স্থাপনের জন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা চূড়ান্ত রদবদল হতে চলেছে। আট বছর ধরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে পারস্পরিক বিদ দেশকে সঙ্কটের মুখে ফেলেছিল তার হাত থেকে দেশ রক্ষা পায়। প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ যেভাবে দৃঢ় হাতে শাসনদণ্ড ধরেন তাতে দেশে একটা শান্ত বাতাবরণ (Authoritarian Calm) সৃষ্টি হয়। রাজনীতি তার স্বাভাবিক চেহারা হারিয়ে ফেলে আপাত শান্ত বাতাবরণের আড়ালে। অবশ্য বিভিন্ন শক্তির মধ্যে ক্ষমতার প্রচ্ছন্ন লড়াই চলতে থাকে।

১৯৫৯ সালের সূচনায় প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ ও তাঁর মন্ত্রিসভা গাইডেড ডেমোক্রেসির ধারণাকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে সামরিক বাহিনীর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রস্তাব ছিল যে গাইডেড ডেমোক্রেসিকে বাস্তবায়িত করার উদ্যোগকে তারা অবশ্যই সমর্থন করবে, কিন্তু তার কাঠামো ১৯৪৫-এর সংবিধান অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখার দরকার ১৯৪৫-এর এই সংবিধান ১৯৪৯ সালে পরিত্যক্ত হয়েছিল। তৎকালীন নির্বাচিত 'কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্ব্লিকে পুরানো সংবিধানে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাবটি সমর্থন করার ব্যাপারে রাজী করানোর সকল প্রচেষ্টাই যখন ব্যর্থ হয় তখন প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ ৫ই জুলাই প্রেসিডেন্সিয়াল ডিক্রির সাহায্যে ১৯৪৫ সালের বৈপ্লবিক সংবিধানকে পুর্নবহাল করেন ও কনস্টিটুয়েট আসেম্ব্লিকে ভেঙে দেন।

এতদিন ধরে ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তি কী হবে তা নিয়ে অস্থিরতা ছিল। ১৯৪৫ সালের সাংবিধানিক কাঠামোকে গ্রহণ করায় সরকারিভাবে সেই অস্থিরতার অবস্থান হয়। ১৯৪৫-এর সংবিধানের ভাবাদর্শ হচ্ছে পঞ্চ শীল, সেখানে ইসলামের কোন বিশেষ স্থান নেই। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হল দেশে পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। এই নবগঠিত শাসনব্যবস্থায় সুকর্ণই একাধারে রাষ্ট্রপতি

ও প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। এই সময় 'ফার্স্ট মিনিস্টার' নামে একটি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়। প্রধানমন্ত্রী জুয়ান্ডা এই পদটি পান। স্থলবাহিনীর প্রধান নাসুতিয়ন নিজের পদে অধিষ্ঠিত থেকে নতুন মন্ত্রিসভায় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন। সাইত্রিস জন সদস্যবিশিষ্ট এই মন্ত্রিসভায় নাসুতিয়ন ছাড়াও সামরিক বাহিনীর আরও দশজনকে সদস্য হিসাবে স্থান দেওয়া হয়। এদের মধ্যে সাতজন ছিলেন স্থলবাহিনী অন্তর্গত। ১৯৪৫ সালের সংবিধান অনুযায়ী ন্যাশনাল কাউন্সিল রদবদল করে সর্বোচ্চ পরামর্শদাতা কাউন্সিল (Supreme Advisory Council) গঠন করা হয়। একটি নতুন উচ্চ পর্যায়ের জাতীয় যোজনা পরিষদও গঠন করা হয়। এই পরিষদের উপর দায়িত্ব ছিল ইন্দোনেশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক পরিকাঠামোর একটা খসড়া তৈরি করা।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার ব্যাপক রদবদল করা হয় ও এই সরকারের ক্ষমতা আগের তুলনায় অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ঠিক এর পরের বছরই অনেকগুলি নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে দেখা যায়। ১৯৬০-এর জুন মাসে 'Gotong Rojong' নামে একটি পার্লামেন্ট গড়ে তোলা হয়, যার সদস্যদের কাজ একে অপরকে সাহায্য করা। এই পার্লামেন্ট গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল লিবারাল ডেমোক্রেসির আমলে পার্লামেন্টের বিভিন্ন দলভুক্ত সদস্যদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বজনিত সঙ্কট থেকে বর্তমান গাইডেড ডেমোক্রেসিকে রক্ষা করা। আগষ্ট মাসে একটা জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করা হয়। এই উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যারা সকলেই রাজনৈতিক ম্যানিফেস্টোকে (Political Manifesto) সমর্থন করেছিল তাদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব বাড়ানোর। উল্লেখযোগ্য গাইডেড ডেমোক্রেসি শুরু হওয়ার জন্য স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাকেই ইন্দোনেশিয়ার Political Manifesto বলা হয়। People's Consultative Assembly যাকে ১৯৪৫ সালের সংবিধানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয় সেই এ্যাসেম্বলির উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয় ওই বছরই নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে।

আগেই দেখা গেছে যে গাইডেড ডেমোক্রেসির আমলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অনেকাংশেই খর্ব করা হয়েছে। আগষ্ট মাসে মাসজুমি এবং এর মত গুরুত্বপূর্ণ দলকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় এবং জানুয়ারি ১৯৬২-তে এই দুটি দলের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন নেতাকে বন্দী করা হয়। সংবাদপত্রের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় এবং সাংবাদিক, শিক্ষক, ছাত্র, আমলা প্রত্যেককেই গাইডেড ডেমোক্রেসির প্রতি বিশ্বস্ততার শপথ নিতে হয়।

এই সময় অর্থনীতি সম্প্রসারণের সরকারি প্রচেষ্টা খুব একটা কার্যকর হয় নি। বৈদেশিক ঋণের সাহায্যে বেশ কয়েকটি উদ্যোগ গড়ে তোলা হলেও, সেগুলির ধীর গতি কোন আশার আলো দেখাতে পারেনি। রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন ক্রমশই হ্রাস পেতে থাকে। যন্ত্রযোগে উৎপাদন ১৯৫৬ সালের আগের মাত্রাকে কখনই ছাড়াতে পারেনি। খাদ্য উৎপাদনের হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় কম ছিল। মুদ্রাস্ফীতির হার কমিয়ে আনার সরকারি প্রচেষ্টা মাঝে মাঝে সামান্য আশার আলো দেখালেও তা কখনই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

এতক্ষণ পর্যন্ত সুকর্ণর শাসনকালীন নেতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরা হল। এবার দৃষ্টি দেওয়া হোক সেইসময়ের ইতিবাচক বিষয়গুলির দিকে। সুকর্ণর অন্যতম সাফল্য ছিল ১৯৬১ সালে 'পি.আর.আর.আই' বিদ্রোহ দমন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল আত্মসমর্পণকারী প্রায় ১০০,০০০ বিদ্রোহীদের মধ্যে অনেকেই আগের দুটি বিদ্রোহে (Daud Beureuh-এর এ্যাচেনীর ইসলামিক বিদ্রোহ) অংশগ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে অনেকেই আগের দুটি

আন্দোলনের নেতাস্থানীয় ছিলেন। জাভার বাইরে বিদ্রোহ দমন করতে সরকার ব্যস্ত থাকায় তেরো বছর থেকে চলতে থাকা পশ্চিম জাভার দারুল ইসলাম (Darul Islam) বিদ্রোহ দমনে জাকার্তা সরকার মনোনিবেশ করতে পারেনি। এখন অন্যান্য বিদ্রোহগুলি দমিত হওয়ার ফলে জাকার্তা সরকারের পক্ষে জাভার বিদ্রোহ দমন করতে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা সম্ভব হয়। ১৯৬২ সালে জুন মাসে দারুল ইসলাম বিদ্রোহের নেতা এস.এম. কারতোসুউইরয়ো (S.M. Kartosuwirji)-কে জাকার্তা সরকার বন্দী করতে সমর্থ হয় এবং এর অনতিকাল পরেই তার অনুগামীদের বেশি অংশেই আত্মসমর্পণ করে। এতদিন ধরে ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ যে নিরাপত্তাহীন অস্থিরতার মধ্যে দিনযাপন করছিল তার অবসান হয়।

গাইডেড ডেমোক্রেসি চলাকালীন সুকর্ণ সরকারের অন্যতম সাফল্য হল বিতর্কিত পশ্চিম ইরিয়ান সমস্যার বিষয়ে নেদারল্যান্ডের সঙ্গে সমঝোতায় আসা। ১৯৬২ সালে আগষ্ট মাসে নেদারল্যাণ্ডসের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। দীর্ঘদিন ধরে ইন্দোনেশিয় সরকার দাবি করে এসেছিল যে পশ্চিম নিউগিনি ইন্দোনেশিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং বিদেশীদের কবল থেকে এই এলাকাকে মুক্ত করার জন্য প্রবল প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল তারা। একদিকে আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভের প্রচেষ্টা, অপরদিকে সমরসম্ভার বাড়ানো, ছাত্র, সরকারি কর্মচারী ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীদের সামরিক শিক্ষাদান, এমনকি নিউগিনি মেইন ল্যান্ডে গেরিলা বাহিনী পাঠানো ইত্যাদি কার্যকলাপ চলেছিল। অবশেষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যনির্বাহক সেক্রেটারি জেনারেল এলসওয়ার্থ বাঙ্কারের (Ellsworth Bunker)— যিনি ইন্দোনেশিয়ায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসাবে কাজ করেছিলেন। হস্তক্ষেপের ফলে ইন্দোনেশিয়া ও নেদারল্যাণ্ডসের মধ্যে একটি কূটনৈতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তিটি ছিল এইরকম যে ১৯৬২-র পয়লা অক্টোবর থেকে পয়লা মে, ১৯৬৩ পর্যন্ত পশ্চিম নিউগিনি রাষ্ট্রপুঞ্জের শাসনাধীন থাকবে। এরপর শাসনভার ইন্দোনেশিয়ার উপর অর্পিত হবে। এখানে একটি শর্ত ছিল ১৯৬৯ সালের মধ্যে পশ্চিম নিউগিনিবাসীরা তাদের এলাকার ইন্দোনেশিয়ায় অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে তাদের মতামত দেবার সুযোগ পাবে।

৮০.৩ সুকর্ণর পতন

এবারের আলোচ্য বিষয় হল কিভাবে গাইডেড ডেমোক্রেসির অবসান ঘটে এবং প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ ক্ষমতাচ্যুত হন। আগেই দেখা গেছে পঞ্চাশ শতকের শেষে সুকর্ণর ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবার পাশাপাশি ইন্দোনেশিয়ার সামরিক বাহিনীর ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়, যার ফলে সুকর্ণর অবস্থা কিছুটা সঙ্কটের মুখে পড়ে। এই সঙ্কটের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সুকর্ণ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টিকে ব্যবহার করেন। ফলে সুকর্ণর অবস্থা খানিকটা নিঃশঙ্ক হয় এবং এই অবস্থায় তিনি ছয় বছর শাসনব্যবস্থায় নিজের অবস্থান অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হন। কিন্তু এই সময়কালের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার শাসনব্যবস্থা ক্রমশ সঙ্কটের মুখে পড়ে। সামরিক বাহিনী এবং কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ক্ষমতা অধিকারের দ্বন্দ্বই এর প্রধান কারণ। ১৯৬৫ সালে সামরিক বাহিনী, কমিউনিস্ট পার্টি (P.K.I.) এবং সুকর্ণর মধ্যে যে ক্ষমতা দখলের কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব চলেছিল সেই লড়াইতে সামরিক বাহিনীর জয় হয়। ১৯৬৫ সালেরই একটি অভ্যুত্থান ঘটে যার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে দায়ী করা হয় এবং এই অভ্যুত্থানের

ফলস্বরূপ সুকর্ণর পতন ঘটে, পি.কে.আই. নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং সামরিক বাহিনী সর্বময় কর্তৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই অভ্যুত্থানের একটু বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে কারণ জেনারেল সুহার্তোর ক্ষমতায় আসার বিষয়টি এর সঙ্গে জড়িত। ১৯৬৫ সালের এই অভ্যুত্থান 'Gestapu' বা '৩০শে সেপ্টেম্বরের অভ্যুত্থান' নামেও পরিচিতি। ঐদিন সন্ধ্যাবেলা থেকে পরের দিন ভোর পর্যন্ত এই অভ্যুত্থান চলে। দুজন স্থলবাহিনীর অফিসার, বায়ুসেনার অধ্যক্ষ, জাভা স্থলবাহিনী দুই ব্যাটেলিয়ন, এবং পি.কে.আই (P.K.I.) অন্তর্গত যুব ও মহিলা সংগঠন স্থলবাহিনীর হাই কমান্ডের বিরুদ্ধে এই অভ্যুত্থান ঘটায়। এই অভ্যুত্থানে সামরিক বাহিনী ছয়জন জেনারেলকে হত্যা করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল নাসুতিয়ন পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। জেনারেল সুহার্তো কোন অজ্ঞাত কারণে এই হত্যা তালিকায় ছিলেন না। অভ্যুত্থানের নেতারা বেতারকেন্দ্র দখলকরে নেয় এবং একটা অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। অপরপক্ষে কালবিলম্ব না করে সামরিক বাহিনীর কমিউনিস্ট বিরোধী নেতারা দ্রুত সক্রিয় হয়ে ওঠে। জেনালে সুহার্তো শাসনভার নিজের হাতে তুলে নেন ও জাকার্তায় সামরিক আইন জারি করেন। অভ্যুত্থানের প্রথম দিনেই অভ্যুত্থানকারী দুই বিদ্রোহী ব্যাটেলিয়ন ও প্রাসাদরক্ষী বাহিনীকে সুহার্তো আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেন। বায়ুসেনাকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়। পি.কে.আই'র চেয়ারম্যান আইদিত (Aidit) এবং অভ্যুত্থানের অন্যান্য নেতারা তখনকার মত পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ধরা পড়েন এবং সামরিক আইন অনুযায়ী তাদের হত্যা করা হয়। সামান্য কয়েকটি অঞ্চলে অভ্যুত্থানের যে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল, অতি শীঘ্রই তা দমন করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ তো করা হয়ই, সমর্থক ও নেতাদের নির্বিচারে হত্যাও করা হয়। খুব কম করেও হিসাব করলে হতের সংখ্যা হল ১৫০,০০০। ২০০,০০-এর বেশি লোককে সমর্থক বা সমর্থক সেই সন্দেহের বশে গ্রেপ্তার করা হয় ও তাদের রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৬৬ সালের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ১৯৬৭ সালে সুকর্ণকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করা হয়। এরপর সুকর্ণ আর রাজনীতিতে ফিরে আসেননি। ১৯৭০ সালে তার দেহান্ত হয়। সুহার্তো ইতিপূর্বেই অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৬৮ সালে People's Consultative Assembly দ্বারা নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট রূপে পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

৮০.৪ সুহার্তো শাসনকাল

ষাট দশকের মাঝামাঝি যে ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতি চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল সেকথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই সময় মুদ্রাস্ফীতির মাত্রা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৪০০ শতাংশ। সুহার্তো দায়িত্বভার গ্রহণ করারপর আপাতদৃষ্টিতে একটা উন্নতির লক্ষণ দেখা দেয়। এর আগে দেশের অর্থনীতি পুরোপুরি নির্ভর করত দেশে উৎপাদিত তেল, গ্যাস এবং কৃষিজ পণ্যের উপর। সুহার্তোর সময় এই নির্ভরতা অনেকাংশ কমে যায়। আর একটি উন্নতির লক্ষণ ছিল ইন্দোনেশিয়বাসীর গড় আয়ুর ক্রমবর্ধমান হার। এই সময় একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হয় ও তার সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। অর্থাৎ অল্প সময়ের মধ্যেই ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতির ক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষণ দেখা দেয়। সুহার্তো শাসনভার গ্রহণ করার পর প্রথম কয়েক বছর অর্থনৈতিক উন্নতির হার ছিল ১০ থেকে ১১ শতাংশ। সত্তর দশকে নেমে এসে তা ৫ থেকে ৬ শতাংশে স্থিতি লাভ করে।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে স্থিতাবস্থায় আনার পর সুহার্তোর প্রথম ও প্রধান প্রচেষ্টা ছিল খাদ্য উৎপাদনের স্বয়ংনির্ভর হয়ে ওঠা। সত্তর দশকের মাঝামাঝি ইন্দোনেশিয়া ধান উৎপাদনের স্বয়ং নির্ভর হয়ে ওঠে শুধু নাগরিক জীবনেরই উন্নতি নয়, সুহার্তো সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন গ্রামীণ জীবনযাত্রার মান উন্নত করার কাজে। এই যে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান উন্নতি হওয়া, এর থেকে মনে হয়েছিল গ্রামে সুহার্তোর সমর্তন দৃঢ় হবে। মূলত ইন্দোনেশিয়া কৃষিপ্রধান দেশ তাই নগর উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতির দিকে নজর দিতে হবে তা সুহার্তো বুঝতে পেরেছিলেন।

সুহার্তোর এই উন্নতির প্রচেষ্টা জনমানসে কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু আবার একইসঙ্গে সামরিক শাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ জনসাধারণের মনে একটা অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। ধনী-দরিদ্রের সামাজিক অবস্থানে বিরাট বৈষম্য ছিল এই অসন্তোষের একটি বিশেষ কারণ। জাকার্তা শহরই এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ একদিকে গগনচুম্বী অট্টালিকার সারি, অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ হত দরিদ্রের 'ঝুপড়ি'। সুহার্তোর স্বজনপোষণ নীতি জনসাধারণের কাছে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ও বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। শুধুমাত্র সুহার্তোর ছয় সন্তানই নয়, বেশ কয়েকজন চীনা বংশোদ্ভুত টাইকুন তার কৃপাদৃষ্টি লাভ করে। ইন্দোনেসীয় অর্থনীতির উপর তাদের প্রভাব উপরিউক্ত সামাজিক ভারসাম্যহীনতার কারণ বলে জনসাধারণের ধারণা জন্মায়। একথা সত্যই যে স্বজনপোষণের ব্যাপারে তৎকালীন ইন্দোনেশিয়ার প্রথম পরিবার অর্থাৎ সুহার্তো পরিবার সকলকে হার মানিয়েছিল।

স্বেচ্ছাচারিতা সুহার্তো শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। শাসকের এই স্বেচ্ছাচারী নীতির ফলে জনমানসে যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয় তা একটা টাইম বোমার মত কাজ করে। সুহার্তো তার ক্ষমতাকে ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করেছিলেন। দৃশ্যত ছিল তার মুখে 'পিতৃসুলভ' স্নেহের হাসি, অন্তরালে ছিল স্বেচ্ছাচারী শাসকের মুষ্টিবদ্ধ 'লৌহ হস্ত'। সুহার্তোর আমলে পার্লামেন্টে প্রাধান্য ছিল সামরিক বাহিনীর মদতপুষ্ট GOLKAR দলের। এদের বিপক্ষে মাত্র দুটি দলই ছিল। সুহার্তোর আমলে GOLKAR-ই একমাত্র রাজনৈতিক দল যা প্রতিটি নির্বাচনে জয়লাভ করেছিল। সুহার্তোর সময়ে পার্লামেন্টে ৫০০ সদস্যদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আবার সামরিক বাহিনীর নিয়োজিত ছিল। মুক্তি শ্রমিক ইউনিয়ন এবং প্রকাশ্যে সরকারের সমালোচনা দুইই নিষিদ্ধ ছিল। সংবাদপত্রের অনেকটাই শাসকগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর সুহার্তো সরকারে এই হস্তক্ষেপ একটা চাপা জনরোধ সৃষ্টি করেছিল। রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। যখন সুহার্তো প্রথম শাসনক্ষমতায় আসেন তখন তার এবং তার সহকারী সামরিক বাহিনীর অন্যান্য সঙ্গীদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল 'যেমনভাবে হোক' দেশে একটা শান্ত বাতাবরণ সৃষ্টি করা যাতে দেশবাসীর পক্ষে শাসকদলের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা করা, কোন দল গড়ে তোলা সম্ভব না হয়। যদি এর চিহ্ন মাত্র দেখা যেত তাহলে যে কোন ভাবে তাকে বিনষ্ট করা হত, প্রয়োজন হলে রক্তপাত ঘটাতেও কোন দ্বিধা ছিল না। পার্লামেন্টের প্রধান কাজ ছিল সামরিক শাসনব্যবস্থাকে জনসাধারণের চোখে গ্রহণযোগ্য করে তোলা।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৮ সাল থেকে সুহার্তো ইন্দোনেশিয়ার একনায়ক হয়ে ওঠেন। ইন্দোনেশিয়ায় তখন সরকারি দুর্নীতি, স্বজনপোষণ মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। একটা রক্তমাংসহীন গণতন্ত্রের খোলস দিয়ে এই একনায়কতন্ত্রকে আড়াল করার চেষ্টা চলে।

প্রধান যে তিনটি বিষয় জনসাধারণে রোষের কারণ হয়েছিল সেই তিনটি কারণ হল ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি, অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরগুলিতে বৈদেশিক বিশেষ করে জাপানী অর্থ বিনিয়োগ, এবং সরকারি কাজকর্মে ক্রমবর্ধমান সামরিক প্রভাব। ১৯৭৮ সালে প্রেসিডেন্ট সুহার্তো যখন তৃতীয় বারের জন্য ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন তার আগের ছয় মাস ধরে ছাত্রবিক্ষোভ চলছিল। ধীরে ধীরে সুহার্তো সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরোধিতা থাকে। এই বিরোধিতা ক্রমে টাইম বোমার আকার নেয়, যার বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৯৭ সালে যার পরিণতিতে ১৯৯৮ সালে সুহার্তো সরকারে পতন ঘটে।

৮০.৫ সারাংশ

স্বাধীনতালাভের সময় ইন্দোনেশিয়ায় ছিল যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো। অবশ্য খুব কম সময়ের মধ্যেই ইন্দোনেশিয়া একটি Unitary রাষ্ট্রে পরিণত হয়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়কাল 'লিবারাল যুগ' (Liberal Period) হিসাবে পরিচিতি। এই সময় পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র চালু ছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। পঞ্চাশ দশকের শেষদিকে লিবারাল ডেমোক্রেসির সমাপ্তি ঘটে ও 'গাইডেড ডেমোক্রেসির' (Guided Democracy) সূচনা হয়। ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৯ এই চার বছর ধরে নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এই পরিবর্তন আসে। 'লিবারল ডেমোক্রেসি'তে শাসনক্ষমতা ছিল রাজনৈতিক দলের হাতে। পার্লামেন্টের হাতে বেশকিছু ক্ষমতা ছিল, অপরদিকে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ এবং সামরিক বাহিনী ক্ষমতা কার্যত সীমিত ছিল। এই সময় বেশ কয়েকটি ক্ষমতা ছিল, অপরদিকে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ এবং সামরিক বাহিনী ক্ষমতা কার্যত সীমিত ছিল। এই সময় বেশ কয়েকটি ছোট চোট রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় কোয়ালিশন সরকারের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রায়ই লেগে থাকত। স্বাভাবিকভাবে কোন সরকারই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি পরিস্থিতির এত দ্রুত অবনতি ঘটে যে রাজনৈতিক সংগঠনগুলি দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৫৫ সালের নির্বাচনের উপর অনেক আশা ছিল। আশা ছিল যে এই নির্বাচনের ফলে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা কমবে ও গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে। বাস্তবিকই ছোট ছোট দলগুলির পার্লামেন্টে নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে কমে যায়। কিন্তু শক্তিশালী সরকার গঠনের আশা পূর্ণ হয় না। ১৯৫৬ সালে সরকার নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় ও আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। সুমাত্রা দ্বীপের কয়েকটি প্রদেশে রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থান হয়। আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবোধ এই সময় প্রবল হয়ে ওঠে যা রাষ্ট্রের অকণ্ডতার পক্ষে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ১৯৫৮ সালে কেন্দ্র ও আঞ্চলিক কাউন্সিলগুলি মধ্যে বিবাদ এক নতুন মোড় নেয়। সুমাত্রায় কয়েকটি বিদ্রোহী রাজ্যের প্রতিনিধিমণ্ডলী একটি সমান্তরাল সরকার ঘোষণা করে। প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ অবশ্য সামরিক শক্তির সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন। ১৯৫৮ সালের মাঝামাঝি দেশের বিপন্ন অখণ্ডতা 'লিবারাল ডেমোক্রাসি' পরিত্যক্ত হয় ও 'গাইডেড ডেমোক্রেসি' স্থাপিত হয়। প্রেসিডেন্ট সুকর্ণর হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় এবং যেভাবে তিনি দৃঢ় হাতে শাসনদণ্ড দরেন তাতে দেশে একটা শান্ত বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। সুকর্ণর ক্ষমতাবৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি সামরিক বাহিনীর ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। ফলে সুকর্ণর অবস্থা কিছুটা সঙ্কটের মুখে পড়ে। এই সঙ্কটের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সুকর্ণ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টিকে ব্যবহার করেন। ফলে সুকর্ণর অবস্থা খানিকটা নিঃশঙ্ক হয় এবং এই অবস্থায় তিনি ছয় বছর শাসনব্যবস্থায় নিজের অবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম হন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার শাসনব্যবস্থা ক্রমশ সঙ্কটের মুখে পড়ে। ১৯৬৫ সালে সামরিক বাহিনী, কমিউনিস্ট পার্টি (PKI)

এবং সুকর্ণর মধ্যে যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলেছিল সেই লড়াই-এর অবসান ঘটে। এই সালেই একটি অভ্যুত্থানের জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে দায়ী করে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়, সামরিক বাহিনী সর্বময় কর্তৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয় ও সুকর্ণ ক্ষমতাচ্যুত হন। অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর প্রচেষ্টা জনমানসে কিছুটা প্রভাব ফেললেও সামরিক শাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ জনসাধারণের মনে অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৮ সাল থেকে সুহার্তো ইন্দোনেশিয়ার একনায়ক হয়ে ওঠেন। একটা রক্তমাংসহীন গণতন্ত্রের মোড়কে এই একনায়কতন্ত্রকে আড়াল করার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। দীর্ঘ তিন দশকেরও উপর ক্ষমতায় থাকার পর প্রেসিডেন্ট সুহার্তোকে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিতে হয়।

৮০.৬ অনুশীলনী

ক। সংক্ষেপে উত্তর দিন :

১। 'পশ্চিম নিউগিনি' সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

২। স্বাধীনতালাভের পর ইন্দোনেশিয়ায় প্রথম দুটি কোয়ালিশন সরকারের নেতৃত্ব দিয়েছিল কোন রাজনৈতিক দল?

৩। 'পি.আর.আর.আই' সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

৪। ১৯৫৬ সালের ঘটনাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৫। ১৯৫৬ সালের অভ্যুত্থান কী নমে পরিচিত?

৬। কোন কোন প্রেসিডেন্ট সুকর্ণর দেহান্ত হয়?

৭। 'গাইডেড ডেমোক্রেসির' সময় ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৮। জেনারেল সুহার্তো ক্ষমতায় আসার পর দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় কী উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছিল?

৯। কী কী বিশেষ কারণে সুহার্তো জনপ্রিয়তা হারিয়েছিল?

খ। বিস্তৃত আলোচনা করুন :

১। ইন্দোনেশিয়া ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক শক্তি প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত সে দেশের ইতিহাস আলোচনা করুন। এই প্রসঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাবের উল্লেখ করুন।

২। ওলন্দাজ শাসনের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটি রূপরেখা রচনা করুন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বকাল পর্যন্ত।

৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপানী দখলদারির বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয় জনগণের সংগ্রাম সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

৪। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সুকর্ণের অবদান সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করুন।

৫। 'গাইডেড ডেমোক্রেসি' বলতে কি বোঝেন? এই রাজনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা সুকর্ণ ইন্দোনেশিয়ায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন কি?

৬। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত "ইন্দোনেশিয় বিপ্লবে"র উপর আলোকপাত করুন।

৭। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে ইন্দোনেশিয়ার সাম্যবাদীদের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৮। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করুন।

৯। ১৯৬৫ সালে ইন্দোনেশিয়ায় রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টির ভূমিকা আলোচনা করুন।

১০। প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের পতনের জন্য তাঁর অনুসৃত রাজনীতি কতটা দায়ী?

১১। ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতিতে সুহার্তোর উত্থানের প্রসঙ্গে একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনা করুন। একজন সামরিক নেতা হিসাবে রাজনীতিতে প্রবেশের জন্য তার পদক্ষেপগুলির উপর আলোকপাত করুন।

গ। টীকা লিখুন :

১। ইন্দোনেশিয় ভূখণ্ডের প্রধান দ্বীপগুলির পরিচয়।
২। জাভা ও সুমাত্রায় প্রাচীন হিন্দু রাজবংশ।
৩। এ্যাচে যুদ্ধ (Aceh War)।
৪। ব্যানটাম (Bantam)-এক কৃষক বিদ্রোহ।
৫। বুদি উতেমো (Budi Utomo)।
৬। সারেকাত ইসলাম (Sarekat Islam)।
৭। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী পার্টি (PNI)।
৮। পশ্চিম ইরিয়ান সমস্যা।
৯। গোতঙ রজও (Gotong Rojong)।
১০। গোলকর পার্টি (GOLKAR Party)।
১১। পেতামিনা সঙ্কট (Pertamina Crisis)।
১২। পূর্ব তিমোর সমস্যা (East Timor Problem)।

৮০.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। Kahin, George Mc Turnam, Nationlism and Revolution in Indonesia, Ithaca N.Y., Cornell University Press, 1952.
২। Legge, J.D. Indonesia, Englewood Cliffs, N.Y., prentice—Hall, 1965.
৩। Peter Polomke Indonesia Since Sukarno, Penguin Books, Victoria, 1971.
৪। Bastin, J. and benda, H.J.A. Hitory of Modern Southeast Asia, Colonialism, Nationalism and Decolonization, Englewood Cliffs, N.J. Prentice—Hall, 1968.
৫। Hall, D.G.E., A History of South-East Asia, London, Macmillan, 1968.
৬। Woodman, Dorothy, the Republic of Indonesia, New York, Philosophical Library, 1955.
৭। Sardesai, D.R., Southeast Asia : Past or Present, New Delhi, harpercollins Publishers, India, 1997.
৮। Cady, John, F., Southeast Asia : Its Historical Development, New York, McGraw-Hill, 1964.
৯। Steinberg, David J., In Search of Southeast Asia, Praeger, New York, Second Edition, 1985.
১০। Gibb, R.B., Modern Indonesia : A History Since 1945, New York, Longma, 1995.

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

— সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

— Subhas Chandra Bose

Price : Rs. **150.00**

(*NSOU* -র ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-1, Salt Lake City, Kolkata-700 064 and
Printed at : Royal Hlaftone Co., 4, Sarkar Bye Lane, Kolkata-700 007